বৈতালিক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

মুদ্রাকর—শক্তি দত্ত

দি প্রিণ্টিং হাউস

৭০, আপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

প্রচ্ছদ-পট পরিকল্পনা

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ-পট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা

গোপাল ও গোবিন্দ সান্যাল

স্নেহাস্পদেষু

১৩৫৪-র "শারদীয়া স্বরাজে" এই উপন্যাসের প্রাথমিক কাঠামোটি প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রুত লেখনের জন্যে তখন যে ফাঁক এবং ত্রুটিগুলো ছিল সেগুলোকে পূরণ ও সংশোধন করতে গিয়ে গ্রন্থকে অনেকখানি বাড়াতে হয়েছে, অনেক নতুন জিনিস যোজনা করতে হয়েছে।

এই বইয়ে উত্তর বঙ্গের কথ্যভাষার বিশিষ্ট রীতিটাকেই আমি গ্রহণ করেছি—কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের নয়। তবে এর একটা মূল ভিত্তি আছে—সেটা হল দিনাজপুরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল।

আর একটি কথা। বইয়ের ঘটনাকাল ১৯৩৪ সাল। যখন বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের সমাপ্তি-যুগ আর গণ-আন্দোলন আসবার পূর্বাভাস॥

কলকাতা

ফাল্গুন, ১৩৫৩

—লেখক

—এক—

ন্যাড়া মাঠটায় ইতস্তত ছোপ ধরেছে সোনালি-সবুজের, ফলেছে শর্ষে, কলাই, ছোলা, মটর। শীতের বিষণ্ণ শূন্যতায় এতবড় শ্রীহীন মাঠখানার দীনতা তাতে ঢাকেনি, বরং আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে মনে হয়। ভাঙাচুরো আল, মাটির ছোট বড়ো চাঙাড়, বিবর্ণ ঘাস, মরা মরা কণ্টিকারী আর টুকরো টুকরো গোরুর হাড়ে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে শ্মশানের ইঙ্গিত। উত্তর বাঙলার আদিগন্ত এক ফসলের মাঠ। এলোমেলো এই রবিশস্যের টুকরোগুলোর পেছনেও কোনো সজাগ চেষ্টার ইতিহাস নেই। খেয়াল-খুশিমতো ছড়িয়ে রেখেছে, গোরু-ছাগলে খাবে, সকালে-বিকেলে আগুন জেলে শাকশুদ্ধ ছোলা পুড়িয়ে খাবে রাখালেরা। পথ-চলতি মানুষ কখনো যদি দু-এক মুঠো কড়াই-শুঁটি ছিঁড়ে নেয়, তাতেও লাঠি হাতে তাড়া করে আসবে না কেউ। মাটির ভাণ্ডার থেকে বিনা আয়াসে যতটুকু পাওয়া যায় তাই লাভ।

আগে টিপ-সহি দিত, এখন কাঁচা কাঁচা অক্ষরে লেখে শ্রীমহিন্দর রুইদাস। প্রাইমারী ইস্কুলের গুরুট্রেনিং পাশ মাষ্টার বংশী পরামাণিক নাম দস্তখত করতে শিখিয়েছে। অনেক বুঝিয়েছিল বংশী, মহিন্দর কারো নাম হয় না, ওটা হবে মহেন্দ্র।

শুনে চটে গিয়েছিল মহিন্দর। বলেছিল, তুমি ইটা কী কহিছেন হে মাষ্টার? বাপ যিটা নাম দিলে, ওইটা বদলামু কেমন করি? হামি মহিন্দর আছি, মহিন্দরই থাকিবা চাহি। বাপের নাম ছাড়িবা কহিছ! কেমন মানুষখানা হে তুমি?

অতএব বংশী পরামাণিক আর কথা বাড়ায়নি। বলেছিল, আচ্ছা, আচ্ছা, তবে মহিন্দরই লেখ।

—হুঁ—হুঁ—আত্মপ্রত্যয়ের সুরে মহিন্দর বলেছিল, হামাক তেমন মানুষ পাও নাই। ওইটা চালাকি হামার ভালো লাগে না।

বংশী বলেছিল, ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল।

—কেমন, ঠিক কহিছি কিনা ?—মহিন্দর উপদেশ বর্ষণ করেছিল এইবার : বুঝিলা হে মাষ্টার, তুমি তো ঢের নিখিছ (লেখাপড়া শিখেছ), কিন্তু ইটা ভালো কথা কহ নাই। বাপের চাইত্ বড় আর কেহ নাই, বাপক না মানিলে নরকত্ যাবা লাগে।

বংশী নিরুত্তরে শুধু ঘাড় নেড়েছিল এবারে।

সেই থেকে সগৌরবে মহিন্দর রুইদাস তার পৈত্রিক নাম স্বাক্ষর করে আসছে।

একটা মান্যগণ্য লোক—প্রায় আট বিঘে জমি সে রাখে। নানা কারণে মাঝে মাঝে তাকে সই করতে হয়, হাতের মুঠোয় কলমটাকে চেপে ধরে জোর দিয়ে লেখে শ্রীমহিন্দর। দাস পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই কলমের নিব চিরে বকের হাঁ-করা ঠোঁটের রূপ ধারণ করে।

মহিন্দর তাতেই আন্তরিক গর্বিত। এতকাল অন্যের পায়ে জুতো যুগিয়েছে, নিজের কখনো পরবার সাধ হয়নি। কিন্তু যেদিন থেকে নামসই করতে শিখেছে, সেদিনই নিজের হাতে এক জোড়া মোটা কাঁচা চামড়ার জুতো তৈরী করেছে। বর্ষার সময় ভিজে দুর্গন্ধ হয়—বেরুতে থাকে আদিম এবং অকৃত্রিম সৌরভ, অনেক কষ্টে রক্ষা করতে হয় কুকুরের লোলুপতার হাত থেকে ; একবার একটা নেড়ী কুকুর ওর একপাটি মুখে করে পালিয়েছিল, প্রায় দেড় মাইল রাস্তা তাকে তাড়া করে সেটা উদ্ধার করে মহিন্দর। সেই থেকে জুতো সম্পর্কে তার সতর্কতার শেষ নেই।

এহেন শিক্ষা-গর্বিত সম্মানিত শ্রীমহিন্দর রুইদাস তার অতিযত্নের জুতো

জোড়া হাতে করে আসছিল আলপথ দিয়ে। জুতোটা এখন পায়ে দেবে না, দেবে একেবারে বোনাই বাড়ীর সামনে গিয়ে, রাস্তার ডোবায় পা ধুয়ে। প্রথমত জুতো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, দ্বিতীয়ত বেশিক্ষণ পায়ে রাখলে ছাল চামড়া উঠে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার। সুতরাং হাতে করে নেওয়াটাই নিরাপদ তথা নির্ঝঞ্ঝাট।

ন্যাড়া মাঠটার এখানে ওখানে সোনালি-সবুজের ছোপ। ভাঙাচুরো আলপথ বেয়ে চলেছে মহিন্দর, কাঁচা চামড়ার ফাটা ফাটা জুতোজোড়া ঝুলিয়ে নিয়েছে আঙুলের ডগায়। ভারী প্রসন্ন আছে মন। একবার আল্ থেকে নেমে ছিঁড়ে নিলে এক আঁটি ছোলার শাক, দুটো একটা করে খেতে খেতে এগোতে লাগল। মাঠভরা ঝলমলে ঠাণ্ডা শীতের রোদ, এদিকে ওদিকে উড়ে উড়ে পড়ছে ছোট ছোট চড়ুইয়ের মতো 'বকারি' পাখির ঝাঁক। মন্থর রাশভারী গতিতে গা দুলিয়ে দুলিয়ে চলে যাচ্ছে একটা সোনালী গো-সাপ, লিক্লিকে জিভটা বার করে মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে দেখছে মহিন্দরের দিকে। হঠাৎ চামড়াটার ওপর ভারী লোভ হল মহিন্দরের। কিন্তু থানা থেকে ঢোল পিটিয়ে গো-সাপ মারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কেউ মারলে তার জরিমানা হবে। থানাকে বড় ভয় করে মহিন্দর।

কিন্তু ভারী ভালো লাগছে শীতের ঝলমলে রোদে এমনি করে এই মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে। অকারণ একটা খুশি চন্‌মন্ করে ওঠে রক্তের মধ্যে। প্রথম যৌবনের কথা মনে হয়, মনে হয় অন্ধকার সেই বাদাম গাছটার কথা—যেখানে রাত্রে তারিণীর ছোট বোনটা চুপি চুপি আসত তার কাছে। ভয় ছিল, কিন্তু ভাবনা ছিল না; রক্ত ঘন হয়ে উঠত, নিঃশ্বাস পড়ত দ্রুত তালে, কী আশ্চর্য নেশায় আচ্ছন্ন ছিল সে-সব দিন! এই মস্তবড় মাঠটার দিকে তাকিয়ে মনে হয়—কেন কে জানে মনে হয়, সেই আশ্চর্য দিনগুলো আবার রক্তের মধ্যে তার কথা কয়ে উঠছে।

একটার পর একটা ছোলার দানা মুখে দিতে দিতে এগিয়ে চলল মহিন্দর।

আজ কত জটিল হয়ে গেছে জীবন। আজ সে মান্যগণ্য লোক—দশজনের একজন। লোকে তাকে খাতির করে, আপদে-বিপদে, মামলা-মোকদ্দমায় শলা-পরামর্শ নিতে আসে তার কাছ থেকে। সবচাইতে বড় পরিবর্তন যেটা ঘটেছে—সেটাকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না মহিন্দর। তারিণীর সেই ছোট বোন সরলার ছেলেদের সঙ্গেই আজ তার দেড় কাঠা জমি নিয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলল মহিন্দর। যে কারণে মনটা খুশিতে তার ভরে উঠেছিল, ঠিক সেই কারণেই কেমন বিস্বাদ আর ক্লান্ত লাগল নিজেকে। বয়স বাড়লে পেছনের দিকে তাকিয়ে যে অহেতুক একটা অতৃপ্তি তীক্ষ্ণভাবে পীড়ন করতে থাকে, সেই অস্বস্তিটা যেন আকস্মিকভাবে পাক খেয়ে উঠল।

এর চাইতে সেই কি ভালো ছিল? আজকের এই নাম দস্তখত করতে-জানা মাননীয় শ্রীমহিন্দর রুইদাস নয়—সেই দুরন্ত চঞ্চল মহিন্দরের বে-হিসেবী জীবন? মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে সেই যখন সে অল্প অল্প সিঁথি কাটত, মুখে ছিল নতুন গোঁফের রেখা, যখন রাতের পর রাত আল্‌কাপ আর গম্ভীরার গান গেয়ে তার গলা ভাঙত না? আর যখন সেই গানের নেশায় মাতাল হয়ে সরলা—

সরলা। আজ আর কেউ নয়। তাকে ভুলে গেছে, তার গান ভুলে গেছে, ভুলে গেছে বাদাম গাছটার তলায় সে রাত্রির কথা; ঝিরঝিরে হাওয়ায় মাথার ওপরে ঘন পাতার রাশি শব্দ করছে, যেন কথা কইছে চুপি চুপি আবছায়া গলাতে; একটা ঘুম-ভাঙা পাখি পাখা ঝাপটালো, বুকের ভেতরে আরো ঘন হয়ে সরে এল সরলা।

—ভয় কি, ভয় কি?

—কে য্যান্ আসোছে।

—ক্যাহো না, শিয়াল যাছে।

—হামার বড় ডর লাগে। ভাই জানিলে হামাক মারি ফেলিবে। কাইল থাকি মুই আর আসিম্ না।

কিন্তু পরের দিনও আসতো সরলা। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। তারপর কবে একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই সরলার আসা বন্ধ হয়ে গেল, সে কথা আজ আর মনেই পড়ে না মহিন্দরের। কিন্তু সে দিনগুলো আছে রক্তের মধ্যে—এমনি একটা মাঠের ভেতর—এই রকম একলা পথ চলতে চলতে স্বপ্নের মত বাদামগাছটা মাথা তুলে ওঠে। সরলা ভুলেছে, কিন্তু সরলার কি কখনো মনে পড়ে না এমনি কোন একটা মুহূর্তে, একটা নির্জনতার ঝলমলে রোদের ভেতরে?

হয়তো পড়ে, হয়তো পড়ে না।

তবু তার ছেলেদের সঙ্গে মামলা চলেছে। সরলা হয়তো তার মুণ্ডপাত না করে জলগ্রহণ করে না আজকে। মহিন্দরই কি আজ খুশি হবে সরলা সামনে এসে দাঁড়ালে?

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ল মহিন্দর।

খট খট খট। একটা দ্রুত শব্দ। মাটির চাঙাড় গুঁড়ো হয়ে ধুলো উড়ছে ধোঁয়ার রেখার মতো। আর সেই রেখা টেনে শাদা কালো মেশানো একটা বড় ঘোড়া ছুটে আসছে এদিকে। আর কেউ নয়—স্বয়ং হাবিবগঞ্জ থানার বড় দারোগা।

মহিন্দর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দারোগা সাহেব আসছেন। চমৎকার চেহারা মানুষটার। ফর্সা রঙ, নধর শরীর, মুখে কালো চাপদাড়ি। থানার পোষাক নেই, একটা শাদা পা-জামার ওপরে পরেছেন একটা খাকী শার্ট, ঘোড়া দাবড়াচ্ছেন মাঠের ভেতর দিয়ে। অর্থাৎ দাগীর খোঁজে যাচ্ছেন না, বেড়াতে বেরিয়েছেন।

মহিন্দর শ্রদ্ধা করে দারোগা সাহেবকে। ভারী চমৎকার লোক—চাপদাড়ির ভেতরে শাদা দাঁত সব সময়েই হাসিতে আলো হয়ে থাকে। এত

মিষ্টি করে কথা বলেন যে, শুনলে কে বিশ্বাস করবে, দারোগা সাহেব সরকারের লোক—দেশশুদ্ধ মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ? অথচ আগে যিনি ছিলেন, তাঁর দাঁতও বেরিয়ে থাকত, কিন্তু সে থাকত খিঁচিয়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীশুদ্ধ লোক চোর আর বদমায়েস, তাদের সকলকে তিনি সন্দেহ করতেন, তাঁর চোখ দেখলে মনে হত, হাতের কাছে যাকে পাবেন তাকেই ঠ্যাঙ্গাতে পারলে তবে তিনি খুশি হবেন। একটা গোরু চুরির মামলায় একটু হলেই তিনি মহিন্দরকে ফাঁসিয়েছিলেন আর কি।

কিন্তু এ দারোগা সাহেব ভালো লোক—লোকে বলে মাটির মানুষ। অযথা হয়রাণ করেন না কাউকে, গালমন্দও না। দুটো ডিম কিংবা একটা মুরগী কেউ ভেট দিতে গেলে দাম নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেন। বলেন, তোরা গরীব মানুষ, বিনি পয়সায় তোদের জিনিষ নিতে যাব কেন ?

লোকে কৃতার্থ হয়ে যায়।

বলে, না, না হুজুর, মোরা খুশি হই দিনু, আপনার ঠাঁইয়ত্ পাইসা লিবা পারিমু না।

দারোগা হাসেন : তোরা যখন ভালোবেসে দিয়েছিস, তখন না নিলে তোদের কষ্ট হবে। কিন্তু আর দিসনি। এ বে-আইনি—এ আমাদের নিতে নেই।

বে-আইনি! লোকগুলো হাঁ করে থাকে। এতকাল তো এইটেকেই ওরা আইন বলে জেনেছে যে, ঘরে পাঁটা, মুরগী, হাঁস থাকলে, পুকুরে রুইমাছ থাকলে তা দারোগাকে নিবেদন না করে উপায় নেই। ইচ্ছে করে না দিলে জোর করে নেবে। অশ্রা[illegible] বলবে, ব্যাটারা যে একেবারে লাট সাহেব হয়ে গেলি—অ্যাঁ! [illegible] নিয়ে দুদিন হাজতে রেখে দেব, তারপর সদরে চালান করে দেব, টে[illegible]বি কত ধানে কত চাল।

এ দারোগা সাহেব কিন্তু একদম আলাদা—একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

খট খট খট। ঘোড়াটা এগিয়ে আসছে। পাশ কেটেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দারোগা সাহেবের চোখ পড়ল মহিন্দরের ওপর। ঘোড়াটাকে এদিকে

ঘোরালেন তিনি, থামিয়ে দিলেন জোর রাশ টেনে। তিন পা পিছিয়ে গেল ঘোড়া, আকাশের দিকে তুলে দিলে বিদ্রোহী ঘাড়, কড়মড় করে চিবুলে মুখের লাগামটা। ঘোড়ার ঘাম আর ধুলোর গন্ধের একটা ঝলক মহিন্দরের নাকে ভেসে এল।

হাতের পিঠে কপালের ঘাম আর ধুলোর পাতলা আস্তরটা মুছে ফেললেন দারোগা সাহেব। তারপরে হাসলেন তার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি।

—ভালো আছ মহিন্দর?

ভক্তিভরে মহিন্দর সেলাম দিলেঃ আপনারা যেমন রাখিছেন।

—আমরা আর রাখবার কে?—দারোগার গলায় ফকিরসুলভ বৈরাগ্য ফুটে বেরুলঃ খোদায়-তালাই রাখছেন সবাইকে। তাঁরই দোয়া সব।

—জী হুজুর।

—তারপর—চলেছ কোথায়?

—কুটুম বাড়ী যাচ্ছি হুজুর।

—ওঃ, সনাতনপুরের ভূষণ মুচির বাড়ীতে?

—হুজুর তো সকলই জানোছেন!

দারোগা হাসলেন। আর একবার হাতের পিঠে তেম্নি করে কপালের ঘাম মুছলেন, দাড়ি আঁচড়ে নিলেন আঙুল দিয়ে।

—ওহো, ভালো কথা। তোমাদের গাঁয়ে সেই বংশী মাষ্টার আছে এখনো?

—আছে তো।

—ইস্কুলে পড়ায়?

—সি তো পঢ়ায়।

—হুঁ।—দারোগার হাসিমুখ ক্রমশ দাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, পড়ানো ছাড়া আর কিছু করে?

মহিন্দর নিজেকে হঠাৎ বিপন্ন বোধ করতে লাগলঃ পঢ়ানো ছাড়া আর কী করিবে?

—করে, করে। চাষাদের বাড়ী বাড়ী খুব যায়, না ?

—জী, সি তো যায়।

—সভা করে ? জমায়েৎ ?

—আইজ্ঞা ?—মহিন্দর ক্রমে উঠতে লাগল শঙ্কিত হয়ে। দারোগার হাসি মিলিয়ে গেছে, একটা নিশ্চিত নিষ্ঠুর কঠিনতা দেখা দিয়েছে কোথাও: আইজ্ঞা ?

—বলছি, লোকজন ডেকে জমায়েৎ করে ?

—সি তো শুনি নাই।

দারোগা এবারে নীচের ঠোঁটটাকে একবার কামড়ালেন, চোখ দুটো কুঁচকে কেমন একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালেন মহিন্দরের দিকে: কথাবার্তা কী বলে ?

মহিন্দর এবারে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল: ওইটা তো জী হামি জানি না। হামি কামের মানুষ, উসব শুনি হামার কি হেবে ?

—কিছু শোনোনি কারু কাছে ?

মহিন্দরের অসহ্য লাগছে এতক্ষণে, মনের ভেতরে কোথায় যেন টের পেয়েছে, এই প্রশ্নগুলোর আড়ালে এমন একটা কিছু লুকিয়ে আছে, যা নিতান্তই নির্দোষ কৌতূহল নয়। একটু বিরক্তভাবেই জবাব দিলে।

—হামি শুনিব ফের কার ঠাঁই ? কী আর কহিবে ? মাষ্টার ঢের নিখিছে, ভালোই কহে নাগে।

—হুঁ, ভালোই বলে।

দারোগা এতক্ষণে আবার হাসলেন। ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে পা ঠুকছে; আলগা করে একটা জুতোর ঠোক্কর দিলেন সেটার পাঁজরে। ঘোড়া চলতে শুরু করল। দারোগা বললেন, আচ্ছা, যাও তুমি।

—জী সেলাম।

তড়বড় তড়বড় করে আবার ছুটে চলল ঘোড়াটা—মহিন্দর তাকিয়ে রইল।

সত্যিই চমৎকার চেহারাখানা দারোগা সাহেবের—ঘোড়ার পিঠে তাঁকে খাসা মানায়। এমন নইলে আর দারোগা!

—কিন্তু—

কপাল কুঁচকে মহিন্দর ভাবতে লাগল, মাষ্টার সম্বন্ধে হঠাৎ এমন করে সন্ধান নেবার মানে কী! কোনো মতলব আছে নাকি? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? দারোগা সাহেব একেবারে মাটির মানুষ, তিনি তো কারো ক্ষতি করতে চান না। তাঁর নাম করতেও লোকে যে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে যায়!

মরুক গে, ওসব ভেবে লাভ নেই মহিন্দরের। আদার ব্যাপারী হয়ে কী করবে সে জাহাজের খবর দিয়ে? তার চাইতে এখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়াই ভালো। বেলা দ্রুত বেড়ে উঠছে, ক্রিয়া-কর্মের ব্যাপার বোনাই বাড়িতে, বেশি দেরী করলে মান থাকবে না।

মাঠের ভেতর দিয়ে একটা ছোট নদী বেরিয়ে গেছে, তার নাম কাঞ্চন। বর্ষায় ভরে ওঠে, ঢল নামায় দুদিকের বিন্নাবনে ছাওয়া ঢালু জমিতে। তখন কূল থাকে না, কিনারাও না। এখন সে নদী পড়ে আছে নির্জীব একটা সাপের খোলসের মতো। ফালি ফালি বালির ডাঙ্গা উঠেছে জেগে, তার ভেতর দিয়ে তিন চারটে ধারায় বেরিয়ে যাচ্ছে বালি-মেশানো চিকচিকে জল। হাঁটুর ওপরে একটুখানি কাপড় তুলেই নদীটা পার হয়ে এল মহিন্দর।

নদীর পরে বিন্নায়-ভরা মাঠ, বেঁটে বেঁটে হিজল গাছ, তারপরেই লাল মাটির উঁচু পাড়ি। পাড়ির ওপরে আমবাগান, খাড়া মাটির এখানে-ওখানে আমগাছের শিকড় ঝুলছে। ওই উঁচু পাড়ির ওপর সনাতনপুরের মুচিপাড়া, আমগাছের ছায়ায় একখানা গ্রাম। গোরুর গাড়ির রাস্তা গ্রামের ভেতর দিয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে গেছে। তিন চার হাত উঁচুতে বাড়ী, নীচে রাস্তা। শুকনোয় গোরুর গাড়ির পথ—বর্ষায় নৌকো চলবার খাল।

মহিন্দরের বোনাই ভূষণ রুইদাসও অবস্থাপন্ন লোক। আগে জুতো

তৈরী করত, হাটবার দিন লাঠির মাথায় জুতো ঝুলিয়ে বেরুত জীবিকার সন্ধানে। কিন্তু এখন আর ওসব উঞ্ছবৃত্তি নেই ভূষণের। কিছু চাষের জমি নিয়েছে, রেখেছে চার জোড়া বলদ আর দুখানা মোষের গাড়ি। জমি থেকে বছরের ধান পায়, আবাদের সময় বলদ ভাড়া দেয় আধিয়ারদের, মোষের গাড়ি বেড়ায় সোয়ারী টেনে—মাল নিয়ে যায় রেল ষ্টেশনে, এদিক ওদিকের বন্দরে, গঞ্জে।

তারই ছেলের বিয়ে এবং আজ কুটুম খাওয়ানোর দিন।

বলা বাহুল্য, প্রচুর সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে। ভূষণ কার্পণ্য করেনি, তা ছাড়া এমনিতে সে দিল-দরিয়া লোক। গ্রামের মুখে পা দিতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল মহিন্দর, কানে এল গানের স্বর। উৎসব শুরু হয়েছে মুচিপাড়ায়।

মহিন্দর থেমে দাঁড়াল. একবার তাকালো হাতের জুতো জোড়ার দিকে। সময় হয়েছে। পাশেই একটা কাদায় ঘোলা ডোবা আকীর্ণ হয়ে আছে সিঙ্গাড়া আর শাপলার লতায়, ফুল ঝরে-যাওয়া গোটা কয়েক ন্যাড়া পদ্মের ডাঁটা শুকোচ্ছে শীতের রোদে। তারই কাঠ-ফেলা ঘাটে মহিন্দর পা ধুয়ে পরে নিলে জুতো জোড়া। এখন নিজেকে বেশ সমৃদ্ধ আর সম্ভ্রান্ত বলে সন্দেহ হচ্ছে। অবশ্য পায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জুতো কামড় বসিয়েছে, মনে হচ্ছে, একটা আঙুল যেন কেটে বেরিয়ে যাবে। তবুও জুতো পায়ে দিলে কেমন মচমচ করে শব্দ হয়, এই খালি-পায়ের দেশে লোকগুলো বুঝতে পারে, উল্লেখযোগ্য কেউ একজন আসছে এগিয়ে।

দুধারে চামড়া-ধোয়া পচা জলের উৎকট গন্ধ, এদিকে ওদিকে কাঠি দিয়ে আঁটা টান করা চামড়া শুকোচ্ছে রোদে, দরজার গোড়ায় ঝুলছে সমাপ্ত অসমাপ্ত জুতোর রাশ, দুটো একটা ঢাক পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। একটা পাঁটার ঠ্যাং নিয়ে শুরু হয়েছে তিন চারটে কুকুরের কলহ। কিন্তু বাড়ীগুলো সব ফাঁকা—কোথাও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। ওদিক থেকে আসছে প্রচণ্ড

গানের শব্দ—নিশ্চয় ভূষণের বাড়িতে। সারাটা গ্রাম বোধ হয় জড়ো হয়েছে ওখানে গিয়েই।

অনুমান মিথ্যে নয় মহিন্দরের। একেবারে আলো হয়ে গেছে ভূষণের দাওয়া। গড়াগড়ি যাচ্ছে দশবারোটা তিরিশের বোতল, পচাইয়ের ভাঁড়গুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। একজন করতাল পিটছে ঝমর ঝমর করে, একজন বাজাচ্ছে হারমোনিয়াম, আর তবলার অভাবে একটা ঢাকের উপর কাঠি দিয়ে তাল রাখছে তৃতীয় জন। আর অতি প্রচণ্ড নেশা করেছে সকলে। চোখগুলো টকটকে লাল, ইচ্ছে করে মাথা নাড়ছে, না নেশার ভারে মাথাগুলো আপনা-আপনিই ঢুলে ঢুলে পড়ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সকলের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছে রাসু। বেশ মোটা সোটা ভারিক্কী চেহারার লোক, কম কথা বলে আর যা বলে তা দস্তুরমতো ওজন করে। এ হেন রাসুকে এখন আর চিনতে পারা যাচ্ছে না। ধুতির খানিকটা পরেছে ঘাগ্‌রা করে, খানিকটা তুলে দিয়েছে মাথার ওপর ঘোমটার ধরণে—তারপর বাইজীর ধরণে কোমর দোলাবার চেষ্টা করছে। অবশ্য তাতে কোমর দুলছে না, দোল খাচ্ছে ভুঁড়িটাই। আর সেই নাচের সঙ্গে গানও ধরেছে তারস্বরে :

> "নাগর হে, ইটা তুমার কেমুন কাজ,
> লিয়ে করে মোহন বাঁশি,
> কুল-মান দিল্যা নাশি,
> পরানে পড়াইল্যে ফাঁসি.
> কুন্‌ঠে বা মুই রাখিম্ লাজ
> হে, ইটা তুম্‌হার কেমুন কাজ"—

—হে ইটা তুম্‌হার কেমুন কাজ—তারস্বরে কোলাহল উঠল চারদিকে। প্রত্যেকটা মানুষ সপ্তমে চড়িয়েছে মাতালের জড়ানো গলা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে পরস্পরের সঙ্গে। গান হচ্ছে না দাঙ্গা চলছে, ব্যাপারটা বাইরের লোকের

পক্ষে বোঝা শক্ত। রাস্থর নাচের উৎসাহটা ক্রমশ ডিঙ্গিয়ে চলে যাচ্ছে ভব্যতার মাত্রা।

মহিন্দর বললে, সাবাস হে, খুব জমাছ !

—আইস হে বড় কুটুম, আইস—

সাড়া পড়ে গেল মহিন্দরের আবির্ভাবে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল তিন চারজন, টেনে একেবারে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল তাকে। রাস্থ এগিয়ে এল, দুহাতে মহিন্দরকে জাপটে ধরলে একেবারে : আইস হে নাগর, আইস। তুম্হার জন্যেই তো কাঁদি কাঁদি চোখ আন্হার করি ফেলিছু।

হাসির রোল উঠল।

রাস্থ বলে চলল, হামার নাগর আসিলে, তুমরা উলু দাও কেনে। পা ধুবার পানি লিয়ে আইস, পিঁঢ়া দাও।

সমবেত উলুধ্বনির মাঝখানে আসন নিলে মহিন্দর। কিছুটা অপ্রতিভ, কিছুটা লজ্জিত। সভায় ভূষণ উপস্থিত ছিল না, মহিন্দরের আসবার খবরে ভেতর থেকে ছুটে এল সে।

—অ্যাতে দেরী করিলা দাদা ?

—ঢের ঘাঁটা (পথ) ভাঙি আইনু, তাই দেরী হৈল্।

—তো আরাম করে বৈস। হামি উধার যাছি—

রাস্থ বললে, হঁ, হঁ, তুমি যাওনা কেনে। হামাদের কুটুম লিয়ে হামরা ফুরতি করি।

—তো কর, কে মানা করোছে ? মৃদু হেসে ভূষণ চলে গেল। তার অনেক কাজ। মাংস রান্না হচ্ছে, তার তদারক করতে হবে, কলাপাতার যোগাড় হয়নি এখনো, সেটা দেখতে হবে। তা ছাড়া লোক যা জড়ো হয়েছে তাতে অন্তত আরো দুহাঁড়ি ভাতের যোগাড় না করলেই নয়।

যাওয়ার সময় ভূষণ বললে, মাতালের হাতে পড়িলা, বেশী নেশা-ভাং করিয়ো না দাদা।

—তুমি কেনে বাগড়া দিচ্ছ ? যেইঠে যাচ্ছ, যাও না ?

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাল হয়ে এল মহিন্দরেরও চোখ, রাসুর গানের সুরে তারও ঘোর লাগতে লাগল। কোমর দুলিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে রাসু কটাক্ষ বর্ষণ করে চলল মহিন্দরের দিকে ঃ

"যৈবন ভাসায় হে সখা নীল যমুনায়"—

নেশা লাগছে, তবু কোথায় যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মহিন্দরের কিসের একটা ছোঁয়া গেলে ফিকে হয়ে যাচ্ছে সমস্ত। টুকরো টুকরো রবিশস্যে ভরা মস্ত মাঠখানা। বহুদিন পরে মনের মধ্যে গুন গুন করে ওঠা সরলার স্মৃতি। দারোগা সাহেব খোঁজ নিচ্ছেন বংশী মাষ্টার সম্বন্ধে। কেমন লোক, কী করে, কী বলে গ্রামের চাষা-ভূষোদের, কী বোঝাতে চেষ্টা করে ?

কোন সম্পর্ক নেই এই বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলোর মধ্যে, তবু কোথায় যেন সম্পর্ক আছে একটা। ঠিক বুঝতে পারছেনা মহিন্দর- অথচ কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মন – কিছুর একটা আভাস পেয়েছে। অন্ধকারে শিকারী কুকুরের মতো চকিত হয়ে উঠেছে তার ইন্দ্রিয়।

—চন্দ্রাবলীর ভাবনা নাগিলে নাকি হে নাগর ?

রাসু জিজ্ঞাসা করলে। মহিন্দর উত্তরে মৃদু হাসল। কী যেন হয়েছে তার। কিছুতেই ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, কোথায় একটা দোলা লেগেছে, নাড়া খেয়ে উঠেছে সমস্ত। মাঝে মাঝে এরকম হয়। ঠিক কারণটা খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ একটা বিষণ্ণ বিস্বাদ, একটা নিরাসক্তি এসে আচ্ছন্ন করে। মনে হয়, কে যেন আসবে, কী যেন ঘটবে। নতুন, অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর।

সরলা ? নিস্তব্ধ অন্ধকারে সেই উচ্ছল রক্তের মাতামাতি ? সেই আশ্চর্য দিনগুলি ? অথবা ঘোড়ার পিঠে দারোগা সাহেবের সেই আবির্ভাব ? অথবা কিছুই না ? শুধু একটা আদিগন্ত মাঠ, ভাঙাচুরো আল-পথ, গোরুর হাড়ের কতগুলো টুকরো আর এলোমেলো হরিত-হিরণ্যের ছাপ ?

ঘোর ঘোর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মহিন্দর। চোখে পড়ল ভেতরের উঠোনেও একটা ছোট আসর বসেছে। সেখানে বেশির ভাগই মেয়ে—দুচারটে মদের বোতল গড়াচ্ছে সেখানেও। এখানকার আসরের সঙ্গে ওখানকার একটু পার্থক্য আছে। ফর্সা কবে বিশ বাইশ বছরের একটি ছেলে ওখানকার সভা একেবারে আলো করে বসেছে। দিব্যি চেহারা ছেলেটির, গায়ে একটা ফর্সা কামিজ, কানের ওপর দিয়ে সৌখীন বাঁকা সিঁথি। ছেলেটি হাসছে, বোধ হয় রসিকতা করছে—আর মেয়েরা হাসির ধমকে একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। জমেছে বেশ।

কপালটা কোঁচকালো মহিন্দর।

ছেলেটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। কখনো দেখেনি, অথচ মুখের গড়নে কোথায় একটা পরিষ্কার পরিচয়ের আদল আসে। আর যেটা সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে এই যে, ছেলেটি এখানকার সব চেয়ে সম্মানিত অতিথি—অবস্থাপন্ন, লেখাপড়া জানা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমহিন্দর রুইদাসের চাইতেও। তাই অন্দরে মেয়েদের মধ্যে নিয়ে তাকে বসানো হয়েছে, স্বয়ং ভূষণ এসে তত্ত্বাবধান করে তার।

হঠাৎ কেমন বিশ্রী বোধ হল মহিন্দরের, কেমন অপমানিত বোধ হল নিজেকে। এ গ্রামে—অন্তত এ বাড়ীতে তার চেয়ে মর্যাদাবান কে? ভূষণ তাকে বসিয়ে রেখে নিজের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করে চলে গেল, অথচ কেন ঘুরে ফিরে ওই ছেলেটির তত্ত্বতালাস করে যাচ্ছে সে? ব্যাপারটা কী?

ছেলেটি সমানে হাসছে, মেয়েরা ভেঙে ভেঙে পড়ছে হাসিতে। বেশ জমিয়েছে ওরা, একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছে ওখানে। মহিন্দরের কেমন যেন মনে হতে লাগল, ছেলেটা তাকে তার আসন থেকে বঞ্চিত করেছে, ভাগ বসিয়েছে তার ন্যায়সঙ্গত এবং চিরন্তন মর্যাদায়। কিন্তু কে ও?

সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্যে, যৌবনে ঝলমল করছে। আসর আলো করে বসবার মতো চেহারাই বটে। আর সেই জন্যেই কি ভালো লাগছে না মহিন্দরের, সেই জন্যেই কি অসহ্য অনধিকারী বলে বোধ হচ্ছে নিজেকে ? ওকে দেখে কি নিজের হারানো সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে—মনে পড়ছে রক্তের মধ্যে সেই মাদকতার দিনগুলোকে ? একদা ত্রিশ বছর আগে যে গৌরবে জোয়ান মহিন্দর গ্রামের সেরা মেয়ে সরলার চিত্ত জয় করতে পেরেছিল, সেই গৌরবের নতুন উত্তরাধিকারীকে কি সহ্য করতে পারছে না মহিন্দর ? আজ যে সব মেয়ে কৈশোর-যৌবনের মাঝখানটিতে একটির পর একটি পাপড়ি খুলছে ফুলের মতো, তারা মহিন্দরের কাছে আলেয়ার মতো মিথ্যে হয়ে গেলেও ওই ছেলেটি আজ তাদের পৃথিবীতে একচ্ছত্র ?

মহিন্দরের কপাল আরো বেশি করে কুঞ্চিত হয়ে এল। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল ওদের আলাপ, ওদের চটুলতা। কিন্তু কিছু শোনা যাচ্ছে না—বোঝাও যাচ্ছে না। ঢাকের বাজনা, করতালের শব্দ আর গানের মাতামাতিতে শোনবার উপায় নেই একটি বর্ণও।

ইতিমধ্যে নাচতে নাচতে বেদম হয়ে পড়েছে রাসু। পাশে এসে বসেছে মহিন্দরের। দুহাতে তাকে জাপটে ধরে বলছে, তোমার কী হৈল্ হে নাগর ? রাধিকার উপর থাকি মন কি সরি গিছে ? তাই তো মনে নাগোছে। হায় হায়রে, হামার নাগরকে কেবা এমন করি ভুলাইলে—

ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ রাসুকে সরিয়ে দিয়ে রূঢ় গলায় মহিন্দর বললে, থামো হে, অত মাতামাতি করিয়ো না। বুঢ়া হইছু—সিটা খেয়াল নাই ? ছোয়া পোয়ার সামনত্ অমন ঢলাঢলি করিলে কি মান থাকে ?

রাসু স্তম্ভিত হয়ে গেল। কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য এবং অপ্রত্যাশিত। এরকম ক্ষেত্রে এবং এমন একটা উপলক্ষে এ জাতীয় বর্ম কথা যে কেউ শোনাতে পারে, এটা কল্পনারও অতীত ছিল।

এতক্ষণ সখীনৃত্য করে আপাতত রাসু স্ত্রীভাবে ভাবিত। কথাটা শুনে

সে একবার জিভ্ কাটলে, মাথার পেছনে হাত দিয়ে ঘোমটা টানার চেষ্টা করলে একটা, কিছুক্ষণ নিজের চিবুকটা আঙুলের মাথায় ধরে মেয়েলি ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল, তারপর বললে, হায়রে বাপ, হঠাৎ ইটা কী হইল্ হে? খুব মানী হই গিলা নাগোছে?

—ত নাগিবে না তো কী? বয়েসখানা তো ফের কম হয় নাই। এখন উসব চ্যাংড়ারা করিবে, নাচিবে, কুঁদিবে, যিটা উয়াদের ভালো নাগে সিটাই করিবে। তুমরা উসব ছাড়ি দেন। দেখিতেও ভালো নাগে না—ফের কোমরে অস (বাত) ধরিলে বিছানাত্ পড়ি থাকা নাগিবে।

মহেন্দ্রের স্বরে এবারে তিক্ত নৈরাশ্য ফুটে বেরুল। কথাটা সে কি রাসুকে বলেছে, না বলেছে নিজেকেও? শুধু রাসুকেই সতর্ক করে দিচ্ছে তা, না বোঝাপড়া করে নিচ্ছে নিজের মনের সঙ্গেও? এটা আজ আর বুঝতে বাকী নেই যে, তারা আজ ক্রমশ জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—সরে যাচ্ছে আনন্দ আর যৌবনের অধিকার থেকে। আজ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যাদের দেহ-মন পদ্মের মতো বিকসিত হয়ে উঠছে, তারা আর ওদের কেউ নয়। কুড়ি বাইশ বছরের ওই ফর্সা ছেলেটি সেখানে নিজের সগৌরব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে—ঈর্ষ্যাতিক্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া মহিন্দরদের আর গত্যন্তর নেই।

কিন্তু রাসুর এবার আর বাকস্ফূর্তি হলনা। কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টি মেলে। তারপর বললে, তোমার কী হৈল্ হে আইজ!

—কী আবার হেবে? বয়েস হইছে, সিটাই মনে পড়াই দিনু! এখন নিজের মান রাখি চলিবা নাগে—বুঝিলা?

—বুঝিনু—

রাসু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মহেন্দ্রের দৃষ্টি অনুসরণ করতে তারও চোখ চলে গেল ভেতরে ওই ছোট আসরটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই কিছু একটা বুঝল রাসু—যেটা অস্পষ্ট ছিল সেটা প্রত্যক্ষোজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক

হূর্তে মহেন্দ্রের মনটা যেন ধরা পড়ে গেল তার কাছে এবং একই সঙ্গে, একই সময়ে, একই প্রশ্ন আর একই উত্তর বেরিয়ে এল :

—ওই ছোঁড়াটা কে হে ?

—কে জানেবা !

—কখনো দেখিছ ?

—ঠাহর পাছি না।

—উয়াক কোথা থাকি আনিলে ভূষণ ?

—কে কহিবে ? ভিন্ গাঁয়ের কুনো কুটুম হবা পারে।

—সিটাই নাগোছে ।

এই সময় ভূষণ এসে হাজির। পেছনে পেছনে কলাপাতার রাশি, মাটির গেলাস। খাবার তৈরী।

—বসি যান ,বসি যান সব।

একটা কলরব উঠল। নেশায় বিহ্বল মানুষগুলো এতক্ষণে উঠেছে সজাগ হয়ে। ফুটন্ত ভাতের গন্ধ আসছে, আসছে মাংসের মনমাতানো গন্ধ। ক্ষিদেটা এতক্ষণ চাপা পড়েছিল হাঁড়িয়া আর দেশী মদের নীচে, মাংসের এই পাগল-করা গন্ধে এবার সেটা আত্মপ্রকাশ করলে উদগ্রভাবে।

—কই লিয়ে আইস, লিয়ে আইস।

—আইজ তোমার হাঁড়ি ফাঁক করি দিমু হে ভূষণ। কয় মণ মাংস রাঁধিছ ?

—আচ্ছা, আচ্ছা, দেখিমু—কে কেমুন জোয়ান আছ, কত খাবা পার ।

পাতা পড়ল, পড়ল গেলাস। ভূষণ সবিনয়ে এসে দাঁড়াল সকলের সামনে —বিশেষ করে মহিন্দরের।—পেট ভরি খাইও হে কুটুম, বদনাম করিয়ো না।

কেমন বিরক্ত দৃষ্টিতে মহিন্দর ভূষণের দিকে তাকালো। একবার বলতে ইচ্ছে করল, আমাকে আর অভ্যর্থনা করা কেন, ওই ছোকরাটাকেই করো গে। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করলেই বলা যায় না, মহিন্দর নিজেকে সামলে নিলে। শুধু সংক্ষেপে জবাব দিলে, হুঁ।

একটুখানি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল ভূষণ।

—তোমার কী হইছে কুটুম? অসুখ করিছে নাকি?

—অসুখ আর কী করিবে? হামরা এখন বুঢ়া হই গেনু—অসুখ তো হামাদের নাগিই রহিছে।

—বুঢ়া!—ভূষণ রসিকতার চেষ্টা করলে: তুমি তো চিরকালই জোয়ান রহিছ কুটুম—তুমি ফের কবে বুঢ়া হইলা?

একটা অকারণ রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল মহিন্দরের। কেন কে জানে, একটা চড় বসিয়ে দেবার ইচ্ছে জাগছে ভূষণকে। ভূষণের হাসিটা অস্বাভাবিক রকমের কদর্য মনে হচ্ছে, যেন দাঁত বার করে সে ঠাট্টা করছে মহিন্দরকে।

অনেক কষ্টে এবার নিজেকে সামলে নিলে মহিন্দর। শুধু বললে, হঁ।

কয়েক মুহূর্ত বিস্মিতভাবে কুটুমকে পর্যবেক্ষণ করে ভূষণ সরে গেল সেখান থেকে। কিছু বুঝতে পারেনি—বোঝবার সময়ও নেই তার। শুধু সম্মানিত কুটুমই নয়, নিমন্ত্রিত যেসব অভ্যাগত আছে, তাদের সম্পর্কেও করণীয় আছে তার, আছে দায়িত্ব। শুধু কুটুমকে আপ্যায়ন করলেই চলবে না—জাত-ভাইদেরও খুশি করা দরকার।

মহেন্দ্র বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ঝুড়ি বোঝাই করে এল লাল চালের ভাত—গরম ভাতের ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা।

কলার পাতায় পুরো এক এক সের চালের ভাত পড়তে লাগল। কিন্তু কী যে হয়েছে মহিন্দরের কে জানে। সেই ন্যাড়া মস্ত মাঠটা, সেই সরলার স্মৃতি—সেই ঘোড়ার পিঠে দারোগা সাহেব, না এই বিশ বাইশ বছরের সুদর্শন ছেলেটা? কিছু পরিষ্কার ধরা যাচ্ছে না। অথচ থেকে থেকে বিরক্তিতে ভরে উঠছে মন। শুধু খেতে ইচ্ছে করছে না তা নয়, এখান থেকে উঠে চলে যেতে ইচ্ছে করছে—গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে কোনো একটা

নির্জনতায়—যেখানে মনটাকে স্পষ্ট করে যাচাই করে নেওয়া চলে, যেখানে খোলা আকাশের নীচে, অজস্র অপর্যাপ্ত বাতাসে তার বিব্রত স্নায়ুগুলো আশ্বাস পায়।

- মাংস—মাংস লিয়ে আইস—

লুব্ধ কলরব উঠেছে। যাদের তর সয়নি তারা ইতিমধ্যেই শুধু ভাত মুঠো মুঠো করে খেতে শুরু করে দিয়েছে। আসরটার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে মহেন্দ্র, একবার মনে হল—চারদিকের লোকগুলো অত্যন্ত লোভী, অত্যন্ত ইতর, এদের মাঝখানে সে বেমানান, এখানে আসাটা তার উচিত হয়নি।

—নাগর, খাও কেনে—

—হুঁ, খাচ্ছি—অন্যমনস্কভাবে ভাত নাড়াচাড়া করতে লাগল মহিন্দর। ইতিমধ্যে মাংসের পাত্র এসে পৌঁছেছে। একশো জোড়া সলোভ দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে মাংসের ভাণ্ডের ওপর—স্ফীত নাসারন্ধ্রগুলো সাগ্রহে শুঁকছে তার উগ্র উত্তেজক গন্ধ।

ভাতের ওপর এক হাতা মাংস পড়তেই চমকে উঠল মহিন্দর। সেই ছেলেটি মাংস পরিবেশন করছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কী একটা জিনিষ বিদ্যুতের মতো প্রবাহিত হয়ে গেল মনের ভেতরে। কে এই ছেলেটি, কার ছেলে? কার আদল এর মুখে?

হঠাৎ মহিন্দর প্রশ্ন করে বসল, তুম্‌হাক তো কখুনো দেখি নাই। তুমার বাড়ি কুন্‌ঠে হে বাপু?

সলজ্জ স্বরে ছেলেটি বললে, মীরপাড়া।

মীরপাড়া! মহিন্দরের বুকের ভেতর ধক্‌ করে উঠল, থেমে দাঁড়াতে লাগল হৃৎস্পন্দন।

—তুমার বাপের নাম কী?

—কেষ্ট রুইদাস।

হিংস্রভাবে দাঁতে দাঁত চাপলো মহিন্দর : তুমি সরলার ব্যাটা ?

মায়ের নাম শুনে ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, হুঁ। আমার মাকে আপনি চিনেন ?

কিন্তু ততক্ষণে পাতা ফেলে তীরের মতো মহিন্দর উঠে দাঁড়িয়েছে। চীৎকার করে ডাক দিয়েছে, ভূষণ ?

ভূষণ শশব্যস্তে ছুটে এল। ত্রস্তস্বরে বললে, কী হৈল্ কুটুম, অমন করি পাতা ছাড়ি উঠিলা ক্যান ?

বজ্রকণ্ঠে মহিন্দর বললে, হামাক কি অপমান করিবার জন্য এইঠে ডাকি আনিছ ?

—অপমান ? অপমান কেনে ?

সমস্ত বৈঠক বিস্ময়ে ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠল। সবে মাংসের মন-মাতানো গন্ধটা বাস্তব রূপ ধারণ করে সম্মুখে এসে পৌঁছেছে। এমন সময় একি বিঘ্ন!

—কী হৈল্ কুটুম, হৈল্ কী !

মহেন্দ্র রুদ্রস্বরে বললে, কী হৈল্ না, সেইটাই হামাক কহ। সরলার ব্যাটা হামার সাথ মামলা করে, হামাক হাজতে পাঠাবা চাহে। তাক দিয়া হামাক খিলাবার চাহিছ, হামার অপমান হয় না ?

ভূষণ বললে, ইটা তুমি কী কহিছ কুটুম! মামলা হছে—সিতো আদালতের কারবার। এইঠে খানাপিনা হেবে, জাত-গোত্তর সব এক সাথ মিলিবে, এইঠে উসব ঝামেলা ক্যানে উঠাছ ?

—ক্যানে উঠামু না ? হামার মান নাই ? উয়াদের ডাকি আনি অ্যাতে যে খাতির নাগাছ, সিটা হামাকে বে-ইজ্জত হয় না ? হামি চইনু—

কথার সঙ্গে সঙ্গে আর অপেক্ষা করল না মহিন্দর। কাঁচা চামড়ার জুতোটা আঙুলের মাথায় তুলে নিয়ে বললে, যাছি। আর কুনোদিন আসিমু না।

রাসু বললে, আরে নাগর—বৈস বৈস। তুমার কি মাথা খারাপ হৈল্ ?

—হঁ, হৈল্। খারাপ হবার হৈলে আপনি হয়—কাউক কহিবার নাগে না। হামি যাছু।

ভূষণ বললে, কুটুম, কাণ্ডটা কী করোছ একবার ভাবি দেখ।

—দেখিছু—

—হামি হাতজোড় করি কহছি—

এক ঝাপটায় ভূষণের হাত সরিয়ে দিয়ে তিক্তস্বরে মহিন্দর বললে, খুব হৈছে। নতুন কুটুমগুলাক খাতির কর—উসবে হামাদের কাম নাই।

মুহূর্তে আনন্দিত ভোজের আয়োজনে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল মহিন্দর—নেমে গেল কাঁচা রাস্তায়। উত্তেজনার বশে জুতোটা পায়ে দেওয়ার কথা পর্যন্ত খেয়াল রইল না তার।

সমস্ত বৈঠকটা নির্বাক। সরলার ছেলে পাংশু রক্তহীন মুখে একটা প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই।

—দুই—

সেই মাঠটার ভেতর দিয়েই যখন মহিন্দর ফিরে চলল, তখন কেমন হালকা হয়ে গেছে তার মন। নিজের প্রতি অপমানের একটা মিথ্যে ছুতো করে অপমান করতে পেরেছে সরলার ছেলেকে, সেই সরলা, যৌবনে যে মহিন্দরের রক্তের ভেতরে বিষ বিস্তার করেছিল নাগিনীর মতো—আর আজও যে তেমনি নাগিনীর মতো ছোবল মারবার চেষ্টা করছে তাকে।

কিন্তু—

কিন্তু এতটা কি করবার দরকার ছিল? সরলার ছেলে তাকে পরিবেশন করতে এসেছে এটা কী এমন মারাত্মক অপরাধ, যার জন্যে ওভাবে পংক্তি-ভোজন নষ্ট করে বেরিয়ে আসতে হবে? অথবা শুধুই হিংসা—ওই জোয়ান ছেলেটার সমৃদ্ধ যৌবনের ঐশ্বর্যকে মহিন্দর সহ্য করতে পারল না?

কারণ যাই থাক, এটা ঠিক যে তার ভালো লাগছে না। আর এই ভালো না লাগাটা সঞ্চারিত হয়েছে সেই নির্জন মাঠের ভেতরে—সেই শীতের ঘুমন্ত রোদে। হঠাৎ মনে হল যেন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে—নিজের ভেতরে কোথাও কিছু একটা বিশৃঙ্খলা ঘটেছে তার।

সেই বিরক্ত বিস্বাদ দীর্ঘপথ পেরিয়ে যখন সবে নিজের গ্রামে এসে পা দিয়েছে এবং যখন পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা কী ঘটল, এমন সময় ডাক শুনতে পেল পেছন থেকে।

—মহিন্দর, মহিন্দর?

ডাক দিয়েছে বংশী মাষ্টার।

সঙ্গে সঙ্গে দারোগা সাহেবের চাপ-দাড়ির আড়ালে হিংস্র হাসির ছটাটা মনে পড়ে গেল মহিন্দরের। ঠিক সহজ মানুষ নয় বংশী পরামাণিক, অন্তত এতদিন যে দৃষ্টিতে মহিন্দর তাকে দেখে এসেছে, সেটা বংশী মাস্টারের আসল পরিচয় নয়। তার ভেতরে আরো একটা কিছু আছে—যেটাকে দারোগা সাহেব আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এবং মহিন্দরের মন বলছে, লক্ষণটা শুভ নয়, একটা ঝোড়ো মেঘের সংকেত শিখায়িত হয়ে উঠেছে সেখানে।

বংশী মাস্টার একটা খুরপি হাতে করে বাগান খুঁড়ছিল। একটা পাতলা গেঞ্জী গায়ে, এই শীতের বিকেলেও পরিশ্রমে সে ঘেমে উঠেছে। একটা বিলিতি বেগুন গাছের গোড়া পরিষ্কার করতে করতে বংশী ডাক দিচ্ছে, শোনো, শোনো মহিন্দর—

মহিন্দর দাঁড়িয়ে গেল অনিশ্চিতভাবে। মনের ভেতর কেমন এলোমেলো লাগছে, ভালো লাগছে না এখন আর কথা বলতে। তবু বংশী মাস্টারকে উপেক্ষা করা চলে না, তার কাছে নানা দিক থেকে কৃতজ্ঞ আছে মহিন্দর। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললে, কেন ডাকোছেন।

—একবার এসোনা এদিকে।

মহিন্দর ফিরল—গিয়ে দাঁড়ালো মাস্টারের বাগানের সামনে। প্রাইমারী ইস্কুলের লাগাও একখানা আটচালা খড়ের ঘরে বংশী মাস্টার বাস করে। বাইরে থেকে এসেছে এখানে—বিদেশী মানুষ। থাকে একাই—পরিবার-পরিজন আছে বলে কেউ জানে না।

তবু বেশ উৎসাহী কর্মিৎকর্মা লোক। চুপচাপ বসে থাকতে পারে না কখনো। ঘরের সামনে একটুকরো ফালতু জমি, যা পেয়েছে দিব্যি বাগান গড়ে তুলেছে তাতে। লাগিয়েছে কপি, মূলো, বেগুন, বিলিতি বেগুন, কড়াইশুঁটি। নিজে একা হাতেই সব করেছে মাষ্টার। মাটি কুপিয়েছে,

ইস্কুলের পাতকুয়ো থেকে বাগান বরাবর খুঁড়ে এনেছে জলের নালা, নিজের হাতে সজ্জা লাগিয়েছে, নিজেই তত্ত্বাবধান করেছে তার। ফলে এখন প্রসন্ন সবুজের দীপ্তিতে সারা বাগানটা উদ্ভাসিত হয়ে আছে। টুকটুকে লাল হয়ে পেকে রয়েছে বিলিতি বেগুন, উজ্জ্বল সবুজ হয়ে উঠেছে মুলোর শাক, গাঢ় নীল রঙের পুরু পুরু পরিপুষ্ট পাতাগুলো জড়িয়ে ধরে আছে দুধের মতো সাদা নিষ্কলঙ্ক কপির ফুল। সারা বাগানটায় যেন লক্ষ্মী তাঁর আঁচল বিছিয়ে দিয়েছেন --হাতের গুণ আছে মাষ্টারের।

অনিচ্ছুক পায়ে এসেও মহিন্দর মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে তাকালো বাগানটার দিকে। বললে, সাবাস হে মাষ্টার, খাসা বাগানখান করিছেন হে তুমার।

মাষ্টার তৃপ্তির হাসি হাসল।

—সেই জন্যেই তো ডাকছিলাম তোমাকে--বড় একটা ড্রামহেড্ বাঁধাকপির গায়ে সস্নেহ হাত বুলোতে বুলোতে মাষ্টার বললে, তোমরা এসব ভালো জানো, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। কপিগুলো তো এখনো আঁট বাঁধল না, বেঁধে দেব?

মাষ্টার অনেক 'নিখলেও' এমন অনেক কিছুই জানে না যা মহিন্দর জানে। সুতরাং মহিন্দরের তিক্ত বিস্বাদ মনটা আপনা থেকেই খানিকটা পুলকিত আর সহজ হয়ে এল। প্রাজ্ঞতার ভঙ্গিতে মহিন্দর বললে, না, না, এখন বাঁধিবেন না। ভালো জাইতের জিনিষ, আপনি ধরি যিবে।

—আর পাতাতেও পোকা লাগছে। —কপির পাতা থেকে একটা সবুজ কীট বার করে আনলে বংশী: সব খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে।

—তো হুঁকার জল ছিটাই দাও—পালাই যিবে।

—হুঁকার জল?—বংশী আবার হাসল: হুঁকো তো খাই না, জল পাব কোথায়?

সস্নেহ মৃদু ভঙ্গিতে মহিন্দর ভৎর্সনা করলে মাষ্টারকে: কেমন মাষ্টার হে

তুমি? বিড়ি খাও না, তামাকু খাও না তো ছাত্র পড়াও কেমন করি? আচ্ছা, হামি তোমাকে হুঁকার জল দিমু।

কথা হচ্ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হাতের খুরপিটাকে নামিয়ে রেখে বংশী বললে, একটু বসবে মহিন্দর? খুব তাড়া নেই তো?

একটু আগেই খুব তাড়া ছিল মহিন্দরের—কোথাও দাঁড়াতে ইচ্ছে ছিল না, স্পৃহা ছিল না কারো সঙ্গে কথা বলবার। ভাবছিল, বাড়ী ফিরে যাবে। ভূষণের ওখানে গিয়ে একটা অর্থহীন দুর্বোধ্য উত্তেজনায় যে কেলেঙ্কারীটা করে এসেছে, নিজের ভেতরে দেখবে সেটাকে বিচার করে, একটা হিসাব নেবে তার; একবার খিতিয়ে নিয়ে বুঝতে চাইবে, যা করে এসেছে তার আসল তাৎপর্য কী, তার মূল কোথায়। কিন্তু এখন মনে হল, একটু অন্যমনস্ক হওয়া দরকার, দরকার দুটো চারটে কথা বলা—যা সেই অপ্রিয়, অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

—না, তাড়া নাই।

—তবে একটু বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কথা! তার সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে বংশী পরামাণিকের? বসতে সে পারে, খোস গল্প করতে পারে খানিকক্ষণ, শাকসব্জী কী উপায়ে ভালো করা যায়, বাড়ানো চলে দ্রুত গতিতে, সে সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে পারে মহিন্দর। কিন্তু কথা! শুনলেই কেমন একটা খটকা লাগে, লাগে একটা অপ্রত্যাশিত চমক। দারোগা সাহেবের সেই জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে এর কোনো রকম সম্পর্ক নেই তো? কে জানে!

—কী কহিবা চহোছেন?

—এসো, বোসো এই দাওয়ায়।

মহিন্দর দাওয়ায় বসল এসে। এদিক থেকেও একটা বিশেষত্ব আছে বংশী পরামাণিকের—যা আগেকার কৈবর্ত পণ্ডিতের ছিলনা। এটা যে মুচিদের গ্রাম এবং এরা যে জুতো সেলাই করে অবসর সময়ে জমিতে চাষ দিয়ে

কালাতিপাত করে থাকে, একথাটাকে কৈবর্ত পণ্ডিত কখনো ভুলতে পারতনা। চামারদের প্রতি অনুকম্পার সীমা ছিলনা তার এবং সেজন্য সবসময়েই তার নাক খাড়া হয়ে থাকত আকাশের দিকে। এক কথায় সে মুচিদের ঘৃণা করত —চলত নিজের দূরত্ব বাঁচিয়ে। গলায় একগাছা পৈতে ঝুলিয়ে নিয়েছিল বামুনদের অনুকরণে, বুড়ো-আঙ্গুলের ডগায় সেটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সগর্বে বলত, হুঁ, হুঁ, আমরা জাত কৈবর্ত, তোদের মতো ছোট লোক নই।

বংশী পরামাণিক তার দলের নয়। নিজে জলচল নাপিতের ছেলে হয়েও মুচিদের সে করুণার চোখে দেখেনা, ওসব বালাই নেই তার। সযত্নে এবং সসমাদরে সকলকেই সে দাওয়ায় এনে বসায়, গল্পগুজব করে। জাত-বিচার নেই, ছোঁওয়া-ছুঁয়িও নেই।

বেলা পড়ে এসেছে, অল্প অল্প উঠেছে শীতের হিমেল্ হাওয়া। কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে বংশী বললে, তুমি তো গাঁয়ের সব চাইতে বিচক্ষণ লোক মহিন্দর, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। এবারে আমাদের ইস্কুলে সরস্বতী পূজো করলে কেমন হয়?

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না মহিন্দর: কী পূজা করিবা কহিছ?

—সরস্বতী পূজা!

—হায়রে বাপ! ইসব খেয়াল তুম্হার কেনে হৈল্ মাষ্টার?

—কেন, দোষটা কী? ইস্কুল বিদ্যার জায়গা, আর সরস্বতী হলেন গিয়ে তোমার বিদ্যার দেবী—এটা তো জানো?

—হঁ, সি তো জানি।

—তা হলে যেখানে বিদ্যা হয়, সেখানে বিদ্যার দেবীর তো পূজা করা উচিত?

—হঁ, সিতো উচিত।

—তবে পূজার ব্যবস্থা করি।

—থামো হে মাষ্টার—বংশীকে বাধা দিলে মহিন্দর: তুমি ঢের নিখিচ, যিটা কহিবা সিটা তো হেবে। কিন্তু পূজা কে করিবে?

—কেন—পূজো যে করে?

—কে বামহন্?—মহিন্দর ম্লানভাবে হাসল: ইবারে হামাক তুমি হাসাইলেন হে মাষ্টার। বামহনকে চিন নাই। উয়ারা মুচির পূজা করিবা আসিবে—এমন মানুষ নহ। কহিবা গেলে গালি দি তাড়াই দিবে।

—তবে তোমরা পূজো করো কী করে?—বংশীর মুখে বেদনার ছায়া পড়ল: তোমাদের পূজো করে কে?

—হামরা উসবের মধ্যে নাই। তো কালীপূজা হয়—ভিন্ গাঁয়ের সরকার মশাইয়ের নামত্ সংকল্প করিবা নাগে। ওই হামাদের পূজা—বাস্। ফের যে পূজা করি সিতো মদ আর হল্লা হয়, বামহন আর কী কামে নাগিবে!

বংশী চুপ করে রইল। নীচের ঠোঁটটাকে চিবিয়ে চলেছে মাঝে মাঝে, কী একটা কথা ভাবছে। মহিন্দর আবার বললে, তাই কহিছু, যেমন চালিছে ওই রকমটাই চলিবা দাও। নাহক ঝামেলা বাড়াই কি ফায়দা হেবে।

বংশী মুখ তুলে বললে, না পূজো হবেই।

—কে করিবে?

—তোমরাই।

—হামরা!—মহিন্দর হাঁ করে রইল। অনেক লেখাপড়া শিখলে এই রকম হয় নাকি মানুষের। মাথার ঠিক থাকে না? বংশী মাষ্টার প্রলাপ বকছে নাকি?

—কী কহিছ তুমি?

—যা বলছি, ঠিকই বলছি।

কিছু বুঝতে পারছে না মহিন্দর। অবাক বিস্ময়ে একবার মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে। যেন নিজের মস্তিষ্কের ভেতরের ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা আর

বিভ্রান্তিকে নিতে চাইল পরিচ্ছন্ন করে। বললে, তুমি যে কী কহিছ, হামি কিছু বুঝিবা পাইনু না।

—এতে না বোঝবার কী আছে?—মিষ্টি করে বংশী হাসল: তোমরাই পূজো করবে।

—হামরা? হামরা কেমন করি করিমু? হামরা কি বামহন, না হামাদের মন্তর-তন্তর আছে?

—কিচ্ছু লাগবে না, পূজো করলেই হবে।

আর সন্দেহ নেই যে মাষ্টারের মাথা খারাপ। মহিন্দর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, উসব মতলব ছাড়ি দাও মাষ্টার। দেবতাক লিয়ে উসব চালাকি করিলে মুস্কিল হেবে।

—বোসো বোসো, অত চটে যেয়োনা।—বংশী বললে, আমি তো অনেক লেখাপড়া শিখেছি। কোন দোষ হবে না।

—দোষ হেবে না? তুমাক্ কে কহিলে?

—বইতে লেখা আছে—ছাপার বইতে।

হঁা!—এবার আর কথাটাকে মহিন্দর অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিতে পারল না। এইখানেই দুর্বলতা আছে তার—বন্ধন আছে। ছাপার বইয়ের মতো বিশ্বাস্য এবং নির্ভরযোগ্য আর কিছুই নেই তার কাছে।

—হ্যাঁ? চোখ বড় বড় করে মহিন্দর বললে, বইয়ত্ নিখিচে?

—হ্যাঁ—লিখেছে।

—তো তোমার যিটা খুসি হয়, সেটাই করেন। হামি আর কী কহিব। মহিন্দর জবাব দিলে আস্তে আস্তে। মাষ্টার যে যুক্তি দিয়েছে, তার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা নেই তার—অথচ সেটা মেনে নেওয়াও শক্ত। তাই অর্ধ-সংকুচিতভাবে মহিন্দর বলে গেল, হামরা তো নিখি নাই। হামাদের ফের পুছি কী হেবে?

বংশী বুঝল হার মেনেছে মহিন্দর, কিন্তু তার মন মানেনি এখনও। তা

নাই মানুক, তার জন্যে আর উৎসাহ নষ্ট করা চলে না। বংশী বললে, বেশ ত্যাই হবে। কিন্তু পূজো করতে হলে খরচ-খরচা আছে, কিছু চাঁদা তো চাই।

—চাঁদা? আচ্ছা, দিমু চাঁদা।

—শুধু তাই নয়। গাঁয়ের সকলের কাছ থেকেও কিছু কিছু আদায় করে দিতে হবে।

—হুঁ—সিটাও পারা যিবে। কিন্তু তুমি হামাক ভাবনাত্ ফেলিলেন মাষ্টার।

—কিছু ভাবতে হবে না, ঠিক হয়ে যাবে সমস্ত।

বেলা পড়ে এল, গ্রামের বাঁশবনের ওপারে অস্তে নামল সূর্য। দেখতে দেখতে ঘনালো শীতের ঠাণ্ডা সন্ধ্যা। মাষ্টারের সব্জী বাগান থেকে মূলোর ফুলের একটা বুনো গন্ধ সঞ্চারিত হতে লাগল বাতাসে। মহিন্দরের শীত করতে লাগল, বংশী মাষ্টার আরো ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলে কাপড়ের খুঁটখানা। কথা শেষ হয়ে গেছে—ঠিক নতুন করে কোনখানে আরম্ভ করা যাবে সেটা এখনও কিছু স্থির করতে পারছে না কেউ। আর সেই কয়েক মুহূর্তের নীরবতার মধ্যে মহিন্দরের সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত মন আবার ফিরে গেল সেই ফসলহীন ন্যাড়া মাঠটার রৌদ্র-ঝলসিত পটভূমিকায়। মনে পড়ল, দারোগা সাহেবের সেই অশ্বারোহী মূর্তি। চাপদাড়ির ভেতরে বাতাস চিরে চিরে খেলা করে যাচ্ছে—একটা মিশ্রিত বিচিত্র গন্ধ – ঘোড়ার ঘামের আর ধূলোর।

ইতস্তত করে মহিন্দর বললে, আচ্ছা মাষ্টার।

—কী বলছিলে?—অনাসক্ত কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল বংশী।

মহিন্দর আবার ইতস্তত করল। একবার ভেবে নিতে চেষ্টা করল প্রশ্নটা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে নেওয়াটা সঙ্গত হবে কিনা। কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে দারোগা সাহেবের সন্ধান নেওয়ার পেছনে শুধুমাত্র নির্দোষ কৌতূহলই প্রচ্ছন্ন নেই।

—কহিতেছিনু—গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে মহিন্দর বললে, কহিতেছিনু, ই গাঁয়ের মানুষগুলাক কেমন দেখিছ?

বংশী হাসল: হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

—না এমনি শুধাইনু। এইঠে—এই চমার গাঁয়ে তুমার ভালো নাগে?

বংশী তেমনি হাসিমুখে জবাব দিলে, ভালো লাগে বলেই তো এখানে আছি।

—হঁ, তুমার ঠাঁই পঢ়ি ছোকরাগুলান মানুষ হবা পারে নাগিছে। চাষার ছোয়া—নাম সহি করিবা পারিলেই কাম হই যিবে।

—শুধু নামসই করবে কেন? অনেক লেখাপড়া শিখবে, শহরে পড়তে যাবে।

—হায় হায়—কপালে হাত চাপড়ালে মহিন্দর: অমন বরাতখানা করি কি আর আসিছে। বলদ তাড়াবা আর জুতা সিলাবা পারিলেই প্যাটের ভাত করি লিবে। উসব ছাড়ি দাও।

প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা থাকলেও বংশী করল না। মহিন্দরের কথায় বাধা দিয়ে কোনো লাভ হয় না, বরং তাকে আরো বেশি উত্তেজিত করে তোলা হয়—এ অভিজ্ঞতা তার আগেই হয়েছে। বংশী চুপ করে রইল।

উসখুস করতে লাগল মহিন্দর, তারপর বলে ফেলল, আচ্ছা মাষ্টার, দারোগা সাহেবকে তুমি দেখিছেন?

বংশী চকিত হয়ে উঠল: কোন্ দারোগা সাহেব?

—হাবিবগঞ্জ থানার বড় দারোগা?

—না, কেন?

—এমনি কহিতেছিনু—মহিন্দর হঠাৎ উঠে পড়ল: তবে এখন হামি চলি। তোমার হুঁকার জল পাঠাই দিমু।

মাষ্টারকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত চলে গেল

মহিন্দর। সবজী বাগানের পাশ দিয়ে নেমে গেল গাঁয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন কাঁচা রাস্তাটায়।

সে দিকে তাকিয়ে একবার ভ্রূকুঞ্চিত করলে বংশী। শেষ প্রশ্নটার ভেতরে সন্দেহের অবকাশ আছে। অত্যন্ত অকারণে এবং নিতান্ত অসংলগ্নভাবে ও কথাটা চট করে জিজ্ঞাসা করবার অর্থ কী হতে পারে? এবং পৃথিবীতে এত লোক থাকতে হাবিবগঞ্জ থানার বড় দারোগার সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিনা এই কথাটা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য কী?

বংশী বুঝতে পারল এক ফালি মেঘ দেখা দিয়েছে আকাশের প্রান্তে। কালো মেঘ—সে মেঘে অনাগত দুর্যোগের সংকেত। হয়তো এখানেও থাকা চলবে না, যেখান থেকে যে স্রোতে সে এসেছিল, সেই স্রোতের টান আবার তাকে ডাক দিয়েছে। অন্তত মহেন্দ্রের কথার মধ্যে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল।

অন্ধকার দাওয়ায় চুপ করে বসে থাকতে থাকতে বংশী মাষ্টারের পিছনের জীবনটা চোখের সামনে দেখা দিলে কতগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া ছবির টুকরোর মতো। কী হতে চেয়েছিল, কী হল শেষ পর্যন্ত। নিষ্ঠুর কঠিন ঘা লেগে বিপর্যস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল সমস্ত—একটা ভঙ্গুর ধাতুপাত্রের মতো চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে গেল এদিকে ওদিকে। আজকের বংশী মাষ্টার তাই একটা সম্পূর্ণ জিনিষ নয়—নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই তার। নিজের বিচূর্ণ সত্তার একটা খণ্ড মাত্র—নিজেরই একটা ভগ্নাংশ।

শুধু কি একাই বংশী মাষ্টার? অথবা তার মতো আরো অনেকে—আরো অসংখ্য গণনাতীত মানুষ—যারা মধ্যবিত্তের সন্তান। তাদের চাইতে ঢের ভালো এই মুচিরা, যাদের আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, কোনো মোহের অস্তিত্বমাত্রও নেই নিজেদের সম্পর্কে। কোনো মতে নামসই করতে পারলেই শিক্ষার এতবড় বিপুল বিস্তীর্ণ জগতের ওপর থেকে সরে যায় তাদের দাবী। ক্ষেতে হাল দিতে পারলে কিংবা চামড়ায় শক্ত করে সেলাই দিতে জানলেই তারা পরিতৃপ্ত—তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত।

কিন্তু—

কিন্তু আশ্চর্য জটিল মধ্যবিত্তের জীবন, তার পরিকল্পনা। সঞ্চয় অল্প, কিন্তু শেষ নেই আকাঙ্ক্ষার, সীমা নেই দুরাশার ব্যাপ্তির। তাই মন যত ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় সামনের দিকে ততই টান পড়ে পেছনের লোহার শেকলে। অসহায় আক্রোশে নিজেদের ক্রমাগত আঘাত করে যায়, তারপরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে—চরম পরাজয়ের গ্লানিকে মেনে নেয় অবসন্ন একটা জানোয়ারের মতো।

শীতটা বড় বেশি করে ধরেছে, মাঠের পার থেকে আসছে কনকনে উত্তুরে বাতাস। আর দাওয়ায় বসে থাকা চলেনা। একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল বংশী মাষ্টার, ঘরে এসে ঢুকল, জ্বালালো লণ্ঠনটা।

ময়লা লণ্ঠন, চিম্‌নিতে ধোঁয়ার লাল আস্তর। তবু তারি আলোতে শুদ্ধ শীতল অন্ধকারটা বিদীর্ণ হয়ে গেল। ঠাণ্ডায় ভিজে ভিজে দেওয়াল থেকে মাটির গন্ধ উঠছে, মেজে থেকে উঠছে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। সবটা ভালো করে আলো হয়নি, টুকিটাকি জিনিসপত্রের আড়াল আবডালে যেন কতগুলো ছায়ামূর্তি গুঁড়ি মেরে আছে। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল বংশী মাষ্টার—যেন নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে চাইল কাদের অতি সতর্ক নিঃশব্দ সঞ্চার। তারপর আলোটা আরো একটু তেজ করে দিয়ে উঠে বসল ঠাণ্ডা শক্ত বিছানাটার ওপরে। বসবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা মচ মচ করে উঠল—আর একবার চমকে উঠল বংশী।

নিজের ছেলেমানুষী ভয়ে নিজেরই হাসি পেল। তবু সাবধান হওয়া ভালো। বংশী একবার মাথা ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে দেখল বিছানাটার নীচে অনুজ্জ্বল ছায়ার ভেতরে। বিছানাটা খাটের নয়, বাঁশের মাচার। খাটের রেওয়াজ এদেশে বড় নেই—মাচাতেই শোয়ার ব্যবস্থা। পাতলা কম্বলের নীচে বাঁশগুলো প্রথম প্রথম পিঠে লাগত, লাল হয়ে দাগ ধরে যেত সকালে, হাত লাগলে চিনচিন করত। এখন আর ওসব হয়না—অভ্যস্ত হয়ে গেছে সমস্ত।

মাচার সবটাই বিছানা নয়, তার একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে গোটা দুই টিনের তোবড়ানো স্যুটকেস্। একটা স্যুটকেস্ ছোট—আর একটা বেশ প্রমাণসই চেহারার। এরাই মাষ্টারের সম্পত্তি। ছোট স্যুটকেস্টা এককালে সৌখীন ছিল, ওপরে গোটা কয়েক গোলাপফুল আঁকা ছিল তার। ছেলেমানুষি খেয়ালে ওই গোলাপফুলগুলোর ওপরে ভারী একটা মোহ ছিল মাষ্টারের। কিন্তু সেগুলিকে রাখা যায়নি, রঙ চটে গিয়ে বসন্তের দাগের মতো কতগুলো রঙের ছিটে ছড়িয়ে আছে শুধু।

ময়লা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসতে মাষ্টারের নতুন করে যেন চোখ পড়ল ওই বাক্সটার ওপরে, হাসি এল। শুধু ওই বাক্সটার ওপরে আঁকা গোলাপ ফুলগুলোই নয়, সমস্ত জীবনেই আজ ক্ষতচিহ্নের মতো বিস্তীর্ণ হয়ে আছে চটে যাওয়া রঙের ছিটে।

অনেক স্মৃতি আছে ওই বাক্সটার সঙ্গে। ওটা যে কিনেছিল তার নাম ছিল অতুল মজুমদার, তখন কাটিহারের একটা হিন্দুস্থানি হোটেলে একটা অন্ধকার খুপ্রিতে সে পড়ে থাকত, খেত পুরী আর অড়হরের ডাল। তারপর বাক্সটার অধিকারী হল নুরুদ্দিন তালুকদার, গায়ে মস্ত শেরওয়ানি আর এক মুখ চাপদাড়ি নিয়ে সে আমিন গাঁ প্যাসেঞ্জারে চড়ে চলে গেল। তারও পরে আরো অনেকে ওটাকে ভোগ করেছে মালিকানা স্বত্বে, হরেন চৌধুরী, শিবনাথ সাহা, ইব্রাহিম দফাদার—সবগুলো নাম মনেও পড়ে না। এখন ওর মালিক বংশী পরামাণিক—কে জানে আরো কত হাত বদলাবে? কিন্তু—

কিন্তু হঠাৎ দারোগা সাহেবের কথাটা কেন বলল মহিন্দর? কেমন খটকা লাগছে। লক্ষণ ভালো নয়। কাল একবার ভালো করে খবরটা নিতে হবে।

তবু আজ ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এর যেন শেষ নেই। নিজের সম্পর্কে এই অতি প্রখর সতর্কতা, এই যাযাবরবৃত্তি। আর নয়—আর সহ্য

হয় না; চিরদিন এই ক্লান্তিকর চলার চাইতে কোথাও এসে ঢের ভালো থেমে দাঁড়ানো, হোক সে পাথরের প্রাচীরে ঢাকা একটা শ্বাসরোধী অবক্ষয়, তার সামনে থাক কঠিন লোহার গরাদে। তবু সে একরকমের বিশ্রান্তি, একটা নিশ্চিত প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি। শিবনাথ সাহা একবার প্রায় নিরুপায় হয়ে নিজের বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, খুব কি ভুল করেছিল সে?

হঠাৎ বংশী মাষ্টারের মনে পড়ল একটি মেয়ের কথা। পিঠভরা চুল ছিল, আর ভারী মিষ্টি দুটি ডাগর ডাগর চোখ। শ্যামবর্ণ ছোটখাটো একটি মেয়ে, হালকা পাতলা ঠোঁট দুটি দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করা যেতনা এত ক্ষুরধার তার রসনা। অতুল মজুমদারের সঙ্গে কলহের তার আর বিরাম ছিলনা। দেখা হলেই ঠোকাঠুকি বাধত। তর্ক সে করবেই, যুক্তি নাই থাকুক, ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলবে, না, না, তোমার কথা কিছুতেই আমি মানব না!

মানেওনি শেষ পর্যন্ত। আশ্চর্য, এমন একটা উল্লেখযোগ্য মানুষ অতুল মজুমদার, বেশ সম্মানিত একটি ছোটখাটো নেতা, এত কাজ, এত দায়িত্ব। তবু সে দায়িত্বের ভিড়ের ভেতরেও অতুল মজুমদার ভুলতে পারেনি যে একটি অতি দুর্বল অথচ অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আছে তার—যাকে তর্কে না হোক, জীবন দিয়ে জয় না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

আজ পর্যন্ত সংকল্প সিদ্ধ হয়নি। আজ কোথায় অতুল মজুমদার—একবিন্দু জলের মতো যেন মুছে গেল মাটির বুক থেকে, ঝরে গেল ঘাসের শিসের একটুকরো শিশিরের মতো। যারা তাকে মনে রেখেছে তাদের আকর্ষণটা প্রেমের নয়। সেই ছোট মেয়েটি—নাম বোধ হয় ছিল শান্তি—তার তো ভুলে যাওয়া আরো বেশি স্বাভাবিক। কিন্তু অতুল মজুমদার যদি কোথাও বেঁচে থাকে, তার ভোলা চলবে না। তাকে মনে রাখতে হবে—

সুতরাং বংশী পরামাণিক হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। সব যেন গল্পের মতো মনে হয়, মনে হয় উপন্যাসের ছেঁড়া পাণ্ডুলিপির পাতা এলোমেলো ভাবে পড়ে চলেছে সে। কী লাভ এতে, কতটুকু দাম এর। শুধু এইটেই সত্য যে থামলে চলবে না, এখনো থামবার সময় হয়নি। পাথরের শক্ত প্রাচীর আর লোহার গরাদের অন্তরালে যে বিশ্রাম, তা অপমৃত্যু, তা আত্মহত্যা—সেদিনকার ছোট মেয়েটিকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতির চূড়ান্ত অমর্যাদা!

কিন্তু আর বসে থাকা ঠিক নয়, রান্না করতে হবে। এবারের কাঠগুলো ভিজে, সহজে জ্বলতে চায়না। অনেকখানি উৎসাহ আর উদ্যম অপব্যয় করতে হয় তার পেছনে। সুতরাং এখন থেকেই অবহিত হওয়া দরকার।

মাচার বিছানা থেকে মাটিতে একবার পা ঠেকিয়েই বংশী মাষ্টার আবার জড়ো-সড়ো হয়ে বসল। বিশ্রী ঠাণ্ডা পড়েছে আজ—এই সন্ধ্যে বেলাতে যেন আড়ষ্ট আর অসাড় করে দিতে চাইছে শরীরটাকে। শুধু উনুন ধরানো নয়, জল ঘাঁটাঘাঁটির কল্পনাতেও মন বিদ্রোহ করে বসল। থাক, আজ আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই। কিছু মুড়ি চিঁড়ে সঞ্চিত আছে, সন্ধান করলে একখানা তালের পাটালিও মিলতে পারে, ওতে করেই আপাতত কুলিয়ে যাবে একরকম।

টিনের ছোট স্যুটকেস্‌টা খুলে একখানা বই বার করলে মাষ্টার, তারপর লণ্ঠনটা কাছে এগিয়ে এনে পড়তে শুরু করলে। সারা গায়ে মাটি লেগে আছে, পা একবার ধুয়ে নিলে ভালো হত। কিন্তু বড্ড শীত ধরেছে আর ভারী আরাম লাগছে মোটা চাদরটার উষ্ণমধুর স্নেহাশ্রয়। মাষ্টার পড়ায় মনোনিবেশ করলে।

বাইরে অদ্ভুত প্রশান্ত হয়ে গেছে রাত্রি। ইস্কুলটা একটু নিরালায়—একটা ছোট ঘাসে ভরা মাঠ, তারপর একটুখানি বাগান, সেইটে ছাড়িয়ে গ্রাম শুরু। ওখানকার মানুষের কলকণ্ঠ এখানে এসে পৌঁছোয় না, তা ছাড়া এমনিতেই তো সন্ধ্যা হতে না হতে গ্রামের লোক কোনো রকমে দুমুঠো গিলে ছেঁড়া কাঁথা

আর জীর্ণ পাতলা লেপের তলায় আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। পড়তে পড়তে মাষ্টার বার কয়েক মাথা তুলল, কান পেতে যেন কিছু একটা শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। শুধু অনেকদূরে একসঙ্গে গোটাকয়েক শেয়াল আর্তনাদ করে উঠল, প্রত্যুত্তরে খেঁকিয়ে উঠল গ্রামের গোটা কয়েক কুকুর।

রাত বাড়তে লাগল, পড়ে চলল মাষ্টার। সময় কাটতে লাগল। বাইরে অন্ধকারের ভেতরে ফিকে জ্যোৎস্না পড়েছে, শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্না। অল্প অল্প কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে ধোঁয়ার মতো। সেই ধোঁয়াটে ধূসরতার মধ্যে ছোট ছোট কতকগুলি কালো ছায়া অতি দ্রুতগতিতে হাওয়ার ওপরে নাচতে নাচতে চলে গেল—একদল চামচিকে। সামনের সব্‌জী বাগানে দুধের মতো শাদা টাটকা কপির ফুলে চিকমিক করছে জ্যোৎস্নার গুঁড়ো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সঞ্চারিত হচ্ছে ভিজে ঘাস আর মূলোর ফলের বুনো গন্ধ।

ঘরের বাইরে 'ঠক্‌-কোঁ-ঠক্‌-কোঁ' করে একটা টানা সুরেলা আওয়াজ উঠল। তক্ষক ডাকছে, এ ঘরের দাওয়াতেই কোথাও বাসা করে আছে। মাথার ওপরে ঘরের চালে কুর্‌ কুর্‌ কুট্‌ কুট্‌ করে একটা ক্ষীণ অবিচ্ছিন্ন শব্দ—বইয়ের ওপর ছড়িয়ে পড়ল খানিকটা মিহি হলদে গুঁড়ো, আড়ার বাঁশ কাটছে ঘুণে। মাষ্টারের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

বই বন্ধ করে বংশী পরামানিক একবার তাকালো আকাশের দিকে, দৃষ্টি মেলে দিল ম্লান জ্যোৎস্না আর লঘু কুয়াশায় বিবর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জের শূন্যতায়। আকাশের শোভা দেখবার জন্য নয়, রাত কত হয়েছে সেইটেই যেন অনুমান করতে চাইছে। তারপর মস্ত একটা হাই তুলে সমস্ত শরীরের আচ্ছন্নতা যেন কাটিয়ে নিলে একবার, আড়মোড়া ভেঙে সরিয়ে দিলে এতক্ষণের শীতার্ত জড়তার প্রভাব। আর দেরী করা চলে না, এই রাত্রেই তার অনেকগুলো কাজ সেরে নিতে হবে।

মাষ্টার খাট থেকে নামল। ঘরের কোণা থেকে বার করে আনলে একটা

ছোট মেটে হাঁড়ি, কানা উঁচু একটা কাঁসার থালা। হাঁড়ির ভেতরে চিঁড়ে গুড় দুই ছিল, বসে বসে তাই কাঁচা অবস্থায় কড়মড় করে চিবিয়ে নিলে খানিকটা। এইতেই বেশ কেটে যাবে রাতটা। অতুল মজুমদারের কথা মনে পড়লে এখনও কষ্ট হয় তার। কী বিলাসী ছিল লোকটা, খাওয়া-দাওয়ার কতরকম বাছ-বিচার ছিল তার। আশ্চর্য, সে লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

যে-কোনো রকম খাওয়া তার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তবু বেশিক্ষণ চিঁড়ে চিবুতে কষ্ট হয়, আটকে আসে চোয়াল, পেটের মধ্য থেকে কেমন বিশ্রী একটা শীতলতা নাড়ি বেয়ে শিউরে শিউরে উঠে আসে, ঝাঁকুনি লাগে মাথার ভেতরে। চিঁড়ে খাওয়া বন্ধ করে মাষ্টার ঢক ঢক করে ঘটিখানেক জল ঢেলে দিলে গলায়। কনকনে ঠাণ্ডা জল—দাঁতগুলো একসঙ্গে যেন ঝনঝন করে নড়ে উঠল তার। পেটের থেকে উদ্গত সেই শিহরণটা মাথার ভেতরে যেন আরও জোরে জোরে ধাক্কা মারছে। বংশী মাষ্টার উঠে পড়ল।

দেওয়ালের কোণে দড়িতে ঝোলানো ময়লা ছিটের কোটটা চড়িয়ে নিলে গায়ে, পরলে ছাত্রদের উপহৃত শক্ত বেঢপ জুতোজোড়া। আর একবার সন্দিগ্ধ শঙ্কিত চোখে তাকালো বাইরের বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায়-ভরা ঘাসের মাঠটার দিকে, আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ আর বিবর্ণ নক্ষত্রের সভার দিকে। তারপর মোটা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে লণ্ঠনটা যতদূর সম্ভব ক্ষীণ করে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

টেনে দিলে দরজার শিকল, পরিয়ে দিলে ছোট একটা পেতলের তালা। না, কোথাও কেউ নেই—নিঃসাড় শান্তিতে তেমনি করেই ঘুমুচ্ছে পৃথিবী। চাঁদের ঘোলাটে চোখে ধোঁয়ার মতো উড়ন্ত কুয়াশা—দুধের মতো সাদা নতুন ফুলকপিতে জ্যোৎস্নার গুঁড়ো। মূলো শাকের পাতা কাঁপছে, হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে ফলন্ত বিলিতি বেগুনের ঝাড়। গ্রামে কুকুর কেঁদে উঠল—অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর সুরে। তারপরেই কেঁউ করে একটা কাতর আর্তনাদ

—কেউ বিরক্ত হয়ে একটা ঢিল ছুঁড়েছে অথবা বসিয়ে দিয়েছে এক ঘা লাঠি।

দাওয়ার ওপর কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কী ভাবল মাষ্টার, একবার কামড়ে নিলে একটা কড়ে আঙুলের নখ, তারপর সতর্ক পায়ে নীচের মাঠে নেমে গেল। তারও পরে জ্যোৎস্নায় তার দীর্ঘ দেহ আর দীর্ঘাকার কালো ছায়াটা ক্রমশ একাকার হয়ে হারিয়ে গেল ধূসর শুভ্রতার মধ্যে।

—তিন—

বড় ভাই সুরেন বাড়িতে নেই, মেজ ভাই হারাণও না। সুরেন গেছে শ্বশুরবাড়ী, তার শাশুড়ীর যায় যায় অবস্থা, খবর দিয়ে গেছে পথ-চলতি লোক। সুরেনের যাওয়ার অবশ্য খুব বেশি ইচ্ছে ছিল না, রোগা খিটখিটে হাড়-কিপ্পন শাশুড়ী সম্পর্কে কোনরকম মোহও নেই তার। খবরটা যখন আসে তখন সে মন দিয়ে বড় একটা ঢাকে ছাউনি দিচ্ছিল। শুনে মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, মরিবে তো মরুক। বুঢ়ী হই একটা শকুনের মতো বাঁচি থাকিলে কিবা লাভ হেবে সিটা কহ।

পথ-চলতি মানুষটি বলেছিল, তভো তো শাশুড়ী, তুমার একবার যাওয়া নাগে দাদা।

—হামি যাবা নি পারিমু—আঙুল দিয়ে ঢাকের কোণাগুলো ঠুকে ঠুকে সুরেন বলেছিল, হামরা কামের মানুষ না? বুঢ়ী মরিলেই মঙ্গল। বাপ, যখের মত টাকা আগলাছে বসি বসি। শ্বশুরর ঠাঁই একটা ভালো পির্‌হান চাহিনু তো ফের হামাক খ্যাঁক খ্যাঁক করি শিয়ালের মতো কামড়াবা চাহোলে। হামিও কহিনু, তুই তোর পাইসা লিয়ে ধুই ধুই খা—হামি যদি কেষ্ট মুচির ব্যাটা হই তো তোর বাড়ীত্‌ ফের না আসিম্‌।

—ঝিট়া হইছে—ওইটাক যাবা দাও কেনে।

—ক্যামন করি যাবা দিমু হে? বুঢ়ীর যেমন শিয়ালের মতো মুখ, উয়াক অম্‌নি করি শিয়ালে খিবে, ইটা তোমাকে সাফা বাত্‌ কহি দিনু—বুঝিলা?

সুরেন মানুষটা ওই রকম। এমনি মনা খুব খারাপটি নয় তার, কিন্তু একবার চটে গেলে আর তার পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। একটা জামা চেয়ে না পাওয়াতে শাশুড়ীর ওপরে সেই যে বিরূপ হয়ে আছে, এ পর্যন্ত সে বিরূপতা তার কাটেনি। সুতরাং লোকটি তাকে যতই সদুপদেশ দিক, সে ভ্রূক্ষেপ করল না, নিবিষ্ট চিত্তে ঢাকে চাঁটি দিয়ে চলল।

প্রতিজ্ঞায় শেষ পর্যন্ত হয়তো বা অটল থেকে যেত সুরেন, কিন্তু বিঘ্ন ঘটে গেল। খবর পেয়ে সুরেনের স্ত্রী হাঁউ মাউ করে কান্না শুরু করলে। এমন প্রচণ্ড চীৎকার ধরে দিলে যে, বহুক্ষণ দুহাত দিয়ে কান চেপে রইল সুরেন। তারপর বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হল, থাম বাপ, আর চিল্লাছিস্ ক্যানে। হামার খুব আক্কেল হইছে—চল্ চল্, কুন্ঠে মরিবা যাবু সেইঠেই চল্।

অতএব সুরেনকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়েছে। আজ রাত্রেই যদি শাশুড়ী মরে, তা হলে কালই তাকে পুড়িয়ে কিছু মদ আর মাংস খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবে, আর যদি মরতে দেরী করে তবে ফিরতেও দু চারদিন দেরী হতে পারে। অবশ্য সুরেন আশা করে যে, গিয়ে দেখবে, যাওয়ার আগেই বুড়ীর হয়ে গেছে। হারাণও বাড়ী নেই। কোথায় বিয়ে বাড়ীতে একটা ঢোলের বায়না নিয়ে গেছে, সেখানে বাজিয়ে ফিরতে পরশুর আগে নয়। তা ছাড়া আর একটা জিনিষও অনিশ্চিত হারাণের সম্পর্কে। মদটা একটু বেশিমাত্রায় খায়—এবং খেয়ে বরদাস্ত করতে পারে না। সুরেনও মদ খায় বটে, কিন্তু ওজন করে, কখনো মাতাল হয় না। হারাণের ঠিক উলটো। মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না, দুচারদিন নেশায় বেহুঁস হয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারে। সংসারের দায়িত্বটা একান্তই সুরেনের—হারাণকে বাড়ীর সকলে একরকম খরচ লিখে রেখেছে। বিয়ে একটা করেছিল, কিন্তু এমন প্রচণ্ড উৎসাহে বৌকে ঠ্যাঙ্গাত যে, রাতারাতি বৌ বাপের বাড়ীতে পালিয়ে বেঁচেছে। আনতে গেলে নথ নাড়া দিয়ে বলেছিল, বাপ, ডাকাইতের ঘরে হামি ফের নি যামু। হামাক মারি ফেলিবে।

সেই থেকে আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে হারাণ। চরিত্রটাও ভালো নয়। হাড়ীপাড়া থেকে দুদিন মার খেয়ে এসেছে, তবু লজ্জা হয়নি। এখনো এপাড়া ওপাড়ায় ঘুর ঘুর করে। সুরেন চটে গিয়ে সাংসারিক সম্পর্কটা ভুলে গাল দিয়ে বলেছে, উ শালাক একদিন কাটি গাঙে ভাসাই দিমু, তবে হামি কেষ্ট মুচির ব্যাটা।

কিন্তু হারাণের সংশোধন হয়নি।

আর বাকী আছে যোগেন।

বাড়ীর ছোট ছেলে—সেই জন্যই দাদাদের চাইতে একটু ব্যতিক্রম। লেখাপড়ার দিকে একটু ঝোঁক ছিল তার, তাই উচ্চ প্রাইমারীতে বার দুই ফেল করলেও এ গ্রামে সেই সবচাইতে শিক্ষিত ব্যক্তি। চেহারা আর চালচলন দেখলে তাকে কেষ্ট মুচির ছেলে বলে মনে হয় না। হাটের বারে চার পয়সা দামের রঙীন সাবান কিনে আনে, অনেকক্ষণ ধরে সেইটে গায়ে ঘষে ঘষে নিজের বর্ণ-গৌরব বাড়াবার চেষ্টা করে। অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাতে করে বেশ মাজা রং হয়েছে যোগেনের। মাথায় টেরী কাটতে শিখেছে, জামা-কাপড় একটু ময়লা হলে সেগুলোকে ক্ষার দিয়ে কেচে না নেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। মদ একটু আধটু হয়ত খায়, কিন্তু ঝোঁকটা সস্তা সিগারেটের দিকে। অবশ্য সেটাও যে খুব ভালো লাগে সুরেনের তা নয়। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, বড় ভুল হই গিছে হে। লাট সাহেবের ব্যাটা হই তুমি চামারের ঘরে আসিলা ক্যানে?

মৃদু হেসে যোগেন টেরীর দিকে মনোনিবেশ করে।

তবু গজর গজর থামে না সুরেনের। চামড়া কাটতে কাটতে বিতৃষ্ণা-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, সকলে যদি গায়ে ফুঁ দিই বেড়ায়, তো হামি চালামু কেমন করি? যার যিটা লিয়ে সে ভাগ হই যাও, হামাক মাপ কর কেনে।

কিন্তু মুখে যা বলে মনে মনে তা ভাবেনা সুরেন। তাই হারাণ নিশ্চিন্তে বেড়ায় স্বেচ্ছাভোজন করে, তাই টেরী বাগানোতে কখনও বিঘ্ন ঘটে না

যোগেনের। জমি-জমা, মামলা-মোকদ্দমা সব কিছু স্বরেনই দেখা-শোনা করে, বাকী দুভাই তাই যেন পাহাড়ের আড়ালে বাস করছে।

যোগেনের শুধু বাইরের পরিচ্ছন্নতাটাই একমাত্র লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব নয়, শুধু যে সে গ্রামের সবচাইতে বিদ্বান ব্যক্তি তাও নয়, আরো অনেকগুলো গুণ আছে তার। যেমন স্বাস্থ্য-ঝলমল সুন্দর চেহারা, তেমনি তার গানের গলা। মাঝখানে কিছুদিন গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে গিয়েছিল, যোগ দিয়েছিল ওখানকার ছোট একটা যাত্রার দলে। গান গেয়ে নাম করেছিল, এক জায়গায় চাঁদির মেডেলও পেয়েছিল একখানা কিন্তু কেন কে জানে ওখানকার আবহাওয়াটা তার ভালো লাগেনি—মনের সঙ্গে সুর মেলনি যাত্রার দলের জীবনযাত্রার। দর্শক হিসেবে যে জগৎটাকে স্বপ্নপুরী বলে তার ভ্রম হয়েছিল, সান্নিধ্যে যেতেই সে সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ ঘটল। একটা রগচটা অধিকারী, কথায় কথায় হুঁকো নিয়ে মারতে আসে। গাঁজাখোর ভীমের সঙ্গে মাতাল শ্রীকৃষ্ণের চুলোচুলি লেগেই আছে। রোজ রাত্রে আসরের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে অধিকারীর সঙ্গে কুশ্রী কলহ, কদর্য খাওয়ার ব্যবস্থা। অবশ্য যোগেন চাষী চামারের ছেলে, বাড়ীতে যে নশো পঞ্চাশ রকমের খায় তাও নয়, কিন্তু সে খাওয়ায় তৃপ্তি আছে, পেটভরা ভাতের ব্যবস্থা আছে। রাতের পর রাত জেগে গোরুর জিভের মত মোটা রাঙা চালের আধপেটা ভাত, জলের মত বিউলির খেসারীর ডাল আর শুকনো ডাঁটার সঙ্গে পুঁইপাতা এবং কুমড়োর চচ্চড়ি, এটা বরদাস্ত করা শক্ত। একদিন আসরে যখন 'সাবিত্রী সত্যবান্' নাটক খুব জমে এসেছে, তখন সত্যবান্‌বেশী যোগেন অধিকারীকে অথই দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে—ফিরে এসেছে গ্রামে।

কিন্তু যাত্রার দলের মোহ কাটলেও যাত্রার নেশা কাটেনি। জমজমাট আসর, ঝাড়লণ্ঠনের আলো আর ঘন ঘন হাততালি মাদক স্বপ্নের মতো ঘন হয়ে আছে তার রক্তের মধ্যে। আরো অনেকটা দূরে সরে এসে আজ সেই

আলোকোদ্ভাসিত আসরটা একটা মায়াময় রূপ পরিগ্রহ করেছে কল্পনার নেপথ্যলোকে। যোগেন ভাবছে, এবার নিজেই একটা যাত্রার দল খুলবে—এমন দল গড়বে যে, অন্যান্য দলগুলোর এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত গর্ব-গৌরবকে ম্লান করে দেবে একেবারে। কিছুদিন থেকে সে চেষ্টাই সে করে আসছে।

কিন্তু মুস্কিল এই, ভালো পালা পাওয়া যায় কোথায়? যে সব পুরোণো পালা এতদিন ধরে চলে আসছে, সেগুলোকে নিয়ে বাহাদুরী দেখানো শক্ত। আশপাশের নানা দল এক একটা বই নিয়ে এমন খ্যাতি জমিয়ে বসেছে যে, সেখানে দাঁত বসানো সম্ভব নয়। হারাধন অপেরা পার্টির মতো 'রাম বনবাস' কেউ করতে পারে না, শশী অধিকারীর দলের মতো 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' করা সম্ভব নয় কারুর পক্ষে, দাস কোম্পানীর মতো 'পাণ্ডব-বিজয়' আর 'মহিষমর্দিনী' কেউ জমাতে পারবে না। মোটামুটি সব ভালো পালাগুলো সম্পর্কেই এই এক অবস্থা—ওদের কোনো একটা নিয়ে আসরে নামলেই হাজার ভালো হলেও মুখ বাঁকাবে লোকে, বলবে, দূর দূর, রাম অধিকারীর দল না হলে এ পালা কি কেউ করতে পারে?

কাজেই মুস্কিলের কথা। দলকে নাম কিনতে হলে ভালো বই চাই, চাই নতুন বই। খুব ভালো না হোক মাঝামাঝি হলেও চলবে, কিন্তু যেমন করে হোক, নতুন বইয়ের দরকার। সে বই কোথায় পাওয়া যায়?

সাত-পাঁচ ভেবে দিশেহারা যোগেন ঠিক করলে, একটা আলকাপের দল দিয়েই আরম্ভ করা যাক। আলকাপের পালা বাঁধা শক্ত নয়, খানিকটা রসিকতা আর প্রচুর গান থাকলেই দলের নাম হয়ে যাবে। আশেপাশে দল নেই বললেই চলে, অথচ চাহিদা আছে প্রচুর। কাজেই এদিক থেকে প্রায় একচ্ছত্র হতে পারবে যোগেন। তা ছাড়া আরো একটা দিকও আছে। গোড়াতেই যাত্রার দল গড়ে বসতে গেলে বিস্তর খরচপত্তর, বাদ্যি-বাজনা কিনতে হবে, পোষাক কিনতে, হবে, কিনতে হবে টিনের খাঁড়া তলোয়ার। তার মানে বেশ কয়েকশো টাকার ধাক্কা। গোড়াতেই সে ধাক্কা সামলানো

দস্তুরমত শক্ত। তার চাইতে আলকাপের দল গড়ে যদি কিছু টাকা পয়সা কামিয়ে নেওয়া যায় তবে তাই দিয়ে পরে বেশ ভালো রকম একটা যাত্রার দল তৈরী করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

সুতরাং অনেক বিচার বিবেচনা করে যোগেন ঝোঁক দিয়েছে আলকাপের দলের দিকেই। প্রথমটা সুরেন চটে উঠেছিল : নাচি কুঁদি বেড়াইলেই খালি চলিবে, ঘর বাড়ীটা দেখিবা হয়না ?

সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে যোগেন : তুমি দেখিবে।

—হামি দেখিমু !—ক্ষেপে গিয়ে সুরেন বলেছে : ত তোরা সব আছেন কোন্ কামে ?

অনাবশ্যক বোধে দাদার কথার জবাব দেয়নি যোগেন।

—হামি পারিমুনা—ই কথাটা সাফ সাফ কহি দিনু।

কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সাফ সাফ জবাব দিয়ে এ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারেনি সুরেন। আজও পারল না। যোগেনের গান শুনে প্রথম প্রথম বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তার মুখ, তারপর আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গেছে সে মুখ থেকে, দেখা দিয়েছে প্রসন্নতার দীপ্তি। আগে কানে হাত দিত, এখন যোগেনের গানের সুর ভেসে এলেই কান খাড়া করে সুরেন। সত্যি ভালো গায় যোগেন, নিজের ভাই বলে নয়, এমন মিষ্টি গলা সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না। আজকাল ভাইয়ের জন্য গর্ব বোধ হয় সুরেনের। আগে যাদের কাছে, অনেক নিখিয়াও হামার ভাইটা মানুষ নি হৈল্, বলে আক্ষেপ করত, এখন তাদের কাছে গিয়ে সগৌরবে ঘোষণা করে : বড় মিঠা গলা হামাদের যোগেনের। হামাদের ভাই তিনটার মধ্যে ওই একটাই বা মানুষ হৈল্।

তাই বাড়ীতে এখন অবাধ প্রশ্রয় যোগেনের।

শুধু ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটতে কুটতে মাঝে মাঝে বকাবকি করে যোগেনের মা।

—হাঁরে, তুই এমন করিই সারাটা জীবন কাটাবু নাকি ?

—সিটাই তো ভাবিছু—দুষ্টামিভরা হাসিতে উত্তর দেয় যোগেন।

—উসব ক্যাপামি রাখি দে কেনে। সুরেনকে তো কহি চ্যাংড়াটার বিহা দে—এত বড়টা হৈল্, পাখির মতন উড়ি উড়ি এইঠে ওইঠে বেড়াছে। বিহা দিলে ঘরত্ মন নাগিবে, সংসারের দুইটা চাইরটা কামও তো করিবে।

—হামি বিহা নি করুম।

—বিহা নি করিবু তো কি করিবু ?

—গান করিমু। আলকাপের দল করিমু—গাহি বেড়ামু। বিহা করিলেই তো ঘরত্ বসি বৌয়ের খোঁটা শুনিবা নাগিবে।

—ত যেইঠে খুশি যা—বিরক্ত হয়ে মা জবাব দেয়। মনে মনে খুশিও হয়। ছেলেদের বিয়ে দিয়ে খুব সুখী হয় নি যোগেনের মা। বৌয়েরা ঘরে এসেই নিজেদের নির্দিষ্ট অধিকারকে চিনে নিয়েছে, প্রতিষ্ঠা করতে শিখে নিয়েছে তাদের দাবী। বিশেষ করে বড় বৌ যেমন মুখরা, তেমনি প্রচণ্ডা। তার ক্ষুরধার রসনার সামনে দাঁড়াতে ভয় করে। নাক নাড়া দিয়ে বলে, হামি কাঁ্যাহোকে ডর খাই না। কাহারো খাছি, না পরোছি ?

যোগেনের মা কোণঠেসা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঝগড়া করতে চেষ্টা করে না তা নয়, কিন্তু এটা বেশ বোঝে যে, একটা দুর্বল ভিত্তির ওপরে সে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তা পায়ের নীচে থেকে ধ্বসে পড়তে পারে। এখন বৌদের যুগ। তাদের মেনে চললেই মান থাকবে, নইলে নয়। ছেলেরা মুখে যতই মাতৃভক্ত হোক. মনে মনে সব বৌয়ের আঁচলের তলায় চাপা পড়ে আছে ; নালিশ করলে বৌকে দুটো চারটে ধমক হয়তো দেবে চক্ষুলজ্জার খাতিরে, কিন্তু মনে মনে একবিন্দুও খুশি হবে না। এবং পাল্টা মাকেও হয়তো উপদেশ দিয়ে বলবে, তুমরাই ফের অ্যাতে গজর গজর করোছ ক্যানে ? একটু চুপ মারি থাকিলে তো হয় !

তাই যতদিন যোগেন একান্ত করে নিজের আছে, ততদিনই ভালো। বয়স বাড়ছে, বিয়েও করবে, কিন্তু যোগেনের মা আশা করে ততদিন পর্যন্ত সে বাঁচবে না। সে মরে গেলে বউয়েরা এসে যতখুশি ঝগড়া করুক, কূট-কচাল করুক, সংসার ভাগাভাগি করুক, তাতে তার এতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, একটা কথাও সে কইতে আসবে না।

আজ সন্ধ্যায় বাড়িটা ফাঁকা। সুরেন গেছে বৌ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে, হারাণ কোথায় গেছে ঢাকের বায়না নিয়ে। যোগেন রক্ষা করতে গেছে নিমন্ত্রণ। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে, তুলসীমঞ্চটায় প্রদীপ দিয়ে যোগেনের মা যখন দাওয়ায় উঠে এল তখন ঠাণ্ডাতে হাত-পা কালিয়ে উঠেছে তার। আজ বড় বেশি শীত পড়েছে—মাঘের বাতাসে দাঁত বেরিয়েছে যেন। তাছাড়া বয়েস হয়েছে যোগেনের মার। আগের মতো জোর নেই শরীরে, রক্তে নেই আর যৌবনের সে উত্তপ্ত চঞ্চলতা। এখন একটু খাটলেই কেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়, কেমন বিশ্রী রকমের শীত ধরে।

একটা মাটির মালসায় আগুন নিয়ে এসে বসল যোগেনের মা। কাঠ কয়লার বেশ গনগনে আগুন উঠেছে, আড়ষ্ট আঙুলগুলো তাতে সেঁকে নিতে লাগল। সত্যিই বয়েস হয়েছে এখন, দুর্বল আর অশক্ত হয়ে পড়েছে শরীর। সংসারের জন্যে আর খাটতে ইচ্ছে করে না, ভালোও লাগে না। সমস্ত শরীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেবার জন্যে—নিশ্চিন্ত একটা বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায়।

ভালোই হয় যোগেনের বউ এলে। হয়তো বড় বউয়ের মত মুখরা হবে না, কথায় কথায় নাক নেড়ে ঝগড়া বাধাবে না তার সঙ্গে। অথবা হারাণের বউয়ের মতো সামান্য ছুতো করে পালিয়ে যাবে না বাপের বাড়িতে। গাঁয়ের একটি মেয়ের ওপরে নজরও আছে তার—কিন্তু হতভাগা ছেলেটার যেরকম ক্ষ্যাপাটে মেজাজ, যদি ঘাড় বাঁকিয়ে বসে তাহলে সহজে তাকে আর বশে আনা যাবে না।

ছেলের কথাটা মনে পড়তেই স্নেহের একটা মধুরতায় যেন প্লাবিত হয়ে গেল সমস্ত অনুভূতিটা। চমৎকার গানের গলা হয়েছে যোগেনের। এত মিষ্টি—এমন দরাজ! ওর বাপের গলার আওয়াজে কাক চিল উড়ে যেত, ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত কুকুর, কিন্তু এমন অপূর্ব মাতাল-করা গলা কোথায় পেল যোগেন?

হঠাৎ চমকে উঠল যোগেনের মা। ঠাণ্ডা হিম হয়ে-আসা রক্তের ভেতরে কী একটা শিউরে শিউরে বয়ে গেল তার। বিয়ে হওয়ার পরেও নিজেদের মধ্যে কী একটা সামাজিক গণ্ডগোলে অনেকদিন তাকে ঘরে নেয়নি যোগেনের বাপ। আর সেই সময়—সেই সব দিনে—

এমনি কণ্ঠ—এমনি গান, এমনি রূপ। সে গানে সে মাতাল হয়ে গিয়েছিল, সে রূপে সে জ্বলে গিয়েছিল। কত নির্জন রাত্রিতে কত নিঃশব্দ দেখা সাক্ষাৎ—কত ভালোবাসা। সে ভালোবাসার আস্বাদ সে কণামাত্রও পায়নি স্বামীর কাছ থেকে, মনে হয়েছে তার স্বামী যেন পরপুরুষ, তার ছোঁয়ায় শরীর শিউরে শিউরে উঠেছে তার। স্বামীর বুকের ভেতরেই মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে অসীম তিক্ততায় সে চোখের জল ফেলেছে রাতের পর রাত। স্বামী কিছু বুঝতে পারেনি, সন্দেহও করেনি। মোটা বুদ্ধির চোয়াড়ে লোক, ভেবেছে এ কান্না বাপ মাকে ফেলে আসবার জন্য এবং তার সাধ্যমতো সান্ত্বনাও দিতে চেষ্টা করেছে সে। সে মানুষকে ভুলতে পারেনি তবু—তাকে ভোলা কি কখনো সম্ভব? সে লুকিয়ে ছিল তার ভাবনায়, সে ঘুরে ঘুরে দেখা দিয়েছে তার স্বপ্নে। তাই হয়তো যোগেন হয়েছে তারি প্রতিমূর্তি—অবিকল তারি ছবি হয়ে জন্ম নিয়েছে যোগেন—সেই নাক, সেই মুখ, সেই গানের গলা।

জলন্ত মালসাটার ওপরে যোগেনের মার অস্থিসার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। কাঠ কয়লার রক্তাক্ত টুকরোগুলো থেকে একটা লাল আলোর প্রতিফলন এসে পড়েছে আঙুলগুলোতে—নিজের হাতটাকে যেন চিনতে

পারা যায় না। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যোগেনের মার ঘোর লাগতে লাগল। যেদিন প্রথম যৌবন এসেছিল তার—সেদিন আঙুলের রং শুধু আগুনের প্রতিফলক ছিল না, তাতে সত্যি সত্যিই ছিল গোলাপী আমেজ। কত দিন এই হাত দুটিকে সে টেনে নিয়ে নিজের ঠাণ্ডা বুকের ভেতরে চেপে ধরেছে, বলেছে—

ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল, তার পরেই আর একটা শব্দ উঠল ঝনাৎ। সদরের টিনের ঝাঁপটা খুলে কেউ ভেতরে আসছে। নিজের সর্বাঙ্গে যেন জোর করে একটা ঝাঁকি দিয়ে সজাগ হয়ে উঠে বসল যোগেনের মা। উঠোনটা পার হয়ে কে আসছে ঘরের দিকে। ওই পায়ের শব্দটা চেনা— যোগেন ফিরল।

—আইলু রে বাপ?

—হঁ, আইনু।

সংক্ষেপে জবাব দিয়ে যোগেন এগিয়ে এল দাওয়ার দিকে। তাকিয়ে দেখল, মালসার সামনে বসে তার মা হাত সেঁকছে।

—উঃ, বড় বেয়াড়া জাড়া নামিলে আজ। যোগেন বসে পড়ল মায়ের পাশে, নিজেরও হাত দুটো আগুনের ওপরে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, মাঠের ভিতর দি আসিবা সময় মনে নাগিল কি শরীরখানা মোর কাটি দুখান হই যিবে।

—হঁ, ইবারে জাড়াটা বেশী নাগোছে—যোগেনের মা বললে, এইঠে বসি একটু গরম হই লে বাপ।

মালসার ওপরে হাত বাড়িয়ে নিরুত্তরে বসে রইল যোগেন। মায়ের মন থেকে এখনো স্মৃতির রেশ কাটেনি—সহজভাবে ছেলের সঙ্গে কথা বলবার মতো মনের অবস্থা তার ফিরে আসেনি এখনো। আর যোগেন কী ভাবছে কে জানে, তার উৎসাহ-উজ্জ্বল মুখ কালিমাড়া। শুধু কয়েক মিনিট পরে মা-ই প্রথম কথা বললে।

—গেইলছিলু কুটুম বাড়ী? •

—হঁ।

—ভালো খিলাইলে?

—হঁ।—তেম্‌নি সংক্ষেপে উত্তর দিলে যোগেন

—কী কী খিলাইলে রে?

—ভাত, মাংস, মিঠাইও আছিল্‌।

—পেট ভরি খালু তো রে?

এবার বিরক্ত স্বরে জবাব দিলে যোগেন। অপ্রত্যাশিতভাবে মাতৃস্নেহের নিতান্ত নির্দোষ প্রশ্নটাকে আঘাত দিয়ে বসল, বোকার মতো কথা শুধাইছ ক্যানে? কুটুম বাড়ী গেনু তো ফের না খাই চলি আসিনু?

সন্ধিগ্ধভাবে মা তাকালো ছেলের দিকে। আগুনের আঁচ অল্প অল্প মুখে পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে ছেলের মুখের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগছে, সন্দেহ হচ্ছে, একটা গোলমাল জড়িয়ে আছে কোথাও।

—কী হৈল্‌ তোর রে?

—কিছু হয় নাই।

—কিছু নি হইছে তো অমন করোছিস্‌ ক্যানে?

—কী করোছি? বাজে কথাগুলান ক্যানে কহিছ, চুপ মারি থাকো ক্যানে।

যোগেন আর বসল না, বিরক্তভাবে উঠে চলে গেল সামনে থেকে।

যোগেনের মা কিছু বুঝতে পারল না, ইচ্ছে করেই কোনো কথা বললও না যোগেন। বলে কোনো লাভ নেই—অকারণে একটা লোক তাকে অপমান করেছে, অথচ সে অপমান তাকে নীরবে পরিপাক করে যেতে হল, এটাকে স্বীকার করতে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে তার।

দোষ তার নয়, তার মায়েরও নয়। তবু খামোকা লোকটা কতগুলো কটুকথা শুনিয়ে গেল—বেরিয়ে গেল মেজাজ দেখিয়ে। অবশ্য তার জন্যে কেউ তাকে ভালো বলেনি, ছি ছি করেছে সকলেই। ভূষণ তো গালাগালি করেছে

অশ্রাব্য ভাষায়। যোগেনের কাছে এসে জোড়হাতে বলেছে, তুমি হামাকে মাপ করো বাবাজী।

ভূষণকে সে ক্ষমা করেছে বইকি, কিন্তু ভারী একটা আফশোষ রয়ে গেছে নিজের মধ্যে। সে কেন কিছু করতে পারল না, দিতে পারল না একটা মুখের মতো জবাব? একহাতে বুড়োর গলাটা চেপে ধরে আর একহাতে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল না তার গালে? শক্তি তার নিশ্চয়ই ছিল, সাহসেরও অভাব ছিল না, কিন্তু কোথায় যেন আটকে গেল সমস্ত। আক্রমণের অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই দেখল, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা।

আচ্ছা, ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল। দাঁতের ওপর দাঁত চাপিয়ে একটা কঠিন নিষ্ঠুর সংকল্প গ্রহণ করলে যোগেন।

রাত বাড়তে লাগল। যোগেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছে, খেয়ে এসেছে অবেলায় তাই রাত্রে সে আর কিছু খাবে না। যোগেনের মা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন শুতে গেল, তখন একবার উঁকি মেরে দেখলে ছেলের ঘরের ভেতরে। লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে একটা কাগজে সে নিবিষ্ট মনে কী যেন লিখে চলেছে।

—বেশি রাইত জাগিস্ না বাপ।

—তুমার কিছু ভাবিবা হেবে না, তুমি শুতি যায়েন।

মা চলে গেল। মনটাকে সংযত করে নিয়ে যোগেন বসল হাট থেকে কেনা চার পয়সা দামের একটা এক্‌সারসাইজ বুক আর কাগজ-কলম টেনে। কয়েকটা গান লিখতে হবে। আলকাপের পালা তৈরী হচ্ছে, তারই গান।

লেখবার আগে গুন্ গুন্ করে সুর ভাঁজতে লাগল। সুর এলে তারপরে আসবে কথা, মনের ভেতরে অসংলগ্ন ভাবনার নীহারিকাপুঞ্জ একটা সুনিশ্চিত রূপ ধারণ করবে আস্তে আস্তে। যোগেনের সুরের সঙ্গে সঙ্গে কথা সঞ্চারিত হতে লাগল:

হায় হায় কলির কাণ্ড—কিবে চমৎকার—

যার পরনে ছিঁড়া কাপড় বৌয়ের গলাত্ রত্নহার—

বাঃ—মন্দ শোনাচ্ছে না! বেশ নতুন জিনিস দাঁড়াচ্ছে, লোকে খুশি হবে। কাগজে কলম চলতে লাগল:

আপন ভাইয়ক পর করিয়া,

ফুর্তি করে শালাক লিয়া—

শ্বশুরক্ বাপ বুলিয়া

বাপক্ কহে নফর তার—

হায় গো কলির কাণ্ড দাদা—কিবে

চমৎকার।

সত্যিই চমৎকার। নিজের রচনায় যোগেন মুগ্ধ হয়ে গেল। এইরকম গোটা কতক জমাট গান বাঁধতে পারলেই দলের নামডাক পড়ে যাবে, সাবাস সাবাস করবে সকলে। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ভরা-আসরে গলায় চাদর জড়িয়ে যোগেন যখন গান গাইতে উঠে দাঁড়াবে, তখন ঘন ঘন হাততালি পড়তে থাকবে, চিকের আড়ালে ছল ছল করে উঠবে তরুণীদের বুকের রক্ত। পথ দিয়ে যখন যাবে তখন লোকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বলবে, ওই যাচ্ছে যোগেন আলকাপওয়ালা।

ওই যাচ্ছে যোগেন আলকাপওয়ালা!

তারপর—তারপরে সামনে আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আরো উজ্জ্বল সম্ভাবনা। শেষ পরিণতি শুধু আলকাপের দলই নয়। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে একটা যাত্রার আসর। কালীয়দমন না অনন্তব্রত? লক্ষ্মণ-বর্জন না সীতার পাতাল প্রবেশ?

যোগেন হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল। মনে পড়ল বংশী পরামাণিকের কথা। লোকটার সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় ঘটে গিয়েছিল তার।

হাটের মধ্যে পরিচয় করে দিয়েছিল জগবন্ধু সাহা। তার কাটাকাপড়ের

দোকানে বসে ছিল বংশী মাষ্টার—কাপড় কিনছিল। যোগেন গিয়েছিল একখানা গামছার সন্ধানে। জগবন্ধু বলেছিল, ইয়্যাক চিনেন মাষ্টার?

মাষ্টার ঘাড় নেড়েছিল। তারপর আশ্চর্য ঝকঝকে দুটি চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছিল যোগেনের দিকে। কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল যোগেন, কেমন মনে হয়েছিল মাষ্টারের দৃষ্টিটা বড় বেশি তীক্ষ্ণ, বড় বেশি জ্বলন্ত। অমন অদ্ভুতভাবে কাউকে কখনো কারো দিকে সে তাকাতে দেখেনি

জগবন্ধু বলেছিল, খুব ভালো গান করে, আলকাপ।

—আলকাপ! আলকাপ কী?

এবারে মাষ্টারের প্রশ্নে দুজনেই হেসে উঠেছিল। জগবন্ধু বলেছিল আলকাপ? আলকাপ জানেন না? রসের গান, ফেস্তার গান।

মাষ্টার তবু প্রশ্ন করেছিল, সে কী রকম?

তখন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল জগবন্ধু। পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিল জিনিসটা।

সমাজের যেসব গলদ আর ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, রসিকতার সঙ্গে বিদ্রূপের কড়া চাবুক মিশিয়ে সেগুলোকে পরিবেশন করা হয়। দরকার হলে বাস্তব নরনারী পর্যন্ত বাদ পড়ে না—তা সে যতই ক্ষমতাশালী হোক—সমাজে য খুশি প্রতিপত্তিই তার থাকুক। তবে শুধু আক্রমণই নয়—লঘু কৌতুক হালকা হাসি ও কাহিনীর আকারে নাচে এবং গানে শুনিয়ে দেওয়া হয়।

বর্ণনা শেষ করে উচ্ছ্বসিত ভাষায় জগবন্ধু বলেছিল, ভারী চমৎকার জিনিস মাষ্টার মশাই, ভারী চমৎকার। একবার শুনিলেই বুঝিবেন। হাঁ হে যোগেন মাষ্টার বাবু তো এদেশে লৌতুন আসিছেন, উয়াক একদিন গান শুনাই দাও ন কেনে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—শুনামু তো—সাগ্রহে যোগেন জবাব দিয়েছিল।

মাষ্টার তেমনি তাকিয়েছিল তার দিকে—তেমনি জ্যোতির্ময় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কেমন উসখুস করছিল যোগেন—একটা লোক অমন নির্মম বিশ্লেষণভরা চোখে

তাকিয়ে থাকলে ভালো লাগে না। গামছা কেনবার প্রয়োজনের কথাটা ভুলে গিয়েই উঠে গিয়েছিল জগবন্ধুর দোকান থেকে।

কিন্তু মাষ্টারকে এড়াতে চাইলেও এড়ানো গেল না। হাট থেকে যখন সে ফিরছিল, তখন আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছে—শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। গাঁয়ের মেটে রাস্তায় আমের জামের ছায়া, বাতাসে সে ছায়া দুলছে—তার ভেতরে জ্যোৎস্নার টুকরোগুলো যেন মস্ত একটা কালো জালের ভেতর এক ঝাঁক উজ্জ্বল চাঁদা মাছের মতো দোল খাচ্ছে। মনসা কাঁটাগুলো জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে—মনে হচ্ছে রাত্রি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বন-গোলাপের সঙ্গে মিশেছে ধুতরোর গন্ধ—একটা রঙীন নেশায় আচ্ছন্ন আর আবিষ্ট করে তুলেছে সন্ধ্যাকে।

পায়ের নীচে বালি মেশানো মেটে রাস্তা, জ্যোৎস্নার টুকরোগুলো যখন তার ওপরে পিছলে পিছলে যাচ্ছে তখন সেখানেও যেন কী সব উঠছে চিকমিক করে। বালির ভেতরে কী মিশে আছে ওগুলো? সোনার কণা না রূপোর বিন্দু? আজকের রাতটাই যেন সোনার রাত—আজ আকাশ থেকে যেন রূপো গলে গলে পড়ছিল। গান পেয়েছিল যোগেনের—বেশ চড়া সুরে সে ধরে দিয়েছিল:

বঁধুর লাগি মাথায় নিলাম কলঙ্কেরি ডালা,
সেই কলঙ্ক ফুল হল মোর হল গলার মালা—

আগে আগে একটা লোক চলেছিল, জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে তাকে চোখে পড়ছিল বটে, কিন্তু যোগেন লক্ষ্য করেনি। ভেবেছিল, হাট-ফেরৎ সাধারণ মানুষ, মনোযোগ দেবার মতো কোন কারণ আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু যোগেনের গান কানে যেতেই লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

সোনায় ভরা রাত্রি—জ্যোৎস্নায় রূপোর কণা ঝরে পড়ছে। ধুতরো আর বন-গোলাপের গন্ধ নেশার মতো ঝিকমিক করছিল স্নায়ুতে। দেখেও দেখেনি যোগেন। আধ-বোজা চোখে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছিল:

শুকায়নি নদী—

পথের পাশে একটুখানি সরে একেবারে নয়ানজুলীর পাশ ঘেঁসে ছায়ার ভেতরে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। যোগেন কাছে এসে পড়তেই বললে, বাঃ—খাসা গলা তো তোমার।

চমকে থেমে গেল যোগেন। বংশী মাষ্টার।

বংশী মাষ্টার বললে, গান থামালে কেন? দিব্যি লাগছিল।

লজ্জিতভাবে যোগেন জবাব দিয়েছিল, ইসব গান আপনাকে শুনাইতে সরম নাগে।

বংশী মাষ্টার লঘুস্বরে বললে, কেন, আমাকে এত বেরসিক ভাবছ কেন?

কথাটার অর্থ যোগেন বুঝেছিল। তেমনি লজ্জিতভাবে শুধু মাথা নেড়েছিল, জবাব দেয়নি।

ততক্ষণে দুজনে একসঙ্গে পথ চলতে শুরু করেছে। যোগেনের পাশাপাশি চলেছে বংশী মাষ্টার—অকারণেই নিজেকে অত্যন্ত সংকুচিত বোধ করছে যোগেন। তার মনের ভেতর একটা ব্যক্তিত্বের সুনিশ্চিত ছায়া পড়েছে—অন্ধকারেও কি তেমনি জ্বল জ্বল করছে বংশী মাষ্টারের চোখ?

কয়েক মুহূর্ত শুধু শোনা গেল ধুলোয় ভরা পথের ওপর প্রায় নিঃশব্দ দুজোড়া পায়ের শব্দ। তারপর বংশীই কথা কইল।

—তুমি কতদূরে যাবে যোগেন?

—মীরপাড়া।

—ওঃ, তাহলে একসঙ্গেই অনেকটা যাওয়া যাবে। ভালোই হল।—বংশী মাষ্টার আবার হাসল: তোমাদের দেশটা এখনও আমার ভালো করে চেনা হয়নি। বামুনঘাটের চৌমাথায় এলে মাঝে মাঝে আমার পথ ভুল হয়ে যায়—ঠিক ঠাহর করতে পারি না। একবার তো ভুল করে কাঞ্চন নদীর ঘাট পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।

যোগেন এবারে সহজভাবে কথা বলতে পারল। বললে, ভুল হেবে ক্যানে? পুবদিকের ঘাঁটাটা ধরিলেই সিধা চামারহাটা চলি যাবেন।

মাষ্টার এবার শব্দ করে হেসে উঠল: ওই তো মুস্কিল। এখনো পুব পশ্চিমই ঠাহর করতে পারলাম না এদেশে।

আবার স্তব্ধতা। আবার মেটে রাস্তার ওপরে প্রায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে দুজনে। হঠাৎ মাথার উপরে একটা দোয়েল শিস্ দিয়ে উঠল। যেন চমক ভেঙে গেল দুজনের। মাষ্টার বললে, একটা কথা বলব যোগেন?

—কী কহোছেন?

—তোমাদের আলকাপ গানের কথা শুনলাম। বড় ভালো জিনিস, বড় ভালো লাগল।

বিনয়ে মাথা নত করলে যোগেন।

—যারা মন্দ লোক, যারা অন্যায় করে—মাষ্টারের গলা কেমন ভারী ভারী হয়ে উঠল: তাদের পরিচয় লোককে জানিয়ে দেওয়ার মতো বড় কাজ সত্যিই কিছু নেই। এদিক থেকে তোমরা দেশের কাজ করছ যোগেন, সত্যিই দেশের কাজ করছ।

এবার আশ্চর্য হয়ে গেল যোগেন। দেশের কাজ—সে আবার কী? জিজ্ঞাসু চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইল মাষ্টারের দিকে, অন্যমনস্কভাবে চলতে গিয়ে হোঁচট খেল একটা।

মাষ্টার বললে, কিন্তু এর চাইতেও তো বড় কাজ আছে যোগেন। সে কাজ কেন করোনা?

—কী করিবা কহছেন?

মাষ্টার যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল: কতই তো করবার আছে। অন্যায় কি শুধু একদিকেই? ছোট জাত—সবাই তোমাদের ছোট করে দেখে। তোমরা লেখাপড়া জানো না, জমিদার চল্লিশ টাকা নিয়ে চেক লিখে দেয় পনেরো টাকার, তাতে তোমরা টিপ সই করে দাও, তারপর তিনমাস পরেই

আসে উচ্ছেদের নোটিশ। মহাজনের কাছ থেকে সাতটাকা ধার করলে সুদে বাড়তে বাড়তে হয় সাতাত্তর টাকা—ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে দেনা শোধ হয় না। কেন এর প্রতিবাদ করতে পারো না যোগেন, কেন একে গানে রূপ দিতে পারো না ?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল যোগেনের। মাষ্টার বলে কী !

—জমিদারের নামে গান বাঁধিমু ?

—বাঁধবে বই কি ?

—মহাজনকে গালি দিমু ?

—হাঁ,—তাও দেবে।

—হায়রে বাপ !—ভীত কণ্ঠে যোগেন জবাব দিলে, উয়ারা ফ্যাসাদ করি দিবে যে।

মাষ্টার শান্তস্বরে বললে, দিতে পারে।

—তবে ?—যোগেন আড়চোখে মাষ্টারের মুখের দিকে তাকালো, যেন এই জটিল কঠিন সমস্যার সমাধান দাবী করলে।

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বংশী মাষ্টার বললে, আচ্ছা যোগেন ?

—হঁ, কহেন।

—তুমি তো খানিকটা লেখাপড়া শিখেছ ?

—হঁ, পঢ়িছি তো।

—চারণ কাকে বলে জানো ?

এতক্ষণে দুপাশের আমের জামের ছায়া সরে গেছে। চতুর্দশী চাঁদের আলো উজাড় হয়ে পড়েছে পথের ওপর—সম্মুখে মেটেরাস্তার ওপরে প্রসারিত দুটি দীর্ঘ ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই কোথাও। দুদিকে চন্দ্রোজ্জ্বল মাঠ। বাতাসে এখন আর সেই মাদক গন্ধটা নেই। শুধু ধুলোর একটা সৌরভ উঠছে।

বংশী মাষ্টারের চোখ কি সত্যিই জ্বলছে, না জ্যোৎস্নায় চকচক করছে ওই

রকম? সে চোখের দিকে একবার তাকিয়ে যোগেন দ্বিধাজড়িতভাবে বললে, কী কথা কহিলেন?

—চারণ?

—না, সিটা কখনো পড়ি নাই।

—শোনো। আগে যখন শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণ করত—মাষ্টার বলতে শুরু করল, তার মনের ভেতর থেকে কোথায় যেন একটা পাথর চাপা সরে গেছে, সরে গেছে একটা অবরোধের আবরণ। অনেক দিন পরে অতুল মজুমদার কথা কয়ে উঠল, সাড়া দিয়ে উঠল কোনো একটা গভীর বিস্মৃতির সুপ্তিলোক থেকে। বহুবছর আগে যে লোকটা ঘাসের বুকে শিশিরের বিন্দুর মতো হারিয়ে গেছে বিস্মরণের নেপথ্যে, সে যেন বংশী পরামাণিকের সামনে এসে দাঁড়াল।

অতুল মজুমদারের কথাগুলো বলে যেতে লাগল চামারহাটের প্রাইমারী ইস্কুলের ষোলো টাকা মাইনের মাষ্টার বংশী পরামানিক। কাকে বলছে খেয়াল রইল না, যাকে বলছে, সে কতটুকু বুঝতে পারছে লক্ষ্য করল না। এই সোনার রাত্রিতে—রূপো-ঝরা জ্যোৎস্নায় মনের ভেতরে হঠাৎ যেন খুলে গেল বহুদিনের মরচে-ধরা কঠিন একটা লোহার কবাট।

যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলতে লাগল বংশী মাষ্টার।

ইতিহাসের কথা, চারণদের গল্প। সেই তাদের কথা, যারা নিজেদের যা কিছু কণ্ঠ যা কিছু সুর—সমস্তই দেশের জন্য নিবেদন করে দিয়েছিল। অত্যাচারী শত্রু যখন পঙ্গপালের মতো এসে হানা দিয়ে পড়ত দেশের ওপর, তখন তারাই সকলের আগে বীণা হাতে বেরিয়ে আসত। দেশের প্রান্তে প্রান্তে তারা ঘুরে বেড়াত—তাদের গানে গানে ঝরে পড়ত দেশপ্রেমের আগুন —দেশের গৌরব রক্ষা করবার নির্মম কঠিন সংকল্প। যারা ভীরু—সে ডাক শুনে ফুটে উঠত তাদের হিমরক্ত—যারা কাপুরুষ, তারা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে অসংকোচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত মৃত্যুর মধ্যে। ঘুমন্ত দেশকে জাগিয়ে

দিত তারা, নির্জীবতার মধ্যে সঞ্চার করত প্রাণের সাড়া। আবার যখন অত্যাচারী রাজা নিজের খামখেয়ালে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলত, তখন তারাই সকলকে উদ্দীপ্ত করে তুলত এই অন্যায়ের প্রতীকার করবার জন্যে, এই অবিচারের সমাপ্তি ঘটাবার জন্য। রাজার অস্ত্র তাদের শাসন করতে পারত না, তাদের কণ্ঠরোধ করতে পারত না কোনো অত্যাচারীর নিষ্ঠুর মুষ্টি। তাদের আগুন-ঝরা স্বর লাঞ্ছিত, অপমানিত দেশে দাবানল জ্বালিয়ে দিত—সেই আগুনে রাজার সিংহাসন পুড়ে ছাই হয়ে যেত—ভস্মসাৎ হয়ে যেত তার অস্ত্রের আর শক্তির অহঙ্কার।

কিছুটা বুঝল, অনেকটাই বুঝল না যোগেন। শুধু শুনতে লাগল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। মাষ্টার কি পাগল? হয়তো পাগল, হয়তো বা পাগল নয়। কিন্তু আশ্চর্য তার কথা বলবার ভঙ্গি—শুনলে মাথার ভেতরে শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে—শরীর শিউরে শিউরে উঠতে থাকে। যোগেনের মনের সামনে বহুদূরের একটা শহরের কতগুলো এলোমেলো আলোর মত কী যেন ঝলমল করতে লাগল। তাকে ঠিক বোঝা যায় না, অথচ কী একটা দুর্বোধ্য সংকেত আছে তার; তাকে জানা যায় না, অথচ অসীম একটা কৌতূহল সমস্ত অনুভূতিগুলোকে প্রখর আর উৎকর্ণ করে তোলে।

আকাশভরা জ্যোৎস্না যেন জ্বলে উঠেছে। সোনাঝরা ঘুমভরা রাত্রিটায় যেন কোথা থেকে আগুনের একটা উত্তাপ লেগেছে এসে। মাঠের মিষ্টি বাতাসেও শরীর ঘেমে উঠতে লাগল যোগেনের। বুকের ভেতর থেকে শুনতে পেল হৃৎপিণ্ডে একটা চঞ্চল আলোড়নের শব্দ।

মাষ্টার বললে, সে চারণেরা আজ নেই, কিন্তু তাদের প্রয়োজন তো ফুরোয়নি। অন্যায় আজ চরমে উঠেছে। বিদেশী রাজা কেড়ে নিচ্ছে দেশের মানুষের মুখের ভাত। যে সত্যি কথা বলতে চায় তার টুঁটি টিপে ধরছে—তাকে পাঠাচ্ছে আন্দামানে, তাকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে ফাঁসিতে। কেন এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না, কেন তোমার গানের সুরে এই সত্যকে ধরে দেবে না

সকলের সামনে ? চারণরা আজ নেই, কিন্তু তাদের কাজ তোমরা তুলে নাও, গ্রামের মানুষগুলোকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শিক্ষা দাও।

যোগেন শুধু বলতে পারল, হুঁ।

এতক্ষণে চমক ভেঙ্গে গেল বংশী মাষ্টারের। বড় বেশি বলে ফেলেছে অতুল মজুমদার, বড় বেশি পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। এ স্থান নয়, কালও নয়। কিন্তু বহুদিন পরে মনের ভেতরের লোহার কবাটটা খুলে যেতে সে নিজেকে সংযত করতে পারেনি, কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে অবারিত অনর্গল ধারায়। যোগেন একটা উপলক্ষ মাত্র—আসলে সবগুলোই স্বগতোক্তি -সবটাই আত্মপ্রকাশের একটা অহেতুক উচ্ছলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর তা ছাড়া—এই কি যোগেনকে বোঝাবার ভাষা ? সে ভাষা অতুল মজুমদার শেখেনি, বিপ্লবী যুগের নেতা যাদের ভেতরে তার কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছিল তারা যোগেন নয়। তাদের পৃথিবীর কথা যোগেনদের কাছে দুর্বোধ্য, তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন এদের কাছে একটা রূপকথার চাইতে বেশি বাস্তব নয়। "দেশমাতার পায়ে আজ শৃঙ্খলের বন্ধন—তাঁর সর্বাঙ্গে আজ অত্যাচারীর কশাঘাতের রক্তধারা"—এ জাতীয় ভালো ভালো কথা তাদের কাছে অর্থহীন প্রলাপ। পৃথিবীর জাতিসংঘে আমাদের কোনো স্বীকৃতি নেই, সমুদ্রের ওপারে কালো জাতিরা ঘৃণা আর করুণার বস্তু, স্বায়ত্তশাসনের নামে আমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা একটা বিরাট কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়—এসব কথা এদের কাছে পাগলের মতো শোনাবে। চোখ বড় বড় করে শুনে যাবে, মাঝে মাঝে হাঁ করে থাকবে, তারপর যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, দেশের এই অবস্থা শুনে তাদের প্রাণ কাঁদে কিনা তখন তারা পরিষ্কার জবাব দেবে : বাঃ, বেশ কথা কহিছেন। খালি খালি কাঁদিমু ক্যানে ?

—দেশের জন্যে তোমাদের কষ্ট হয় না ?

—উসব কথা ক্যানে কহিছেন বাবু ? হামরা খাবার পাচ্ছি না—কেমন করি দুটা ভাত ডাইল জুটিবে, সিটা কহিবা পারেন তো কহেন, না তো যেঠি

থাকি আসোছেন ওইঠিই চলি যান। উসব চালাকির কথা ভালো লাগে না।

ঠিক, ওদের কাছে এসব চালাকির কথা ছাড়া আর কিছু নয়। বড় বড় বুলির সার্থকতা কিছুমাত্র ওরা বুঝতে চায়ও না। খেতে দাও আমাদের, চাল দাও, জমি চাষ করে যাতে ঘরের খোরাক ঘরে রাখতে পারি তার ব্যবস্থা করে দাও, মহাজনের জালে সর্বস্বান্ত না হই তার উপায় করে দাও, রক্ষা করো দারোগার উপদ্রবের হাত থেকে। এই ওদের কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ—সব চাইতে বড় সত্য। এর অতিরিক্ত স্বাধীনতা বলে যদি কোনো জিনিষ থাকে, তার কাণা কড়িরও মূল্য নেই ওদের কাছে। দেশমাতার শৃঙ্খল সত্যিই মুক্ত হল কি না এবং জালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে কারাবরণ করে কোনো দেশনেতা তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহে মলম মালিশ করে দিলেন কিনা এটা না জানলেও কোনো ক্ষতি হবে না ওদের, কোনো ব্যাঘাত হবে না ওদের রাত্রির সুনিদ্রায়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো কথা ভেসে চলে গেল বংশী পরামাণিকের মনের সম্মুখ দিয়ে। এগুলো অতুল মজুমদারের অভিজ্ঞতা—পরীক্ষিত নির্ভুল সত্য। যে ভুলের জন্যে অতুল মজুমদার ব্যর্থ হয়ে গেছে সে ভুল সে করবে না। ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে সে আগুন ধরাতে পারেনি, সে জানতনা নীচে থেকে বাতাস দিলে আপনা থেকেই শিখাগুলো জ্বলে উঠবে লক্লক্ করে।

এতক্ষণে চৌমাথাটা এসে পড়েছে। অপ্রতিভ ভাবে হাসল বংশী মাষ্টার: তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হল, আর একদিন গল্প করা যাবে।

তারপর বিস্মিত যোগেনকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই চলে গিয়েছিল পূবদিকের রাস্তাটা দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল তার ছায়াটা।

পরিচয়টা ওইখানেই শেষ হয়নি। তারও পরে হাটে দেখা হয়েছে অনেকবার—হাট থেকে এক সঙ্গেই দুজনে ফিরেছে বামুনঘাটের চৌমাথাটা

পর্যন্ত। যে কথা প্রথম দিন একটা অপরিচিত রহস্যলোকের মতো মনে হয়েছিল, তা রূপ ধরেছে ক্রমশ, নিচ্ছে একটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আকার।

······যোগেনের চটকা ভাঙল। অনেক রাত হয়ে গেছে। পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে আলকাপের গান লেখা কখন যে বন্ধ হয়ে গেছে টেরই পায়নি। আরো মনে পড়ল একটা অস্ফুট বিরক্তি মৃদু একটা তিক্ত স্বাদের মতো চেতনায় ছড়িয়ে আছে তার—আজ অত্যন্ত অকারণে একটা লোক কুশ্রী কটূ ভাষায় অপমান করেছে তাকে।

অন্যায়—অবিচার। চোরের মতো মাথা পেতে নিয়েছে যোগেন, সহ্য করেছে নির্বোধের মতো। প্রতিবাদ করা উচিত ছিল. শক্ত হাতে গলাটা টিপে ধরা উচিত ছিল লোকটার। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল—

—ধ্যাৎ—

বিরক্তভাবে যোগেন আবার দোয়াতে কলম ডুবোতে যাবে, এমন সময় ঘরের বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। দরজার কড়াটা নড়ে উঠল খট্ খট্ করে।

— চার —

প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে যোগেন চেঁচিয়ে উঠল : কে ?

—আমি।

—আমি কে ?

—বংশী।

কাগজ কলম সরিয়ে দিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল যোগেন। খুলে দিলে দরজা—এক ঝলক শীতের বাতাস দুরন্ত ভাবে ঘরের ভেতরে এসে আছড়ে পড়ল। বাইরের পৃথিবীর একটা আকস্মিক আঘাতে লণ্ঠনের শিখাটা মিট্ মিট্ করে উঠল বার কয়েক।

বংশী মাষ্টার ঘরে ঢুকল।

—মাষ্টার বাবু ? এই রাইত করি যে ?

—বড় দরকার। সব বলছি, তার আগে দরজাটা বন্ধ করে দাও—শীতে সমস্ত শরীর কালিয়ে গেছে আমার।

—হুঁ ঠাণ্ডাটা বড় জোর পড়িছে আইজ—

দরজাটায় শক্ত করে হুড়কো এঁটে দিলে যোগেন। কিন্তু তখনো বংশী মাষ্টার থর্ থর্ করে কাঁপছে, ময়লা ছেঁড়া কোট আর সুতির চাদরে উত্তর বাংলার এই দুরন্ত শীত পোষ মানেনি—হাড়ে হাড়ে ঝাঁকানি ধরিয়ে দিয়েছে একেবারে। জুতোর যে অংশটুকু অনাবৃত ছিল একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে সেখানে, মনে হচ্ছে নিষ্ঠুর হাতে কেউ ছুরির পোঁচ দিচ্ছে তার ওপরে। ঠোঁট

দুটো থর্ থর্ করে কাঁপছে, কয়েক মিনিট ভালো করে কথাই কইতে পারলনা মাষ্টার।

—শীত জোর ধরিছে। একটু আগুন আনি দিমু?

কাঁপা গলায় মাষ্টার বললে, থাক।

—থাকিবে কেন, লি আসোছি হামি।

একটা মালসা জোগাড় করে তাতে কাঠ কয়লার আগুন দিয়ে নিয়ে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না যোগেনের। এসে দেখল মাষ্টার তখনো শীতে কাঁপছে বটে, কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। অত্যন্ত মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সে পড়ছে যোগেনের লেখা আলকাপের সেই গানগুলো।

লজ্জিত যোগেন মাষ্টারকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে সাড়া দিলে : এই লেন জি, মালসা লিয়া আসিনু। হাত পাও সেঁকি লেন।

মাষ্টার চোখ না তুলেই বললে, নিচ্ছি।

যোগেন বিব্রতভাবে বললে, উগ্‌লাক্ না দেখেন!

মাষ্টার হাসিমুখে বললে কেন?

—হামার লাজ নাগে।

এবার বংশী মাষ্টারের হাসিটা আরো একটু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল : কেন, এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে? আসরে তো গাইতেই হবে।

—সি যখন হেবে তখন হেবে। এখন রাখি দেন।

—আচ্ছা, আচ্ছা।

যোগেনের আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মাষ্টারের করুণা হল। বললে, তবে তাই হবে, আসরেই গান শুনব তোমার। কিন্তু বেশ গান লেখা হয়েছে যোগেন, ভালো হয়েছে।

—ভালো হইছে?—চরিতার্থতায় যোগেনের মুখ আলো হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, চমৎকার হয়েছে।

এবার যোগেনের আর কথা বেরুল না। সাফল্যের ছেলেমানুষি আনন্দে

আর বিনয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল সে। আর আগুনের মালসার ওপরে হাতটা তুলে দিয়ে আরামে মাষ্টারের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল—আঃ!

এখন অনেক রাত। বাইরের আকাশে ফিকে চাঁদ অস্ত গেছে, অন্ধকারে এখন জমাট বাঁধছে হলদে কুয়াসা। চাঁচের বেড়ার গায়ে মাটি লেপা—যেখানে যেখানে মাটির আস্তর খসে বেড়ার ফাঁক বেরিয়ে পড়েছে, সে সব জায়গা দিয়ে সরু সরু ধোঁয়ার রেখার মতো কুয়াসা ঢুকছে ঘরে। কাল সকালে সূর্য উঠবে অনেক দেরীতে—বহুক্ষণ পযন্ত গভীর কুয়াশার তলায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে পৃথিবী।

রাত অনেক হয়েছে—কোথা থেকে যেন বিচিত্র একটা শব্দ বাজছে—ঝিম্ ঝিম্। আর সব চাপা পড়েছে নীরবতায়। পাশের ঘরে যোগেনের মা ঘুমের ঘোরে কথা কয়ে উঠল। বংশী মাষ্টার আগুনের উপর হাত সেঁকছে। মাঝে মাঝে চট্‌চট্ করে এক একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে মালসাটার ভেতরে, চটা খসে পড়ছে। আর মাষ্টারের নিশ্বাসের আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসছে অত্যন্ত জোরে। সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করে মালসার ওপরে ঝুঁকে রয়েছে সে। চাপ পড়েছে বুকে, তাই একটা জোর নিশ্বাস টেনে সে চাপটাকে হালকা করতে চাইছে।

কয়েক মুহূর্ত যোগেন তাকিয়ে রইল মাষ্টারের দিকে। চোখ দুটোকে এখন আর সে রকম জ্যোতিষ্মান্ বলে মনে হচ্ছে না—কেমন একটা ক্লান্ত আরামে যেন নিষ্প্রভ হয়ে আছে। এতদিন পরে আরো বোঝা গেল, বেশ বয়েস হয়েছে মাষ্টারের, তার চোখে মুখে দীর্ঘ ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার চিহ্ন আঁকা। কপালে কতগুলো কালো কালো দাগ স্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে, চোখের কোণায় কালির পোঁচড়া রয়েছে সজাগ হয়ে। রাতে কি ঘুমোয় না মাষ্টার, কখনো কি বিশ্রাম করে না? আর এত ভাবেই বা কী? এই প্রায় ছমাস ধরে পরিচয়, তবু যেন যোগেন সম্পূর্ণ করে জানতে পারলনা মাষ্টারকে, তার সত্যিকারের পরিচয় পেলনা। শুধু বুঝতে পারা যায় যতটুকু

দেখেছে মাষ্টারকে তার চাইতে অনেক ব্যাপ্ত, অনেক গভীর। মাষ্টার যা—তা এখনো তার অজ্ঞেয় এবং রহস্যনিবিড়।

যোগেন বললে, ত কহেন, এত রাতে এইঠে আসিবার কি কামটা পড়িল?

—আমি একটা ইস্কুলের মাষ্টার—সে তো জানো?

—হঁ, সিটা জানি।

—সেখানে সরস্বতী পূজা হবে।

বিস্ফারিত চোখে যোগেন তাকিয়ে রইল: কী পূজা হেবে কহিলেন?

—সরস্বতী।

—ইটা ফের কেমন কথা? চামারের গাঁয়ে পূজা?

—কেন চামারও তো মানুষ।

যোগেন বললে, মানুষ হবা পারে, কিন্তু বাম্‌হন কায়থ্‌ত নহে। হামরা বাম্‌হন কায়থের জুতার তলা।

—এখন আর কেউ কারো জুতোর তলা নয়।

—নহে?

—না।

যোগেন দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে টিপে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কথা সে আপাতত ভাবছে না, কিন্তু আজ দুপুরের সে বিশ্রী অপমানটার কথাও সে ভুলতে পারেনি। নিতান্তই জাতি-গোত্রের ব্যাপার, কারণটাও একান্তই ব্যক্তিগত, মাষ্টারের বড় বড় কথার সঙ্গে কোনো সম্পর্কও তার নেই। তবু একথা ঠিক, যোগেন তার প্রতিবাদ করতে পারেনি, প্রতীকারও করতে পারেনি। শুধু কি একটা বিশ্রী গণ্ডগোল এড়াবার জন্যেই সে তখন মুখ বুঁজে সব সহ্য করে গিয়েছিল? অথবা ভয় করেছিল লোকটার প্রভাব-প্রতিপত্তিকে, তার ক্ষমতাকে? জমির ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে মামলা করছে সুরেন, করুক। তার মীমাংসা হবে

আদালতে। কিন্তু কেমন করে এমন একটা স্পর্ধা পেল লোকটা যে এই সামান্য ছুঁতো নিয়ে তাকে যা খুশি তাই অপমান করে গেল?

যোগেন বললে, হঁ, বুঝিনু।

মাষ্টার মৃদু হেসে বললে, কী বুঝলে?

—আর কাহারো কাছে নীচু হই থাকিমু না।

—না, কারো কাছেই না।

—বাম্‌হন, কায়থ্‌ বড়লোক—কাহারো কাছেই না।

—না।

যোগেন আবার কামড়ে ধরলে নীচের ঠোঁটটাকে: ত হামাকে কী করিবা কহিছেন?

—বলছিলাম আমাদের স্কুলে সরস্বতী পূজা হবে।

—বেশ তো, কর।

মাষ্টার বললে, সেই জন্যেই তোমার কাছে এলাম।

—হামি কী করিব তা কহ।

—সেদিন তোমাকে গান করতে হবে।

যোগেন আশ্চর্য হয়ে বললে, হামি!

—হ্যাঁ, তুমি।

যোগেনের তবু বিস্ময় কাটছে না: হামাকে গান গাহিবা হেবে!

—সেই কথাই তো বলতে এলাম। নতুন গান শোনাতে হবে যোগেন, শোনাতে হবে নতুন কথা। তোমরা যে আর ছোট নও, একথা এবার বলে দেওয়ার সময় হয়েছে।

যোগেন অভিভূতভাবে বললে, কী গান লিখিমু?

—লিখবে অন্যায়ের কথা, অবিচারের কথা। বলবে বামুন-কায়েতেরা কেমন করে তোমাদের ছোট করছে, কেমন করে জমিদার-মহাজন অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছে তোমাদের ওপরে। নূতন করে চামারপাড়ায় আমরা সরস্বতী

পূজো করছি—তাই নতুন করে তোমাকে গানও লিখতে হবে যোগেন। পারবে না?

তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে যোগেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বংশী মাষ্টার। অগ্নি হত একটা প্রখর জ্বালার মত তার চোখে জ্বলতে লাগল, তার দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন করে আনতে লাগল যোগেনকে। বাইরে শীতের রাত। চাঁচের বেড়ার ফাঁক দিয়ে হলদে কুয়াশা ধোঁয়ার সরু সরু সাপের মত ঘরের ভেতরে ঢুকে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। খড়ের চালের ওপর টুপ টুপ করে শিশির পড়বার শব্দ—মালসার গন্‌গনে আগুনটার ওপরে অল্প অল্প ছাইয়ের আভাস।

যোগেন চুপ করে রইল। ঠিক কী উত্তর দেবে, বুঝতে পারছে না। সরস্বতী পূজো হবে, বেশ নতুন রকমের জিনিস। সেখানে আল্‌কাপের গান গাইতে হবে—সেটাও ভালো কথা, খুশি হওয়ার মতোই প্রস্তাবটা। কিন্তু নতুন সুরে গান রচনা করতে হবে—নতুন কথা বলতে হবে। সে কথা বলবার মত কি সাহস আছে যোগেনের, সে জোরটা আছে নিজের ভেতরে?

—পারবেনা যোগেন?

যোগেন কেমন অভিভূতভাবে তাকিয়ে রইল। রাত্রির নেশা ধরেছে, চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এই অপ্রত্যাশিত পরিবেশের বিচিত্র কুহক জাল। বাইরের হলদে কুয়াশার মত মনের মধ্যেও একটা কুহেলিকা পড়েছে বিকীর্ণ হয়ে।

মাষ্টারের প্রশ্নটা যেন শুনতে পেলনা সে। ঠিক যেন বুঝতেও পারছে না। বহু দূরের কোন্ একটা শহরের আলোর মত কী যেন ঝলমল করছে চোখের সামনে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না অথচ দুর্বোধ্য রহস্যের মত কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে ভাবনার ওপরে। অথবা শোনা যাচ্ছে কেমন একটা দূরাগত গর্জনের মতো শব্দ,—বর্ষার সময় যখন কাঞ্চন-নদীর কূল-ছাপানো জল খর কল্লোলে বয়ে যায় আর দূর থেকে সে কল্লোল যেমন মনের মধ্যে আতঙ্ক-ভরা একটা কৌতূহলকে সজাগ করে তোলে—ঠিক সেই রকম।

— পারবে না যোগেন ?

তৃতীয়বার প্রশ্ন করল মাষ্টার। তার চোখে যেন আগুনের বিন্দু চিকমিক করছে। ওই আগুনের স্পর্শ লাগল কি যোগেনের মনেও ?

— পারিমু।

—নতুন গান, নতুন কথা ?

—পারিমু।

মাষ্টার বললে, কিন্তু তার দায় আছে, অসুবিধেও আছে।

যোগেন চুপ করে রইল।

—গণ্ডগোল হতে পারে।

যোগেন জবাব দিল না।

একটা ছোট কাঠি দিয়ে অন্যমনস্কভাবে মালসার আগুনটাকে খোঁচা দিচ্ছিল মাষ্টার। হঠাৎ যেন আগুনটা জোরালো হয়ে উঠল—ঝেড়ে ফেলে দিলে ছাইয়ের হালকা আস্তরণটা। মাষ্টারের হাতের কাঠিটা জ্বলে উঠল দপ্ করে।

মাষ্টার বললে, যদি ভয় পাও, তবে বলব না। কিন্তু যোগেন, তোমার গাঁয়ের মানুষদের ভেতরে তুমিই খানিকটা লেখাপড়া শিখেছ, এই অন্ধদের ভেতরে তোমারই চোখ খুলেছে। এ কাজ তুমি না করলে কে করবে ? তুমি না নিলে কে নেবে এই ভার ?

কিন্তু মালসার আগুনটার মত যোগেনের মনের ওপর থেকেও ছাই সরে গেছে, কী একটা সেখানে ধক্ করে জ্বলে উঠেছে মাষ্টারের হাতের ওই কাঠিটার মত।

মহিন্দরের কাছ থেকে পাওয়া সেই অপমানের যন্ত্রণাবোধটা প্রসারিত হয়েছে একটা অর্থহীন প্রতিবাদে, একটা বহু বিস্তীর্ণ অপমানবোধে। সহসা যোগেনের মনে হল, একাজ সত্যিই তার—এ কাজের দায়িত্ব একমাত্র সেই-ই নিতে পারে।

যোগেন বললে, আমি কাঁউক ডরাই না। কিন্তু কী গান লিখিমু, তুমি হামাক কহি দেন।

—বেশ আমিই বলে দেব।

মাষ্টার উঠে দাঁড়ালো: রাত খুব বেশি হয়ে গেছে, অনেকটা রাস্তা আমাকে ফিরে যেতে হবে। তোমারও ঘুমোনো দরকার। আমি আজ চলি যোগেন।

—অখনি যাছেন?

—হ্যাঁ, এখনি যাব।

—কিন্তু ই কথাটা কহিবার জন্য ক্যানে এত আইতে আসিলেন?

—কারণ আছে—সে কারণ পরে তোমায় বলব। শুধু একটা কথা বলি যোগেন। এ শুধু শুরু—এ শেষ নয়। তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করাতে চাই আমি, অনেক বড় কাজ। আর সে কাজ তুমিই পারবে। তুমি গুণী, তুমি শিল্পী। আমাদের কথা লোকের কানে পৌঁছোয়, কিন্তু মনকে ছুঁতে পারে না। সে ভার যদি তুমি নাও—আমাদের দায়িত্বের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যাবে।

বলেই আবার লজ্জিত হয়ে পড়ল বংশী মাষ্টার। বড় বেশি বলছে, বড় সাজিয়ে বলছে। এর প্রয়োজন নেই, কথার মূল্য কত নিরর্থক, অতুল মজুমদারের জীবনেই তা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত আর প্রমাণিত হয়ে গেছে। তবু খারাপ হয়ে গেছে অভ্যাস। মাষ্টারীর দোষই এই—বড় বেশি পরিমাণে বকিয়ে মারে।

মাষ্টার দরজার ঝাঁপটা খুলে বললে, আচ্ছা, চললুম আজ।

—কিন্তু কী লিখিব সিটা তো কহি গেলেন না?

—কাল পরশু আসব। কিন্তু মনে রেখো যোগেন, অনেক বড় কাজ তোমায় করতে হবে—অনেক বড় কাজ।

মাষ্টার বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিলে। এক

ঝলক শীতের হাওয়া এসে যোগেনের লেখার খাতার পাতাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

আর অন্ধকারে এগিয়ে চলল বংশী পরামাণিক—ফিরে চলল শূন্য মাঠের কন্‌কনে উগ্র বাতাসের মধ্য দিয়ে। চাঁদ ডুবে গেছে—কুয়াশায় আকাশের তারাগুলো বিচিত্রভাবে ঝাপসা হয়ে আছে। স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন রাত্রি—শুধু বহুদূর থেকে একটা ক্ষীণ কান্না যেন ভেসে আসছে। মড়াকান্না নিশ্চয়—ওর একটা অস্বস্তিকর ধরণ আছে, ওর সুরের ভেতর আছে অবাঞ্ছিত অনিবার্যতার চিরন্তন-সংকেত।

শীতের বাতাস সর্বাঙ্গে দাঁত বসিয়ে দিতে চাইছে, ঠাণ্ডায় যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে কান দুটো। তবু মনের মধ্যে যেন পথ হাঁটতে লাগল মাষ্টার। সেখানে শীতার্ত রাত্রির আড়ষ্টতা নেই, আচ্ছন্নতাও নেই। একটা তীব্র উত্তাপ, অসহনীয় একটা আগ্নেয় জ্বালা। এই নির্জন মাঠের ভেতর শুধু বাংলা দেশের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন জনপদই রূপ ধরেনি, সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষ। ওই মড়াকান্নার শব্দ তারই বুকের কান্না, ওই রাত্রির শিশিরে তারই চোখের জল ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

তবু নির্জন পথ। তবুও নিঃসঙ্গ রাত্রি।

উপায় নেই, ডাক শুনে তো কেউ এল না, তাই 'একলা চলরে'। আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে একা পথ চলেছে অতুল মজুমদার. তার জন্যে সহানুভূতি হয় বংশী মাষ্টারের। আর অতুল মজুমদারও তো মানুষ। তারও একটা মন আছে, একটা অতি দুর্বল জায়গা আছে, যেখানে সে স্পর্শাতুর—যেখানে ছোঁয়া লাগলে আজও টনটন করে ওঠে।

আচ্ছা আজ কোথায় সে, সেই ছোট মেয়েটি ?

নাম বোধ হয় শান্তি। ময়লা রঙ, ছোটখাটো মেয়ে। বয়স যতটা বেড়েছে মন তার অর্ধেকও বাড়েনি। কপালে উজ্জ্বল একটি সবুজ টিপ। কথায় কথায় সে এত বেশি তর্ক করে যে সামলানো মুস্কিল। অতুল মজুমদারের

মত একটা মূল্যবান ভারিক্কি মানুষকে পর্যন্ত তুলত নাস্তানাবুদ করে। আর তার সেই হাসি। বাঁধভাঙা ঝর্ণার জলের মত উৎসারিত হয়ে পড়ত— অকারণে যে কত খুশি হয়ে হাসতে পারে মানুষ, শান্তিকে না দেখলে তা বুঝতে পারা যায় না।

আজ কোথায় শান্তি, কতদূরে? সে সব খেলাঘরের দিনগুলো কি এখনো মনে আছে তার? এই রাত্রে—এই মুহূর্তে হয়তো তার ঘরে একটি নীল রঙের ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বলছে, হয়ত উষ্ণ লেপের ভেতরে কারো উষ্ণ বুকের আশ্রয়ে তার দুচোখে অপরূপ স্বপ্নভরা ঘুম জড়িয়ে আছে।

কিংবা—

কিংবা নিদ্রিত চোখের কোণ বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ছে অসতর্ক স্বপ্নের অবকাশে। হয়ত একটা মানুষ একদিন তার জীবনে এসেছিল, স্বপ্নের মধ্যে মৃদু বেদনার মত সেদিনের স্মৃতিটা সাড়া পেয়েছে তার চেতনায়?

ধ্যেৎ! মাষ্টার নিজেকেই একটা ধমক দিলে। বাজে রোমান্টিসিজম্। কন্‌কনে ঠাণ্ডা আর শন্‌শনে শীতের বাতাস। চাঁদ ডুবে যাওয়া কুয়াশায় মেশানো ঘোলাটে অন্ধকার। দূরে মড়াকান্নার আকুতি।

এই সত্য—এই তো পথ। 'একলা চলো, একলা চলো, একলা চলোরে' সঙ্গী? স্বপ্নবিলাস। ভালবাসা? বিপ্লবীর পাথেয় নয়, বন্ধন।

মাষ্টার জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। রাত শেষ হওয়ার আগেই পৌঁছুতে হবে তাকে। অনেক কাজ, অনেক কাজ বাকী।

পাঁচ

বেলা বেশ চড়েছে, ঘরের মধ্যে তখনো আঘারে ঘুমুচ্ছিল বংশী মাষ্টার। জানালাটা দিয়ে রোদ পড়েছে মাচার বিছানায়, শীতের সকালের সোনালি রোদ এসে ছড়িয়েছে মাষ্টারের রাত্রি-জাগরণক্লান্ত চোখে-মুখে। বাইরের সব্‌জী বাগান থেকে ঘরের মধ্যে শিশির স্নিগ্ধ বাতাসে ভেসে আসছে কপির পাতার গন্ধ, মূলো ফুলের গন্ধ। ময়লা লেপটাকে শরীরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করে নিয়ে নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন আছে মাষ্টার।

এমন সময় মহিন্দর এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিলে।

—ওহে মাষ্টার, মাষ্টার হে ?

ঘুমের মধ্যে মাষ্টার শুনতে পেল অস্পষ্ট ডাকটা। কিন্তু তখনো জাগবার অবস্থা নয়, বিরক্তভাবে কী একটা বিড় বিড় করে সে পাশ ফিরে শুল। পিঠের নীচে মড়মড় করে উঠল মাচাটা।

—শুনিছেন হে মাষ্টার, আর কত ঘুমাছেন !

এইবার টকটকে লাল দুটো চোখ খুলল মাষ্টার, শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাকাল ওপরের দিকে—যেখানে ঘরের চালে কালো ঝুলের ওপরে সূর্যের আলো এসে পিছলে পড়েছে। অর্ধচেতন মনের কাছে সমস্ত পরিবেশটা কেমন নতুন আর খাপছাড়া বলে মনে হল।

—মাষ্টার উঠিছেন ?

মহিন্দর অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এবার এসে নাক গলিয়েছে খোলা জানলায়, ডাক দিচ্ছে : উঠো হে উঠো। ঢের বেলা চড়ি গিছে।

মুখ বিকৃত করে মাষ্টার বললে, আঃ—তারপর গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে লেপটা সরিয়ে উঠে বসল। একটা হাই তুলে বললে, আঃ, এই সকাল বেলায় কেন ডাকাডাকি শুরু করলে ?

—সকাল তুমি কুণ্ঠে দেখিলা মাষ্টার। বেলা পহর চড়ি গেইছে।

—নাঃ, তোমাদের জ্বালায় আর ঘুমোনো যাবে না।

বিছানার দিকে একবার করুণ চোখে তাকিয়ে মাষ্টার মাচা থেকে নেমে পড়ল। ময়লা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে দিলে, বেরিয়ে এল দাওয়ায়। বললে, কী খবর ?

—তুমার হুঁকার জল লি আনু। গাছগুলাত্ ছিটাই দাও, পোকা পালাই যিবে।

—তা তো যিবে।—মহিন্দরের হাতের ভাঁড়টার দিকে তাকিয়ে মাষ্টার বললে, এত জল পেলে কোথায় ?

—পামু ফের কুন্ঠে! বাড়িত্ যত মানুষ মাইন্দার দিনরাইত বড়র বড়র করি হুঁকা টানোছে, পানির অভাব হেবে ক্যানে ?

—যাক্, ভালোই করেছ।

ভাঁড়টা রেখে মহিন্দর বললে, শুধু ওইটা কামের জন্যই হামি আসি নাই।

—তবে আরো কী কাজ আছে ?

—সিটাই কহিতে তো আসিনু। নায়েব আলছে, তোমার সাথ্ দেখা করিবা চাহোলে।

—নায়েব!—বংশী বিস্মিত হয়ে বললে, কোন নায়েব ?

মহিন্দর অনুকম্পাভরে বললে, অনেক 'নিখিলে' কী হেবে, তুমি বড় বোকা আছেন মাষ্টার! নায়েব ফের নায়েব—কোন নায়েব হেবে আবার!

—ওঃ, বুঝেছি। তোমাদের জমিদারের নায়েব।

—ইবারে ঠিক ধরিলে—মহিন্দর বললে, হামাদের জমিদার বড়াল বাবুর নায়েব।

—কোথায় উঠেছেন নায়েব মশাই ?

—তুমি কেমন লোক আছেন হে মাষ্টার ? মহিন্দর এবার বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে, হাঁস কান্দরের উপরে টিনের চালীখান দেখেন নাই ? ওইটাই তো কাচারী। নায়েব আসিলে উখানে উঠে, তশিল করে। হামাদের সবজনার ব্যাগার দিতে হয়।

—তা আমাকেও ব্যাগার দিতে হবে নাকি ? তাঁর পা ধোয়ার জল দিতে হবে, রান্নার কাঠ কেটে দিতে হবে, নয়তো পা টিপে দিতে হবে ?

মাষ্টার হাসল।

মহিন্দর জিভ্ কাটল : ছিঃ ছিঃ ইগ্লান কী কহিছ। তুমি হামাদের মাষ্টার, ঢের লিখিছ, তুমার মান নাই ? উগ্লা ছোটলোকের কাম—উগ্লা তোমাকে ক্যানে করিবা হবে ? হামরা আছি না ? আর হামাদের নায়েব মশাই সিরকম মানুষ নহ, মানীর মান রাখিবা জানে।

—তাই নাকি ?—মাষ্টারের মুখে কৌতুকের রেখা দেখা দিলে।

মহিন্দর বললে, হঁ হঁ ! একবার নায়েব হামাক কদু আনিবা কহিলে। তো কদুর সময় নহে, কুন্ঠে কদু পামু হামি ? ঢের খুঁজিনু, না মিলিল্। আসি কহিতেই, হায়রে বাপ, আগি (রাগি) একদম রাগুন (আগুন) হই গেল্। কহিলে, শালা, কদু নাইতো জাল মাছ (চিংড়ি) খামু কেমন করি ! বলি মারিলে এক লাথি, হামি পড়ি গেনু।

মাষ্টার রুদ্ধস্বরে বললে, লাথি মারলে ?

—মারিলে তো। বাম্হনের ছোয়া একটা লাথি মারিলে তো কী হৈল্ ? তো লাথি খাই ভারী রাগ হই গেল্ মোর, হামি চলি আনু বাড়িত। এক ঘড়ি বাদ পেয়াদা পাঠাইলে। হামি ভাবিনু, বাপ, ইবার জুতা মারি হামার পিঠ উড়াই দিবে।

—উড়িয়ে দেয়নি ?

—হুঁঃ, কী যে কহিছেন মাষ্টার। তেমন মানুষখান পাও নাই উয়াক।

হামি যাইতেই দুঃখ করি কহিলে, মহিন্দর, আগ (রাগ) করি তুমাক যাবি হামার মন বড় খেদ করোছে। তুমি মানী লোক—কামটা হামার ভুল হই গিইছে। তো আগ করিওনা—ই টাকাটা লিই যাও, তোমার চ্যাংড়াগুলাক্ মিঠাই খাবা দিও।

—যাক—মাষ্টারের মুখে একটা বিকৃত হাসির রেখা ফুটে উঠল: তা হলে সত্যিই মানীর মান রাখতে জানে দেখছি।

না তো কী? তুমাক ঝুটাই কহিনু?

—হুঁ, বুঝলাম। মাষ্টার বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তা হঠাৎ আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চাইছেন কেন?

—হামি কহিনু না? কহিনু, মাষ্টার বড় পণ্ডিত লোক—ভিনদেশী মানুষ। হামাদের বড় উপকার করে, ঘর ঘর যাই খোঁজ খবর লেয়। শুনি কহিলে, হামার ঠাঁই মাষ্টারক ভেজি দিও মহিন্দর, হামি আলাপ করিমু।

মাষ্টার হাসল: আচ্ছা যাব। বিকেলে দেখা করব।

—না, না। এবার মহিন্দর শঙ্কিত স্বরে বললে, সকালেই যাইও। কহিছে যখন তখন মানী লোকটার কথাটা তো রাখিবা হয়।

—আচ্ছা বেশ, একটু পরেই যাচ্ছি।

—হুঁ—হুঁ জলদি যাইও। মহিন্দর বললে, হামার ফের তাড়া আছে, গোরুর দুধ যোগাড় করিবা হেবে, খাসি আনিবা নাগিবে। হামাকেই ফের বরাত দিলে কিনা। তুমি কিন্তু যাইও হে মাষ্টার—ভুলেন না।

—না ভুলব না।

দ্রুত চলে গেল মহিন্দর, অত্যন্ত তটস্থ আর বিব্রত মুখের চেহারা। নায়েব মহাশয়ের অভ্যর্থনার দায়িত্ব লাভ করে অত্যন্ত চরিতার্থ হয়েছে বুঝতে পারা যায়। গ্রামে এত লোক থাকতে এসব ব্যাপারে নায়েব তাকেই অনুগ্রহ করে থাকেন, এই গর্ববোধটা বেশ প্রত্যক্ষ আর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে মহিন্দরের সর্বাঙ্গে।

মাষ্টার সকৌতুকে হাসল, মানীর মান রক্ষার আসল তাৎপর্যটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। নায়েব চালাক লোক, গোরু মেরে জুতো দানের বিদ্যাটা আয়ত্ত আছে তার।

কিন্তু হঠাৎ তাকে ডেকে পাঠানোর অর্থ টা কী? সংশয়ে মাষ্টারের চোখমুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। শুধুই পরিচয়, শুধুই খানিকটা আলাপ এবং অনুগ্রহ বিতরণ? অথবা?

মাষ্টার বড় করে একটা হাই তুলল, তারপর হুঁকোর জলের ভাঁড়টা নিয়ে নেমে গেল সবজী বাগানে। মূলোর পাতা তার সর্বাঙ্গে স্নেহের ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে, বিলিতী বেগুন গাছ থেকে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা অবশিষ্ট শিশির ঝরে পড়ল তার পায়ের ওপর, তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুগ্ধশুভ্র কপির ফুল যেন আনন্দে হাসতে লাগল।

কাঁদরের সামনে উঁচু ডাঙার ওপরে কাছারী বাড়ী। একখানি টিনের চালা একফালি বারান্দা। সেইখানেই দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে নায়েব দীনেশ চট্টরাজ। পাকানো শরীর, শকুনের মতো ধারালো চোখ। দেখলেই বোঝা যায়, নায়েবী করে করে নিজেকে একেবারে তৈরী করে নিয়েছে। কেউ যখন আসে তখন সম্পূর্ণভাবে তার দিকে তাকায় না। একটা চোখ বন্ধ করে আর একটা সংকুচিত করে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে কেমন বিচিত্র ভঙ্গিতে। অর্থাৎ মানুষকেই শুধু দেখে না, তার ভেতরে যেন আরো একটা কিছুকে সে আবিষ্কার করতে চায়।

আপাতত সকালের রোদে তৈলাভ্যঙ্গ চলছে তাঁর। সারারাত গোরুর গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে এসেছে, এই তৈল মর্দনের সাহায্যেই গায়ের ব্যথা দূর করবার বন্দোবস্ত। বসেছে একখানা জলচৌকির ওপরে। খালি গা, ঠেঁটি কাপড় পরণে। কালো কুচকুচে হাড় বের করা শরীর সম্পূর্ণ অনাবৃত; গলায় ক্ষারে কাচা পৈতেটা মালার মতো করে জড়ানো। মাথার মোটা টিকিটায় এমন কায়দা করে গিঁট দেওয়া হয়েছে যে সেটা নেতিয়ে পড়েনি, বেশ দৃঢ় আত্মমর্যাদায় একটা রেফের আকারে আকাশকে সংকেত করছে।

সম্ভাষণের আগেই বংশী মাস্টার একপলকে জিনিসটা বিশদভাবে অনুধাবন করবার চেষ্টা করলে। সত্যিই দেখবার এবং পুলকিত হওয়ার মতো। দুজন লোক যে রকম ঘর্মাক্ত দেহে ওই ক্ষীণ দেহযষ্টিটিকে দলাই মলাই করছে, ঘোড়া কিংবা তেজালো মহিষ না হলে তা বরদাস্ত করা শক্ত। কালো শরীরটি থেকে যেন আলো পিছলে পড়ছে, অন্তত সেরখানিক তেল খরচ হয়ে গেছে তাতে সংশয়মাত্র নেই।

কিন্তু ওই প্রচণ্ড মর্দন ব্যাপারেও চট্টরাজ সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তৈল-সিঞ্চনে চির-অভ্যস্ত নায়েবের ওতে আর ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। হাতের হুঁকোটা থেকে নিয়মিত ধূমপান করছেন এবং সেই সঙ্গে কথামৃত বর্ষণও চলছে সমানভাবে।

বেশিক্ষণ নীরবে দেবদর্শনের সৌভাগ্য হল না মাস্টারের। চট্টরাজ তাকে দেখতে পেলেন। নায়েবের হিসেবী চোখ: প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে ভুল হল না।

—এই যে, নমস্কার। আসুন আসুন।

প্রতিনমস্কার করে মাষ্টার এগিয়ে এল।

—আপনি এখানকার স্কুলের মাষ্টার নয়?

বংশী মৃদু হেসে বললে, আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু আপনি চিনলেন কী করে?

—আরে এই বয়সেও মুখ দেখে মানুষ ঠাহর করতে পারব না? আপনি খোসালেন মাষ্টার মশাই। আসুন, বসুন এখানে।

একটা জলচৌকির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন চট্টরাজ। বংশী বসল। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, একটা পাখা নিয়ে পিছনে মাটিতে বসে বাতাস করছে মহিন্দর। এইবারে কথা বলবার সুযোগ পেল সেঃ হামাদের মাষ্টার খুব পণ্ডিত, ঢের লিখিছে, ছাপার হরফে কথা কহিবা পারে নায়েব মশাই।

—তাই নাকি?—অপত্য স্নেহের মত একটা কোমল হাসি হাসলেন

চট্টরাজ : বেশ, বেশ। কিন্তু পণ্ডিত হলেও তো ব্যাটাদের লাভ কিরে? তোদের বিদ্যে তো ওই জুতো সেলাই পর্যন্ত। তোদের পক্ষে পণ্ডিত মাষ্টার যা—একটা গোরুও তো তাই। কী বলিস রে?

নিজের রসিকতায় নায়েব মশাই হাসলেন মহিন্দর হাসল। যারা পা টিপছিল তারাও হাসল। কিন্তু চট্টরাজ আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন, বংশী মাষ্টার হাসল না। ভ্রূদুটোকে একটু কুঞ্চিত করলেন সন্দিগ্ধভাবে, তারপর হুঁকোয় একটা লম্বা টান দিলেন।

—কতদূর পড়েছেন আপনি?

—এই সামান্য সামান্য।

—ইস্কুলে পড়েছেন?

—হ্যাঁ, তাও পড়েছি।

হুঁকোটা মুখের সামনে খাড়া রেখে খানিকক্ষণ চোখ মিট মিট করলেন চট্টরাজ : নর্ম্যাল পাশ করেছেন?

—না, তা করিনি।

—ওঃ, নর্ম্যাল পাশ করেননি!—নায়েবের গলার স্বরে যেন স্বস্তির আভাস পাওয়া গেল : আমিও গোড়ার দিকে পণ্ডিতী করেছিলুম কিনা। নর্ম্যাল পাশ করেই সুরু করি। আর তখন পড়েছিলুম 'মেঘনাদ বধ কাব্য'—আহা, তার কী ভাব!

চট্টরাজ হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে গেলেন। মেঘনাদ বধের স্মৃতিতে চোখ বুজে এল, কণ্ঠ হয়ে উঠল আবেগবিহ্বল। হুঁকোশুদ্ধ হাতখানা একদিকে, আর একখানা আরেকদিকে এমনভাবে বাড়িয়ে দিলেন যেন কাউকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন তিনি। তারপর বিশ্রীভাবে শুরু করে দিলেন :

"হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি
কী পাপে হারানু আমি
তোমা হেন ধনে!

হায়রে কেমনে

সহি এ যাতনা আমি ?

কে আর রাখিবে

এ বিপুল কুল-মান এ কাল-সমরে ?"

যন্ত্রণা যে অসহ্যই হচ্ছে তাঁর মুখ দেখলে সে সম্পর্কে আর ভুল করবার কারণ থাকে না। এবারে বংশী মাষ্টারের সত্যিই হাসি এল—কিন্তু এ অবস্থায় আর যাই হোক হাসা চলে না।

চট্টরাজ হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠ এবং বাহু-তাড়নায় ইতিমধ্যেই অঙ্গসেবাটা বন্ধ হয়ে গেছে, থেমে গেছে মহিন্দরের হাতের পাখা। হাঁ করে সব তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। সবার ওপর দিয়ে গর্বিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চট্টরাজ বললেন, কী বলেন মাষ্টার মশাই, ঠিক হয়নি ?

—আজ্ঞে চমৎকার হয়েছে।

—তবু তো বয়েস নেই—চট্টরাজ বললেন, এককালে যাত্রাও করেছিলুম। কিন্তু কী আর করব মশাই, পেটের তাগিদে রস-কষ কিছু কি আর রইল ? কাব্যটাব্য আর নেই এখন, এখন শুধু বাকী-বকেয়া, আদায় তশীল, লাটের কিস্তি আর দেওয়ানীর হাঙ্গামা।

—আজ্ঞে সে তো বটেই।—বিনীত ছাত্রের মতো মাথা নাড়ল মাষ্টার।

—যাক্, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী আনন্দ হল। তা এখানে আপনার ছাত্রেরা পড়ে কেমন ?

—ভালোই পড়ে।

—হুঁ, ভালই পড়ে!—চট্টরাজ মুখ বিকৃত করলেন: এরাও পড়বে, উচ্চিংড়েও হবে শিকরে বাজ। জেলাবোর্ড ইস্কুল করে দিয়েছে—এইড্ দিচ্ছে। আপনার মতো একটি ভদ্র সন্তান দুটি করে খাচ্ছেন—এই যথেষ্ট। কী বলেন, অ্যা ?—নায়েব হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলেন, মুখটা একবার কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে নিলে বংশী মাষ্টার। কথার সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো

বৃষ্টির মতো থুথ্ ওড়ে চট্টরাজের। মাষ্টার জবাব দিলে না, অল্প একটু হাসল মাত্র।

—আপনার দেশ কোথায় মাষ্টার মশাই ?

—ফুলবাড়ী।

—কোন্ ফুলবাড়ী ?—নায়েব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

—দিনাজপুর।

—ওঃ, হিলির পরে সেই ফুলবাড়ী ? বেশ বেশ। তা ফুলবাড়ীর কোথায় আপনার বাড়ি ?

বংশী একবার কপালটাকে মুছে নিলে : ওই ষ্টেশনের কাছেই।

—ষ্টেশনের কাছেই ? কোন্ বাড়ি বলুন তো ?

বংশী একটা ঢোঁক গিলল, পরামাণিক বাড়ি।

—পরামাণিক বাড়ি !—চট্টরাজ বললেন, ঠিক চিনলাম না তো। ওখানেই আমার মামার বাড়ি কিনা। কোন্ পরামাণিক ?

বংশীর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল : জলধর পরামাণিক।

—অঃ !—চট্টরাজ বললেন, তা হলে নতুন পত্তন। আমি যখন আগে গেছি তখন দেখিনি সে বাড়ি।

অকুলে যেন কুল পেল বংশী : হাঁ হাঁ, নতুন পত্তন। মাত্র সামান্য কিছুদিন—

—অঃ—চট্টরাজ এবার চুপ করে গেলেন। তারপর হুঁকোয় আর একটা টান দিলেন। কিন্তু বুকের ভিতরে তখনও দুরুদুরু করছে মাষ্টারের। যদি ওইখানেই চট্টরাজ না থামেন, যদি আরো আগেকার খবর জানবার জন্যেও তাঁর কৌতূহল প্রখর হয়ে ওঠে তবে সে অবস্থাটা সুখের হবে না। মরিয়া হয়ে যা খুশি একটা বলে দেবে—কয়েম্বাটুর কুয়ালালামপুর কিম্বা কামস্কাটকা। কিন্তু চট্টরাজ আর প্রশ্ন করলেন না। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলুম, আপনি নাকি এখানকার ইস্কুলে সরস্বতী পুজো করতে চাইছেন।

—হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি।

মাঝখানে কথায় আবার একটা ফোড়ন দিলে মহিন্দর: হঁ, মোরা ঠিক কইনু।

চট্টরাজ ধমক দিলেন: তুই চুপ কর দেখি। সব কথায় তোদের কথা কইতে আসা কেন? যাকে জিজ্ঞেস করছি সেই জবাব দেবে।

—হঁ, সিটা তো বটে।—মানী লোক মহিন্দর নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

চট্টরাজ আবার বংশীর দিকে তাকালেন: পূজো তো করবেন কিন্তু কেমন করে করবেন?

—যেমন করে পূজো হয়।

—তা তো হবে না।—চট্টরাজ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন: পুরুত তো পাবেন না। কোনো বামুন রাজী হবে না চামারের পূজো করতে।

—তা হয়তো হবেনা।

—তা হলে?

—আমরাই পূজো করব।

—আপনারা!—জলচৌকির ওপরে প্রায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন চট্টরাজ:

তার অর্থটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। মন্ত্র পড়বে কে?

বংশী মৃদু হাসল: দরকার হলে আমিই পড়বো।

—আপনি!—চট্টরাজ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন: আপনি কী জাত?

—পরামাণিক।

—পরামাণিক? নাপিত?

—হাঁ, তাই।—বংশী শান্ত স্বরে জবাব দিলে।

—আপনার কি মাথা খারাপ?

—না, মাথা আমার ঠিকই আছে।

—অঃ!—চট্টরাজ আশ্চর্যভাবে সংযত হয়ে গেলেন। তারপর মাষ্টারের

দিকে শাণিত দৃষ্টি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাপিতও আজকাল বামুন হয়ে উঠেছে নাকি ?

—দোষ কী !

—হুঁ ?—চট্টরাজ তেমনি সংযত স্বরে বললেন, পূজো করা ছেলেখেলা নয়, তা জানেন ?

—জানি।

—হিন্দুধর্ম হেলাফেলার জিনিষ নয়, সেটা জানেন ?

—হ্যাঁ, তাও জানি।

হুঁকোর আগুনটা নিবে গিয়েছিল, কলকেটাকে এবারে মাটিতে ঝেড়ে ফেললেন চট্টরাজ : তবুও আপনি পূজো করবেন ঠিক করেছেন ?

—তাই তো ভাবছি।

—আচ্ছা, করুন। মন্দ কী। কলিকাল—এই চামার ব্যাটারাও কবে পৈতে গলায় দিয়ে চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে হয়ে উঠবে বোধ হয়। কিন্তু এটা জানেন তো, জমিদার এই গ্রামের মালিক ? দেশটা একেবারে অরাজক নয় ?

—তা জানি।—বংশী চাপা ঠোঁটে বললে, ইস্কুলটা কিন্তু জেলা বোর্ডের, জমিদারের সম্পত্তি নয়।

—হুঁ, আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি। যাক—আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হল। পরে আসবেন এক সময়—চট্টরাজ হাত তুললেন।

—নমস্কার।—সম্ভাষণ জানিয়ে বংশী বিদায় নিলে।

—ছয়—

সকালে পৌঁছেই খুব হাঁকাহাঁকি স্থরু করেছে স্থরেন, যেন কোথা থেকে মস্ত একটা দিগ্বিজয় সেরে এসেছে। বাড়ির দরজা তখনো খোলেনি, চড়া গলায় স্থরেন চ্যাঁচাতে লাগল : একটা মানুষও যে সাড়া দেয় না হে, সব মরি গেইল্ নাকি ?

যোগেনের মা বেরিয়ে এল বিরক্ত হয়ে : অমন চিল্লাছিস ক্যানে ? হৈল্ কী ?

—হৈল্ কী ?—স্থরেন ক্ষেপে উঠল : চউখ নাই, দেখিবা পাও না ?

সত্যিই দ্রষ্টব্য। স্থরেন বউ আনেনি, কোথেকে একটি মেয়েকে এনেছে জোগাড় করে। চোদ্দপনেরো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে—কপালে উল্‌কির দাগ। ভীরু চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে নতুন পরিবেশটাকে অনুধাবন করতে চাইছে।

—ওমা !—যোগেনের মা চোখ কপালে তুলে আনলে : ই কাক্ নি আলু ?

—ফের কাক্ ? হামার শালী।

—আইস মা, আইস।—যোগেনের মা আপ্যায়ন করলে : তা ইয়াক তো লিয়ে আইলি, বউক্ কুন্‌ঠে রাখি আল্লি ?

—মা মরি গেইছে, বউ কাঁদোছে। হামাক্ কহিলে, কয়দিন বাপের ঠাঁই থাকিমু, তুমি বহিনটাক্ লিয়ে যাও। উয়াক্ তো এখন দেখিবার কেহ নাই। বড় হইছে, বাড়িত্ দেখিবার মানুষ নাই—কয়টা দিন থাকি আস্থক।

যোগেনের মা বললে, তো বেশ। তুমার নাম কী মা?

মেয়েটি নির্জীব গলায় বললে, সুশীলা।

—সুশীলা? আইসো মা, বাড়ির ভিতর আইসো।

সুশীলা নীরবে সসংকোচে অগ্রসর হল। যোগেনের মা এক পলকে তাকিয়ে দেখল, তার চোখ দুটো লাল—মুখখানা ফোলা ফোলা। বোঝা গেল সারারাত কেঁদেছে মেয়েটা, মায়ের শোকেই চোখের জল ফেলেছে। কেমন একটা করুণায় যোগেনের মার মন ভরে গেল, মনে হল সত্যিই বড় ভালো মেয়েটি—রসিক চামারের মেয়ের চাইতে অনেক ভালো।

যোগেন কোথায় বেরিয়েছিল। ফিরল বেশ বেলা করে। বাড়ির সামনে পৌঁছুতে দেখে বাইরের দাওয়ায় বসে চামড়া কাটছে সুরেন। যোগেনকে দেখে মুখ বিকৃত করল।

—এই যে লবাব-পুত্তুর, হাওয়া খাই ফিরিলা?

যোগেন জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, সুরেন আবার জিজ্ঞাসা করলে, হারাণ এখনো ফিরেনি বাড়িত্?

—না।

—কুন্ঠে গেইছে হারামজাদা?

—হামি কহিবা পারি না।

—সিটা পারিবা ক্যানে? খাছ, দাছ, গায় ফুঁ দিই বেড়াছ। হামি খাটি খাটি মরি গেইনু। তুমাদের ভাবনা-চিন্তা তো কিছু নাই। ইবারে উ শালা আসিলে জুতা মারি বাহির করি দিমু বাড়ির থাকি।

—তো দিয়ো। খালি খালি হামার উপর চিল্লাছ ক্যানে?

—চিল্লামু না?—চটে গিয়ে অশ্রাব্য গালাগালি শুরু করলে সুরেন।

ঠিক চটে গিয়েও নয়, এটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে সুরেনের। খুব খানিকটা বকাবকি করতে না পারলে স্বস্তি বোধ হয় না, কাজে মন বসতে চায় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই পর্বই চলতে থাকবে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। অতএব যোগেন আর দাঁড়ালো না, সোজা বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকল।

আর সেই মুহূর্তেই দৃষ্টি থমকে গেল যোগেনের। উঠোনে শীতের নরম রৌদ্রে বসে চালের খুদ্ ঝাড়ছিল একটি কিশোরী মেয়ে। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যোগেন। প্রথম সূর্যের আলোয় ঝলমল করেওঠা কিশোর কোমল মুখখানি ভারী চমৎকার লাগল, বড় সুন্দর লাগল শান্ত দুটি চোখের চকিত দৃষ্টি। পিঠের ওপর রাশি রাশি কোঁকড়া চুল ভেঙে পড়েছে, সবটা মিলিয়ে যেন অপূর্ব একখানা ছবির মতো বোধ হল যোগেনের।

তারপরেই এল বিস্ময়। কে এ, কোত্থেকে এল? গ্রামের কেউ নয়, এমন ঢলঢলে মুখ নেই গ্রামের কোনো মেয়ের—সকলকেই সে চেনে। আকস্মিকভাবে তাদের বাড়িতে এমন একটি মেয়ের আবির্ভাব ঘটল কী করে?

পাশের ডোবাটা থেকে বাসন মেজে খিড়কি দিয়ে ঘরে ঢুকছিল যোগেনের মা। একবার তাকালো ছেলের দিকে, একবার তাকালো নতমুখিনী মেয়েটির প্রতি। তার পরে মৃদু হাসল।

—উ সুরেনের শালী—সুশীলা। অর মা মরি গিইছে, তাই কয়টা দিনের জন্য এইঠে বেড়াবা আসিছে। বড় ভালো মেইয়া সুশীলা।

—ওঃ—যোগেন ঘরের ভেতর চলে গেল।

অনেকগুলো নতুন গান মনে এসেছে, তাই লিখতে বসবার ইচ্ছে ছিল যোগেনের। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসেও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পথে চলতে চলতে যেগুলো নীহারিকার মতো আকারহীনভাবে মনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা সুস্পষ্ট রূপ নেবার চেষ্টা করছিল, যে গানের কলি গুন্ গুন্ করে ভেসে আসছিল বারবার—হঠাৎ তাদের সবগুলি যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। একটা নতুন কিছুর সঞ্চার হয়েছে সেখানে,

এতক্ষণের গুছিয়ে-আনা সূত্রগুলিকে আর যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এ আকস্মিক বাধাটা চেতনাকে বিস্বাদ করে দেয়নি—বরং ভালোই লাগছে। একটা অর্থহীন ভালো লাগা ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে বুকের ভেতরে।

বেশ মেয়েটি। ফুলের মতো ঢলঢলে মুখ। নামটিও সুন্দর—সুশীলা। যোগেন ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছে, সুশীলা কথাটা সে জানে, অর্থও বোঝে। চেহারার সঙ্গে নামটির কোথায় বেশ চমৎকার সাদৃশ্য আছে বলে মনে হল যোগেনের। ভারী মিষ্টি করে নত চোখে মেয়েটি তাকিয়ে ছিল তার দিকে। সোনালি রোদে কালো চোখ দুটি তার জলজল করে উঠেছিল লজ্জায় আর কৌতূহলে।

কালিতে কলম ডুবিয়ে যোগেন আঁচড় কাটতে লাগল এক্সারসাইজ্ বুকের রুল করা পাতার ওপরে। হঠাৎ মনে হল, ভারী চমৎকার আজকের সকালটা। কাঁচা চামড়া, জুতোর কালি আর বাড়ীর পেছনের স্তূপাকার পচা গোবরের গন্ধকে ছাপিয়েও একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। কিসের গন্ধ, ঠিক বোঝা যায়না। ঘাসের, না শিশির-ভেজা মাটির, না অচেনা একটা ফুল ফুটেছে কোনোখানে? ভারী ভালো লাগতে লাগল। মাষ্টার যে গানগুলো শিখিয়েছে, তারা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে এই নতুন অনুভূতিটিকে প্রসন্নমুখে পথ ছেড়ে দিলে। আরো খানিকক্ষণ কাগজে আঁচড় কাটলে যোগেন, কলমটা কামড়ালো বার কয়েক, আস্বাদন করে নিলে মনের এই লঘু চঞ্চলতাকে, সকালের এই মাদকতাকে, বাইরের এই বিস্ময়বিচিত্র অপরিচিত গন্ধটাকে। কান পেতে শুনল, মেয়েটি মাঝে মাঝে তার মায়ের সঙ্গে কথা কইছে। কী বলছে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু কথার সুরটা বহুদূর থেকে ভেসেআসা একটা গানের রেশের মতো যোগেনের কানে বাজতে লাগল।

তারপরেই লিখতে শুরু করলে যোগেন।

খানিকক্ষণ লিখেই সে চকিত হয়ে উঠল। আরে, আরে—এ কী হচ্ছে!

এ তো আলকাপের পালা নয়, রসের গানও নয়। এ যে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস! নিজের লেখাটার দিকে যোগেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল:

তোমারে দেখিলাম হে সুন্দরি,
মরি মরি!
কালো দুটি নয়ন যেন ভ্রমর উড়ি যায়,—
ফুলের মতন বদন যেন সুগন্ধ বিলায়,—
পলকে দেখাইয়ে ও রূপ
পরাণ লিলে হরি—
মরি মরি!
রাজার কইন্যা কেশবতী, মেঘের মতন চুল,
দেখাইয়া সকল হিয়া করিলা আকুল
তোমার রূপে মন মজিল—
কি করি, সুন্দরি!

এ কার রূপ? এ কার বন্দনা? যোগেন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, সন্ধ্যা বেলাতেই যোগেনের মা কথাটা পাড়ল সুরেনের কাছে। বড় বড় গ্রাসে সুরেন মুখে মোটা মোটা লাল চালের ভাত তুলছিল কড়াইয়ের ডাল মেখে। মায়ের কথায় সে চোখ বিস্ফারিত করলে।

—কী কহিলা?

—কহিনু তো ভালোই।

—ভালোই কহিলা?—সুরেন এবার চোখ পাকালো দস্তুরমতো: ইটাক্ ভালো কথা কহিছ তুমি? ইটা কেমন ভালো কথা?

—ক্যানে, ছেইল্যা খারাপ নাকি হামার?

—ছেইল্যা তো তুমার লবাব পুত্তুর, উয়াক খারাপ কহিবে, এমন মাথা আছে কার ঘাড়ত্? কিন্তু উসব ছাড়ি দাও এখন।

—ক্যানে, ছাড়িমু ক্যানে ?—মার এবারে রাগ হল।

সুরেন চড়া গলায় বললে, ক্যানে ছাড়িবা না? তুমার ছেইলা তুমি নি চিন! দিনরাত এইঠে ওইঠে ঘুরি বেড়াছে, ঘরের আধখানা কামেও নাগে না। উয়ার সাথ বিহা দিলে মেইয়াটার দুঃখের শেষ রহিবে না।

—হুঁ, তোক্ কহিছে!—মা রাগ করে বললে, ছোয়াপোয়া কবে সংসার লিয়ে বুঢ়ার মতন বসিবা পারে? বিহার আগে তোমহাক্ হামি দেখি নাই? বাপ যদ্দিন আছিল্, খাটি খাটি মইচ্ছে বুঢ়া, তুমিও তো লবাবী করি ঘুরি বেড়াছ। তুমার বিহা আটক থাকে নাই তো, উর বিহা ক্যানে থাকিবে?

সত্যটা অনস্বীকার্য। আজকের বৈষয়িক এবং বিচক্ষণ সুরেন চিরদিনই এমন পাকা হিসেবী ছিল না, তারও পেছনে আছে ছেলেবেলার অনেক কুকীর্তির ইতিহাস। তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে জড়িয়ে পড়েছিল একটা রাহাজানির মামলায়, অনেক খেসারত দিয়ে বাপ তাকে উদ্ধার করে আনে সে যাত্রা। সুরেন আজকে অবশ্য সাধু মহাত্মা সেজে বসেছে, কিন্তু মাকে বেশি ঘাঁটাতে গেলে এমন বহু ব্যাপার বেরিয়ে পড়বে যার তুলনায়—

সুতরাং প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দিলে সুরেন।

—একটার বিহা দিয়া তো দেখিলা। ওই হারামজাদা হারাণ—

মার মুখ বেদনার্ত হয়ে উঠল: উটার কথা ছাড়ি দে ক্যানে বাপ। উটা হামার ব্যাটা নহ, শয়তানের ছাও। বহুত পাপ করিছিনু, তাই হামার প্যাটে আসি জুটিলে। তো হামার যোগেন অমন হয় নাই—তুমরা দেখিবেন, ওই ব্যাটাটাই হামার মান রাখিবে, তোদের নাম রাখিবে।

সুরেন মুখ বিকৃত করে বললে, রাখি দাও, রাখি দাও। ওই যে কহছে না?—

হাথী ঘোড়া ডহ না জানি,
ব্যাং কহে ক্যাতে পানি?

যোগেনের মা বললে, তু থাম্ না কেনে? হামি দেখিমু।

—ত দেখিয়ো। সুশীলার বাপক্ কহ, যদি বিহা দিবা চাহে, তবে না?

—তাই কহিমু। মেইয়াটাক্ বড় ভালো নাগিছে হামার।

—হুঁ!—সুরেন আর কথা বাড়ালো না, অতিকায় একটা ভাতের গ্রাস পুরে দিলে মুখের মধ্যে, গলা পর্যন্ত আটকে গেল। তার এসব বাজে কথা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করবার মতো উৎসাহ নেই।

কিন্তু কথাটা চাপা রইল না। শেষ পর্যন্ত কানে এলো যোগেনেরও।

প্রেম কাকে বলে, অন্তত নারীর রহস্য সম্পর্কে যোগেন এখনও যে একেবারে নাবালক তাও নয়। শহরে থাকতেই এ ব্যাপারে প্রথম দীক্ষালাভ হয়েছিল তার। একটা বখাটে সঙ্গী জুটিয়েছিল, সেই তাকে চাপা গলায় ফিস ফিস করে মাদকতাভরা একটা মায়া-লোকের সন্ধান দিয়েছিল। প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিল যোগেন। বলেছিল, না, না, হামার ডর নাগে।

বন্ধু বলেছিল, পুরুষ মানুষ না তুই?

তারপর সেই অন্ধকার সন্ধ্যা। প্যাঁচ পেঁচে গলির ভেতরে সারি সারি খোলার বাড়ি। মফঃস্বল সহরের মিটমিটে আলোয় কানা গলিটা যেন ভূতুড়ে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেক বাড়ির দরজায় দুটি একটি মেয়ে, অল্প অল্প আলোয় তাদের ভালো করে চেনা যায় না। খোঁপায় এক এক ছড়া করে ফুলের মালা জড়িয়ে নিয়েছে, বিড়ি টানছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটু দূরে দেশী মদের দোকান, প্রচণ্ড হল্লা উঠছে সেখান থেকে।

তাদেরই একজনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দুজনে। জিজ্ঞাসা করেছিল, কত?

মেয়েটি অনাসক্তভাবে বিড়ি টানতে টানতে বলেছিল, কতক্ষণ?

—এক ঘণ্টা।

—এক এক টাকা করে লাগবে দুজনের।

—আট আনা করে হবে?

মেয়েটি কটু ভাষায় গাল দিয়ে বলেছিল, ওদিকের ওই বুড়ির কাছে যাও, দুআনায় রফা হয়ে যাবে।

তারপর বারো আনা করে দাম ঠিক হয়েছিল। ঝিয়ের দুআনা, পান খাওয়ার এক আনা। মেয়েটির হাত ধরে ভেতরে ঢুকেছিল সঙ্গী—পেছনে পেছনে যোগেন।

ঘরের মেঝেতে ময়লা রাজশয্যা। ছোট ছোট তাকিয়া। হারমোনিয়ম, তবলা-ডুগি। কিন্তু একঘণ্টা সময়ের মেয়াদ মেয়েটি তাড়াতাড়িই শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

তারপর—

তারপরের কথা মনে পড়লে এখনো যোগেনের শরীর শিউরে ওঠে—চোখ বন্ধ হয়ে আসে। নির্লজ্জ কুশ্রীতার চূড়ান্ত রূপ দেখেছিল যোগেন, দেখেছিল কত অবলীলাক্রমে ঘরভরা আলোতেও সে বীভৎসতার লীলা। যোগেন থাকতে পারেনি, ছুটে পালিয়ে এসেছিল, বাড়িতে ফিরে সেই রাত্রেও কুয়ো থেকে ঘটি ঘটি জল তুলে স্নান করেছিল। আর সেই থেকেই মনটা অদ্ভুতভাবে বিমুখ আর বিতৃষ্ণ হয়ে গেছে নারী-দেহের সম্পর্কে—চোখের সামনে সে কদর্যতার ছবি এখনো জ্বল জ্বল করছে তার।

গ্রামে যখন ফিরে এল তখন তার মনটা ও সম্পর্কে বিচিত্রভাবে স্থির আর নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেছে। মেয়েদের দেখে, ভালো লাগে তাদের হাসি-গল্পের গুঞ্জন, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছুই সে কল্পনা করতে পারে না। একটি মাত্র আঘাতেই একটা আশ্চর্য নিস্পৃহতা সঞ্চারিত হয়েছে যোগেনের মধ্যে,—প্রথম যৌবনের সহজ মোহাচ্ছন্নতাটা রূপান্তরিত হয়েছে একটা শান্ত বিতৃষ্ণায়।

বেশ ছিল এতদিন—কিন্তু এ কী!

মনের একটা একমুখী প্রবণতা গড়ে উঠেছিল, গড়ে উঠছিল জীবন সম্পর্কে একটা নিশ্চিন্ত দৃষ্টি। বংশী মাষ্টার। আগুনের মতো জ্বলজ্বলে চোখ। গলার স্বরে মেঘমন্দ্র গম্ভীরতা। এ কাজ তুমিই করতে পারবে যোগেন, এর

দায়িত্ব একমাত্র তুমিই নিতে পারো। তুমি কবি, তুমি শিল্পী, এর ভার তুমি না নিলে আর কে নেবে ?

গা ছম ছম করে উঠেছিল, রক্ত চন চন করে উঠেছিল। কাজ করতে হবে অনেক বড়ো, অনেক কঠিন কাজ। জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের অন্যায়। ব্রাহ্মণেরা তাদের ছুঁতে চায় না, মুচির পূজোয় পৌরোহিত্য করতে রাজী হয় না তারা। প্রতীকার চাই এর, প্রতিবিধান চাই ! কথা দিয়ে যা বলা যায় না তাকে গান দিয়ে বলতে হবে ; কানের কাছে যা শুধু ব্যর্থ আঘাত দিয়ে যায়, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মনের ভেতরে—সঞ্চারিত করে দিতে হবে বুকের রক্তধারায়। চারণেরা পথে পথে বীণা বাজিয়ে বেড়ায়, ডাক দেয় মানুষকে, জাগিয়ে তোলে তাদের, হাতে এগিয়ে দেয় খোলা তলোয়ার। যোগেন কি হতে পারে না তাদের মতো ?. না, শুধু তাদের মতোই নয়—তাদের চাইতে বড়, ঢের বড় !

কথাগুলো বলেছে বংশী মাষ্টার। গলার স্বরে যেন মেঘ ডাকে। চোখে যেন খর বিদ্যুৎ চমক দিয়ে যায়। বর্ষার সময় দুকূল ভরে ওঠা কাঞ্চন নদীর ক্ষুব্ধ গর্জনের মতো একটা উগ্র ভয়ঙ্কর কলধ্বনি কানে এসে লাগে, একটা অজানা ভয়ে, একটা অনিশ্চিত সংশয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—স্তব্ধ মধ্যরাত্রে ওই শব্দটা শুনে শুনে চোখে ঘুম আসতে চায় না।

কিছু একটা নতুন করতে যাচ্ছে যোগেন। পা বাড়িয়েছে সংশয়াকীর্ণ ভয়ঙ্করের পথে। যার ভবিষ্যৎ অজানা—যার পরিণতি দুর্বোধ্য। লড়াই করতে হবে-- লড়াই করবার উৎসাহ দিয়ে জাগিয়ে দিতে হবে এই চাষা-চামারদের। যারা সকলের পায়ের তলায়, সকলের পায়ের জুতো যোগানো ছাড়া বাঁচবার আর কোনো অর্থই নেই যাদের কাছে।

মাষ্টারের নির্দেশ মতো এই গানটা লিখেছিল সে :

হায় হায় দেশের একি হাল,
যারা ক্ষেতে যোগায় ফসল,

তার ঘরত্ ই নাইরে চাল।

মুখের গরাস লিলে কাড়ি,

লিলে জমি, লিলে বাড়ি,

বড় লোকের জুলুমবাজী

সহিমু আর কতকাল,

হায়রে কহ, দেশের ইটা কেমন হাল।

এই তো সত্যিকারের গান, এই তো মানুষকে জাগিয়ে তোলার সুর। এই সুরেই এবারে গান বাঁধবে যোগেন। আলকাপের গান নিয়ে আর সে শুধু তামাসা তৈরী করবে না, দেখিয়ে দেবে জীবনের সত্যিকারের তামাসাটা কোন্‌খানে। তারা জানবে, তারা বুঝবে, তারা বাঁচতে শিখবে। আর—আর শিখবে এর প্রতিবিধান করতে।

—সুশীলা, সুশীলা!

যোগেন উৎকর্ণ হয়ে উঠল। মা ডাকছে। সুশীলা। দিব্যি নাম—গানের মতো মিষ্টি। কান পেতেই রইল যোগেন। মা ডাকছে—সুশীলা?

মিষ্টি গলার সাড়া পাওয়া গেল, কী কহছেন?

—উঠানে ধান সিদ্ধ চড়াইছি। উটাক একটু লাড়ি দে মা, ধরি গিবা পারে নাগোছে।

—যাছি হামি।

বেশি কথা বলে না সুশীলা, প্রায়ই চুপ করে থাকে। লক্ষ্য করেছে যোগেন, শান্ত অনাসক্তভাবে বসে থাকে দাওয়ায়, দৃষ্টি মেলে দিয়ে রাখে আকাশের দিকে। বিষণ্ণ চোখ, অপূর্ব একটা করুণতায়-ভরা। ওই তো এতটুকু মেয়ে, তবু চঞ্চলতা নেই, ছটফটানি নেই। কী একটা পেয়েছে মনের মধ্যে, পেয়েছে একটা স্থিরতা। সব সময়েই ভাবে, কী ভাবে কে জানে। নতুন জায়গায় এসে পড়বার সংকোচ? অপরিচিত মানুষের ভেতরে এসে একটা স্বাভাবিক অস্বস্তি? হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। যোগেন মাঝে

মাঝে ফেলেছে চোরা-চাহনি, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেছে ওর পিঠ-ভাঙা রাশি রাশি কালো চুল একবার হাতে তুলে নেয়, ওর মুখখানা তুলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বোবা ভাবনায় আচ্ছন্ন দুটি কালো চোখের অতলে।

মেয়েদের একটা রূপ সে দেখেছে সে সেই মহকুমা সহরে। সেই প্যাচপেঁচে বিশ্রী গলিতে, সেই লণ্ঠনের আলোয় উদ্ভাসিত খোলার ঘরের ময়লা বিছানায়। কিন্তু এতো তা নয়। এ নতুন—এ বিচিত্র। সেদিন বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, আজ বুকের ভেতরে কী একটা ঢেউয়ের মতো দোলা খেয়ে খেয়ে উঠছে। সেদিন দেহের ভেতরে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, আজ সেই দেহই রূপ ধরেছে অপূর্ব একটা ইন্দ্রজালের মতো।

সুশীলা—সুশীলা! জমিদারের অত্যাচার সত্য, মহিন্দরের অপমানটা সত্য, বংশী মাষ্টারের কথাগুলোও নির্ভুল সত্য। কিন্তু এও তো সত্য। নিজের ভেতরে এই দোলাটাও তো আজ কোনো দিক থেকেই এক বিন্দু মিথ্যে নয় যোগেনের কাছে! কিছুক্ষণের জন্যে যেন সে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল, সুর দিয়ে যেতে লাগল নিজের লেখা সেই গানটিতেই :

রাজার কইন্যা কেশবতী, মেঘের মতন চুল
দেখাইয়া সকল পরাণ করিলা আকুল
তোমার রূপত্ মন মজিলে—কি করি,
হে সুন্দরি!

—হাঁরে, ও যোগেন!

স্বপ্ন কেটে গেল। বাজখাই কট্‌কটে গলা। সুরেন ডাকছে। যোগেনের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হল—আর ডাকবার সময় পেল না নাকি সুরেন?

—হাঁরে যোগেন, মইল্লু নাকি?

নিশ্চয় তাড়ি খেয়েছে, গলার স্বরে বোঝা যায়, বেশ চড়া হয়ে আছে সুরেনের মেজাজ। এখন সাড়া না দিলে তারস্বরে চীৎকার শুরু করে দেবে।

কলম ফেলে যোগেন উঠে এল : কী, কহোছ্ কী ?

—কী আর কহিমু, হামার মুণ্ডু কহোছি।—সুরেন মুখভঙ্গি করলে : ঘুমের ব্যাঘাত্ হৈল্ নাকি লবাবের ছোয়ার ?

—খালি খালি ক্যান্ গালি দিবা নাগিলে ?

—নাগিমু না ? হামি খাটি খাটি সাড়া হই গেনু, হামার ভাই আলকাপ্অলা হই টেরৃগি বাগাই বাগাই বেড়াছে। হামি আর পারিম্ না—সাফ কহি দিনু—হঁা !

যোগেন বিতৃষ্ণ স্বরে বললে, তো কী করিবা হেবে, সিটাই আগে সাফ করি কহ না ?

—তাইতো কহিবা চাহোছি। আলকাপঅলাক্ সংসারের কামও তো করিবা নাগে। একবার আজই চামারহাটা যিবা হেবে তোকে।

—ক্যানে, চামারহাটা ক্যানে ?

—ওইঠে আজই নায়েব আসোছে। উয়ার সাথ্ দেখা করিবা নাগিবে।

যোগেনের সমস্ত মন ভরে গেল অপ্রসন্নতায় : নায়েবের সাথ দেখা করি হামি কী কামটা করিমু ?

—বাঃ, শালা মহিন্দরের সাথ্ মাম্লা হছে না ? নায়েবের সাথ কথা কহিবা হেবে।

বিরক্তি এবং ক্রোধে, আর সেই সঙ্গে সেদিনকার সেই অপমানের স্মৃতিতে সর্বাঙ্গ যেন শক্ত হয়ে উঠল যোগেনের : হামি নি পারুম।

সুরেন চেঁচিয়ে বললে, ক্যানে ?

—ক্যানে ফের কী ? সব শালাই সমান হছে, যেমন মহিন্দর, তেমন নায়েব। কাঁউক ত্যাল্ মাখাই কোনো কাম হেবে না। ওই দুই শালার মাথায় ডাং মারের মগজ ফাঁক করি দিবা নাগে।

—হায়রে বাপ, ইটা কী কহিলুরে? বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সুরেন তাকিয়ে রইল : নায়েবক ডাং মারিবা চাহোছিস্, খুব তো বুকের পাটা হছে তোর।

—সিটা হছে—

আর অপেক্ষা না করে যোগেন চলে গেল সামনে থেকে।

—পারবু না তুই ?

—কহিছিই তো—

যোগেন অদৃশ্য হয়ে গেল, তাড়ি খাওয়া গলায় সমানে চীৎকার চালিয়ে চলল সুরেন। আর সেইদি.ই সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল যোগেনের জীবনে।

সবে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এই সময় বাড়ি ফিরল যোগেন। এটা ব্যতিক্রম—এমন সাধারণত হয় না। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরতে একটু বেশি রাতই হয় তার। কিন্তু কী যেন হয়েছে আজ—মনটা যেন ক্রমাগত বাড়ির দিকে ঘুরে ঘুরে আসছে। আজ বাড়ি শুধু বাড়িই নয়, একটা নতুন রূপ খুলেছে তার—একটা নতুন বৈশিষ্ট্য বিকসিত হয়ে উঠেছে। সুরেনের গালাগালি, কাঁচা চামড়ার গন্ধ, বাড়ির পেছনে গোবরের স্তূপ—সব মিলিয়ে এর যে একটা অপ্রীতিকর রূপ ছিল, আজ যেন কী একটা অপরূপ মন্ত্রে তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

কেমন মোহাচ্ছন্নতা ধরেছে যোগেনের। মৃদু জ্বরের মতো আড়ষ্ট শিথিল অলসতা, বুকের ভেতরে অহেতুক আলোড়ন। লঘু পায়ে কে যেন আসছে, কে যেন সতর্ক পা ফেলে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সকালের রোদে কিশোরীর একখানা কচি কোমল মুখ, সূর্যের আলোয় ঝলমলে দুটি চোখে বিস্ময়ের অতলতা।

সুরেন বাড়িতে নেই, যোগেনকে প্রাণপণে গালিগালাজ করে চলে গেছে চামারহাটিতে, নায়েবের সঙ্গে দেখা করাটা একান্তই দরকার। গেছে বিকেলের দিকেই, তার মানে ফিরতে অনেক রাত হবে। ভালোই হল, যোগেনকে দেখলেই চ্যাচাতে শুরু করত।

বাড়িতে পা দিয়ে ডাকল, মা ?

একটা প্রদীপ হাতে করে গোয়ালের দিক থেকে আসছিল সুশীলা। যোগেনের ডাকে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভীরুস্বরে বললে, মাউই বাড়িত্ নাই।

বুকের মধ্যে যোগেনের ধক্ করে উঠল চকিতের মধ্যে।

—বাড়িত্ নাই? কুন্ঠে গেইছে?

হাতে প্রদীপটা ধরে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল সুশীলা। প্রদীপের উর্ধ্বমুখী শিখা থেকে তার মুখে শান্ত নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে, ঘনপক্ষ্ম গভীর চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে উঠেছে কমনীয় সৌন্দর্যে। যোগেনের গলায় যেন আপনা থেকেই গান ভেসে আসতে চাইল: কালো দুটি নয়ন যেন ভ্রমর উড়ি যায়—

বুক কাঁপতে লাগল যোগেনের, গলা কাঁপতে লাগল।

—কুন্ঠে গেইছে মা?

—হাজারুর বাড়িত্। উয়ার বৌটার ছাওয়াল হেবে, ব্যথা উঠিছে, তাই ডাকি লি গেইল্। সংকুচিত মৃদু স্বরে সুশীলা জবাব দিলে। এত আস্তে—যেন বাতাসের সঙ্গে তার কথা ভেসে এল, অত্যন্ত উৎকর্ণ এবং সজাগ না থাকলে তা শুনতে পাওয়া যায় না।

যোগেন ঘামতে লাগল। একদিন যে নারীর সান্নিধ্য একটা কুৎসিত দুঃস্বপ্নের মতো ভাবনার নেপথ্যে সঞ্চারিত হয়ে ছিল, তাই ধরল একটা অপরূপ যাদুমন্ত্রের কুহক। রক্তে রক্তে জোয়ারের জলের মতো কী একটা উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল তার। শিল্পীর মনের ভিতরে ফুঁসে উঠল অন্ধ আবেগের আকুতি, নিষেধ মানতে চাইল না, বাধাও না।

আত্মবিস্মৃত যোগেন এগিয়ে এল। প্রায় নিঃশব্দ আর গভীর অপূর্ব কোমল গলায় ডাকল, সুশীলা?

সুশীলা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল, সাড়া দিলেনা।

যোগেন আরো এগিয়ে এল: সুশীলা?

এবারে একবার চোখ তুলেই সুশীলা আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিলে। কিন্তু

সে দৃষ্টির চকিত কটাক্ষ যেন মুহূর্তে চকিত করে দিলে যোগেনকে। মেয়েটিকে সে যত ছোট ভেবেছিল তা নয়। কিশোরীর মন অনেক আগেই জেগেছে, অনেক আগেই সে বুঝতে পেরেছে পুরুষের ওই ডাকের পেছনে কী লুকিয়ে আছে, আছে কিসের একটা নির্ভুল সুনিশ্চয়তা। যোগেন লক্ষ্য করল, একটু সরু হাসির রেখাও যেন সুশীলার অধরে মুহূর্তের জন্যে খেলা করে গেল।

আর সত্যিই তো, যোগেন লক্ষ্য করবে না বলেই কি থেমে থাকবে পৃথিবীর মানুষ, ঘুমিয়ে থাকবে তার মন, আচ্ছন্ন অচেতন হয়ে থাকবে তার বয়ঃসন্ধির বাসন্তী-চেতনা? চোদ্দ-পনেরো বছরের সুশীলা কি তার আশেপাশে দেখেনি যৌবনের উদ্দাম প্রণয়লীলাকে, তার বিবাহিতা সখীদের কাছে শোনেনি পুরুষের সম্পর্কে নানা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা? কতবার তো চোরাদৃষ্টির সামনে স্বামী-স্ত্রীর দুটি একটি আবিষ্ট মুহূর্তের অপরূপ ছবি ধরা পড়ে গেছে। তা ছাড়া তাদের ছোট লোকের ঘর। মানুষের জিভ আলগা. ধেনো আর পচাইয়ের নেশা একটু বেশি চড়ে উঠলে আচার-আচরণের মাত্রা সব সময়ে যে সীমা মেনে চলে তাও নয়। কতবার নিজের অজ্ঞাতেই রক্ত ছলছলিয়ে উঠেছে সুশীলার—ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে কান, বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড করেছে মাতামাতি।

আর যোগেন। সুন্দর, সুকণ্ঠ। নিজের বোনের মুখে কতবার শুনেছে তার কথা। শুনেছে তাদের জাতের ভেতরে এমন ছেলে আর হয় না। এখানে এসে দেখেছে তাকে, লক্ষ্য করেছে তার মুগ্ধ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য দৃষ্টি। তারপর শুনেছে যোগেনের মার মুখে বিয়ের সেই প্রস্তাবটা। যোগেনকেও দেখল—কল্পনার মানুষটির চাইতেও সুন্দর। তাই মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ের ভেতর দিয়েও যেন কতগুলো বছর এক সঙ্গে আবর্তিত হয়ে গেছে সুশীলার—তৈরী হয়ে গেছে মন—কে জানে প্রতীক্ষাও করে আছে কিনা।

পা কাঁপতে লাগল যোগেনের—আরো কাছে এগিয়ে এল সে। নেশা ধরেছে। হঠাৎ-ভালো-লাগার অপরূপ আবেগে শিল্পীর বুকে জেগেছে

চিরকালের জীবন-শিল্প। এগিয়ে চলল যোগেন। সুশীলার মুখে প্রদীপের আলো পড়ে একটা অপরূপ রঙে রাঙিয়ে তুলেছে তাকে। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে গেছে অসংখ্য দণ্ড, প্রহর, দিন, মাস, বৎসর।

যোগেন এগিয়ে এল। শীতের বাতাসে ঠাণ্ডা অথচ কোমল-কান্ত সুশীলার একখানা হাত টেনে নিলে মুঠোর মধ্যে। ফিস্ ফিস্ করে বললে, সুশীলা, সুশীলা?

—উঁ?

—তুমি বড় সুন্দোর—ভারী সুন্দোর।

—যাও কে বা আসি পড়িবে!

—না, কেহ্ আসিবে না। সুশীলা তুমাক্ হামি ভালোবাসি।

পুরোনো কথা, পুরোনো প্রেম, পুরোনো প্রকাশ, পুরোনো আবেগ। তারপর তেমনি পুরোনো ধরণেই দপ্ করে নিভে গেল প্রদীপটা।

উঠোনের ঠাণ্ডা অন্ধকারে শুধু গরম রক্তের চঞ্চলতা বুকে বুকে কথা কইতে লাগল—যতক্ষণ না দরজার বাইরে শোনা গেল যোগেনের মার কথার শব্দ।

সাত

বংশী মাষ্টার বুঝতে পারছিলনা ব্যাপারটা ঠিক হল কিনা।

চট্টরাজের ভঙ্গিটা ভালো নয়। চোখের দৃষ্টি সন্দেহজনক, মুখের কথায় বেশ পরিষ্কার একটা হুঁসিয়ারীর ইঙ্গিত আছে। তা ছাড়া পরিচয়ের ব্যাপারে কেমন সন্দেহ করেছে মনে হয়, হঠাৎ চুপ করে গেল, আর কথা বাড়াল না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, চামারের সরস্বতী পূজো করার উদ্দেশ্যটা ভালো লাগেনি। ভালো না লাগার কথাও বটে। শাস্ত্রে আছে দেবতারা সব ব্রাহ্মণ, আর দেবীরা হলেন ব্রাহ্মণী। শুধু ব্রাহ্মণী নন, ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তাঁরা এত বেশি সচেতন যে, অল্প একটুখানি ত্রুটির জন্যে অভিসম্পাত দিয়ে ভক্তকে নির্বংশ করতে তাঁদের বিবেকে বাধে না। আর সরস্বতীর তো কথাই নেই—তিনি একেবারে নিষ্পাপ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপা,—আর সে জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণের। শূদ্র যদি একবার সে পথে পা বাড়িয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে রাম-রাজ্যে অশান্তি দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে মারী-মড়ক-অন্নাভাব, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের অকালে পুত্রনাশ হয়েছে। ফলে ধর্মপ্রাণ রাজা তৎক্ষণাৎ খোলা তলোয়ার হাতে এগিয়ে এসেছেন আর শূদ্রের মুণ্ডটি পত্রপাঠ এবং একান্তই বিনা নোটিশে খচাং করে নামিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যার একচেটে মালিক ব্রাহ্মণের গড়া শাস্ত্র চড়া গলায় ঘোষণা করেছে: শূদ্র যদি বেদপাঠ করে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবে, অতঃপর তাহার গাত্রচর্ম উৎপাটন করিয়া তাহাকে ঘৃতে ভর্জন

করিবে, তৎপর খণ্ড খণ্ড করিয়া নদী-জলে নিক্ষেপ করিবে এবং সেটা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে।

কিন্তু কালটা কলি। দেশে ম্লেচ্ছ রাজা। তার না আছে ধর্মজ্ঞান, না আছে ব্রাহ্মণে ভক্তি। হাড়ির ছেলে হাকিম হয়ে ব্রাহ্মণকে জেলে দিচ্ছে—আশ্চর্য, তবু এখনো মহাপ্রলয় হচ্ছে না, আকাশে দ্বাদশ সূর্য উদিত হয়ে ভস্মীভূত করে দিচ্ছে না সংসারকে! কৃষ্ণবর্ণ কল্কি অবতার অগ্নিবর্ণ তরবারি হাতে ম্লেচ্ছ আর কুকুরগুলোকে (বংশী আশ্চর্য হয়ে ভাবে কুকুরের ওপরে হঠাৎ এ অহেতুক অকৃপা কেন!) পটাপট সাবাড় করে দিচ্ছেন না! তাই দায়ে পড়ে অনেক কিছুই হজম করে যেতে হচ্ছে। চাটুয্যে দাদা, বাঁড়ুয্যে মামা, লাহিড়ী খুড়ো আর ভাদুড়ী পিসের হাতের হুঁকোতে অভিমানে তামাক পুড়ে যাচ্ছে, দুর্বাসার বংশধরেরা কাল-মাহাত্ম্যে ঢোঁড়া সাপের খোলস হয়ে ব্যাঙের লাথি খাচ্ছে—নইলে চামারদের গ্রামেও কিনা প্রাইমারী ইস্কুল এবং এখনো তাতে বজ্র পড়েনি!

চট্টরাজের উদ্বেলিত টিকির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই বেদনাবোধটা অনুভব করছে বংশী পরামাণিক। আর সেই সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছে যে, চট্টরাজ শুধু ঢোঁড়া সাপের খোলসই নন, সাপত্ব তাঁর কিছু কিছু বিদ্যমান আছে এখনো। ছোবল তিনি মারতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত মারবেন কিনা, এখনো সেটাকে সঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে এটা স্পষ্ট যে, সরস্বতী পূজোর প্রস্তাবটা তাঁর পছন্দ হয়নি এবং ধর্মনিষ্ঠ জমিদার যে আজো প্রবল প্রতাপান্বিত, এটা জানাতেও বিন্দুমাত্র ভুল করেননি তিনি।

কিন্তু সব মিলিয়ে কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? উচিত হচ্ছে কি আকাশে সংঘর্ষের এই নিবিড় নিকষকালো ঝোড়ো মেঘকে ঘনিয়ে তোলা? সরস্বতী পূজো। অনধিকারী শূদ্রের অনধিকারী বিদ্যায়তনে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীকে আবাহন জানানো একটা ছোট গণ্ডির ভেতরে মস্ত বড় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বটে, কিন্তু এর চাইতে বড় কি কিছু করবার নেই?

আছেই তো। সমস্ত দেশ সেই বড় কাজের মুখ চেয়ে আছে—প্রতীক্ষা

করে আছে তারি জন্য। শুধু আকাশে ঘনিয়ে তুলবে না অকাল বৈশাখীর নাচ, একফালি ঝড় টেনে আনবে না মাত্র ছোট একটুখানি জনপদের ওপরে। সমস্ত পৃথিবীর মাটিকে তা নাড়া দেবে, চিড় ধরিয়ে দেবে আকাশে, তুফানের মাতলামি জাগাবে ক্ষ্যাপা সমুদ্রের বুকে।

মাটির তলায় ঘুমন্ত সেই গণ-বাসুকীকে জাগিয়ে তোলাই তো আজকের কাজ মহাতল-রসাতল-সপ্ততলের অতলে যেখানে মহানাগের সহস্র ফণায় একগাছি মালার মত বিধৃত হয়ে আছে পৃথিবীর ভারকেন্দ্র, সেই অতলে, মনুষ্যত্বের সকলের নীচের তলায়, সেইখানেই ধাক্কা দিতে হবে সেই কেন্দ্রে। এই ব্রতই তো ছিল।

কিন্তু অতুল মজুমদারের অসুবিধেটা আজকে বুঝতে পেরেছে বংশী পরামাণিক। এ কাজ করবার জন্যে যে মন চাই, যে প্রস্তুতি চাই, যে ভাষা আয়ত্ত করা চাই—সে ভাষা জানা নেই তার, সে প্রস্তুতি নেই, সে মন তো নেই। ভদ্রতা আর সংস্কার উঁকি দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, মাথা তুলছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহজ পথ চলার আরো সহজ সমাধান। গোটা কয়েক রিভলভার, কিছু বোমা, কিছু আগুন ঝরানো সাহিত্য আর হাসিমুখে মরতে পারার অম্লান গৌরব, ফাঁসির দড়িকে মণিহারের মত কণ্ঠে জড়িয়ে নেওয়ার নেশাগ্রস্ত প্রলোভন। এর সীমা অতুল মজুমদার অতিক্রম করতে পারেনি ঘাসের শিষে একফোঁটা রাত্রিশেষের শিশিরের মত সে হারিয়ে গেছে সত্যি, মুছেও গেছে—কিন্তু অতুল মজুমদারের আত্মা তো হারায়নি। 'বাসাংসি জীর্ণানি'—এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণে রেখে সে দেহ থেকে দেহান্তর ঘটিয়েছে। কিন্তু অজরামর আত্মা যাবে কোথায়! চার বছর ধরে নানাভাবে সে আত্মা দেখেছে এক নতুন দেশকে—জাতির এক নতুন প্রাণকেন্দ্রকে। বুঝেছে স্বাধীনতার এক নতুন আশ্চর্য অর্থ, অনুভব করেছে মুক্তির একটা অচিন্ত্যপূর্ব তাৎপর্যকে! আর এও জেনেছে—পথ এত সোজা নয়। মরতে পারার চাইতে বাঁচবার এবং বাঁচবার কাজ অনেক বেশি কঠিন, অনেক বেশি দরকারী।

তবু জানলেই তো হয় না। জানাকে কাজে লাগানো চাই। আর সে কাজ কঠিনতর তার পক্ষে। অতুল মজুমদারের প্রতিনিধি বংশী পরামাণিক মিশেছে চাষী-চামারদের সঙ্গে, তাদের সুখ-দুঃখের ভার নিয়ে দিতে চেয়েছে নিজের মন্ত্র, কিন্তু বৃথা হয়ে গেছে। এ হয় না, এ হবার নয়। আজ যেমন বুঝতে পেরেছে, এর জন্যে আসবে নতুন মানুষ, নতুন কর্মীর দল। এ তারাই পারবে, অতুল মজুমদার কিংবা বংশী পরামাণিক নয়।

তাই অস্বস্তি আর অস্থিরতা। মধ্যে মধ্যে মনটা যেন অসহ্য একটা যন্ত্রণায় বিকল হয়ে ওঠে। পথ পেয়েছে কিন্তু এগোতে পারছে না—পাথেয় নেই। থেমে দাঁড়িয়ে নিজের অকর্মণ্যতার জন্যে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। আর এই লুকিয়ে থাকা, একটা জানোয়ারের মত শিকারীর প্রখর দৃষ্টি থেকে নিজেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলা—এ যেন গুরুভার বলে মনে হয় এখন। দুবছর আগেই সকলের সঙ্গে যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—দুঃসহ একাকিত্বে যেন মরুভূমির ভেতরে পথ চলবার মত বোধ হচ্ছে আজকাল। তাই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে, নইলে মনে হয় লোহার গরাদের আড়ালে পাথরের পাঁচিলের যে ঠাণ্ডা অন্ধকার সেখানে আশ্রয় নেওয়াই ভালো।

তারপরেই মনে হয় শান্তিকে।

আজ যেখানেই থাকুক শান্তি, প্রতিশ্রুতি তো ভুললে চলবে না। একমাত্র অতটুকু মেয়েটাই সেদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তার, চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তাকে। যতটুকু হোক, যে ভাবেই হোক, সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে। এই অতুল মজুমদারের শেষ কথা। বড় কাজ করতে না পারো, অন্তত ছোটর ভেতরেও যতটা পারা যায় তাই করো। নিজের কাছে নিজেরই হার মানা অসম্ভব। তাই—

তাই এই ভালো।

বংশী একবার অন্যমনস্কভাবে তাকাল নিজের সব্জী বাগানটার দিকে। কেমন খচ্ খচ্ করে উঠল, কোথায় যেন লাগল কাঁটার খোঁচা! শীতের

ফসলে এইটুকু বাগানটা কী চমৎকার অর্ঘ্য সাজিয়েছে। মূলো, কপি টম্যাটো। উজ্জ্বল, মসৃণ, সতেজ। দেশকে ভালোবেসেছে প্রাণ দিয়ে, দেশের মাটি দিয়েছে প্রতিদান—কণামাত্র কৃপণতা করেনি তো। আর এই তো—এই তো সত্য। বংশীর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। হ্যাঁ-সে তার পথ পেয়েছে বইকি। দেশ জুড়ে ফসল ফলাতে নাই বা পারল সে, কিন্তু ক্ষতি কী যদি এইটুকু জমিতে সে এমনি প্রাণবন্ত শস্যকে জাগিয়ে দিতে পারে। সামান্য সরস্বতী পূজো—কিন্তু তার ভেতরে অসামান্যতার সম্ভাবনাও যে প্রচ্ছন্ন আছে! শেষটা নাই বা দেখে যেতে পারল, কিন্তু শুরুর যে মূল্য তাকে কে অস্বীকার করবে?

শীতের সব্জী—মসৃণ, ঘন শ্যামল, প্রাণে আর স্বাস্থ্যে সমুদ্ভাসিত। দেশের মাটি তাকে ভালোবেসেছে। কেমন কষ্ট হতে লাগল। মায়া পড়ে গেছে, মনে হচ্ছে এ হলেও নেহাৎ মন্দ ছিল না। এই নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য পাড়াগাঁ—ভূগোলের হট্টগোলের বাইরে ভানুমতীর কুহক-লাগা আত্মবিস্মৃত চাষারদের নগণ্য জনপদ। ক্ষতি কি ছিল এইখানে ভুলে থাকলে, দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি জুড়িয়ে নিলে এখানকার ঘন পাতায় ছাওয়া চির পুরোনো অতিকায় বংশী-বটের ছায়ায়! সরস্বতী পূজোকে কেন্দ্র করে যে তুফান ওঠবার আশঙ্কা, তাতে এই নোঙর থাকবে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া আরো একটু কথা আছে। মহিন্দর হঠাৎ নতুন দারোগা সাহেবের কথাটাই বা অমন করে জিজ্ঞাসা করে বসল কেন?

মায়া লাগছে নোঙর ছিঁড়তে, কষ্ট হচ্ছে এই মাটির ভালবাসাকে পেছনে ফেলে যেতে। কিন্তু উপায় নেই। শান্তির সেই শামলা মুখখানা দৃষ্টির সামনে ভাসছে। প্রতিজ্ঞা ভুললে চলবে না। আর—আর এই সব্জী ক্ষেতের অন্য একটা দিকও তো প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে তার কাছে। ছোট দিয়ে শুরু করতে হবে, সারা যদি অনেক দূরে থাকে তো থাক না। যারা আসবার তারা পেছনে আসবে, তার শুধু বীজ ছড়িয়ে যাওয়ার পালা।

তাই বড় ভালো লেগেছে যোগেনকে। বংশী মৃদু হাসল : চার বছর পরে অতুল মজুমদারের প্রথম রিক্রুট। রিভলভারের পথে নয়, রোমাঞ্চ জাগানো রক্ত গরমকরা বই পড়িয়ে ক্ষিপ্ত করে তুলেও নয়! মাটির মানুষের মাটির ভাষা অতুল মজুমদার জানত না, যোগেন জানে; তাদের প্রত্যক্ষ বেদনার সঙ্গে অতুল মজুমদারের পরিচয় নেই, যোগেনের আছে; তাদের প্রতিদিনের অপমান আর তুচ্ছতার আঘাত অতুল মজুমদারের কাছে হয়তো অনেকটাই দুর্বোধ, কিন্তু যোগেনের কাছে তা অতিরিক্ত সুস্পষ্ট। সবই ছিল, কিন্তু বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবার কেউ ছিল না। সেই কাজটুকুই করেছে বংশী, এবার আগুন নিজের তাগিদেই নিজের কাজ করে যাবে।

—মাষ্টার কি ফের বসি বসি ঘুমাবা নাগিলে?

মহিন্দর।

বংশী হাসল : না ঘুমোইনি।

—তো নি ঘুমাও। তোমার সাথে ফের কাজের কথা আছে।

বংশী তেমনি হেসে মহিন্দরের কথার অনুকরণ করে বললে, তো কও।

মহিন্দর গম্ভীর স্বরে বললে, ইটা হাসিবার মতো কথা নহো মাষ্টার. মন দিয়া শুনিবা হেবে, বুঝিবা হেবে, ভাবিবা নাগিবে।

বংশী এবার ভালো করে তাকালো মহিন্দরের দিকে। না, ঠিক অনুকূল আবহাওয়াটা। একটা কিছুর ভারে মহিন্দরের মুখে খানিকটা থমথমে গাম্ভীর্য জমে উঠেছে। এখন, অন্তত এই মুহূর্তে সে নিছক মহিন্দর নয়। শ্রীমহিন্দর কৃষ্ণদাস—গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি। এখন যেন হাতে কলম পেলেই নিবটাকে দুফাঁক করে একখানা রেপ্‌ কাগজে সে সই করে দেবে। তার মুখ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে তাকে লাথি মারলে নায়েব মশাই পর্যন্ত পার পান না, নগদ নগদ একটি টাকা বখশিস দিয়ে তবে তাঁকে মানীর মান রক্ষা করতে হয়।

মহিন্দরের ওই গম্ভীর চিন্তিত মুখের দিকে তাকালে কেমন সুড়সুড়ি

লাগে বংশী মাষ্টারের। কাজটা উচিত নয় তা জানে, তবু হাসি চাপতে পারে না। মহিন্দর উপদেশ দিতে এসেছে। অত্যন্ত গম্ভীর আর বিচক্ষণ চেহারা করে বলবে, বুঝিলা হে মাষ্টার, তুমাদের ছোয়া ছেইল্যার উসব চালাকি দিয়া কাম হেবে না—

সুতরাং বংশীকে স্মিতমুখে চুপ করে থাকতে দেখে মহিন্দর উত্তেজনা বোধ করল।

—অমন হাসিছ ক্যানে মাষ্টার?

—হাসব না?

—না তো।

—তবে কি কাঁদতে হবে?

—ল্যাও—ইটা কী কহিলে!—মহিন্দর অত্যন্ত বিরক্ত করে তুলল মুখের চেহারা: ঝুটমুট কাঁদিবার কী হৈল্ হে তুমার? কাঁদিবে ক্যানে?

মহিন্দর চটলে চটাতে ভালো লাগে। বংশী বললে, তবে কী করব?

—হামার কথাটা শুনিবে কি না শুনিবে সিটাই কহ।

—কেন শুনব না? তুমিই তো সে কথা বলছ না, খালি এটা ওটা বকছ। যা বলবার স্পষ্ট করেই বলোনা বাপু।

মহিন্দর বললে, হুঁ—তারপর দাওয়ার একপাশে বসে পড়ল।

—কী হল?

মহিন্দর কেমন বেদনার্ত চোখ তুলে মাষ্টারের দিকে তাকালো: হেবে না।

—কী হেবে না?

আহত স্বরে মহিন্দর বললে, আমি তো আগতে তুমাক্ কহিছিনু। তুমি ঢের নিখিছ, কিন্তু বুঢ়া মাইন্ষের কথাটা মাইন্লেন না। এখন ফের তো অপমান হৈ গেল্!

মানীলোক মহিন্দরের এমন একটা অপমান চট করে হয়ে গেল কী করে

ঠিক বুঝতে পারল না বংশী। অনুমান যা করেছে সেটাকে নিশ্চিত করে নেবার জন্যই সে নির্বাক চোখে মহিন্দরের দিকে তাকিয়ে রইল।

— বুঝিলা মাষ্টার, দিবে না।

—কী দেবে না?—মাষ্টারের কণ্ঠে এবার অধৈর্য প্রকাশ পেল।

—পূজা করিবা।

—ওঃ, বুঝতে পেরেছি—বংশী নিজের মনেই মাথা নাড়ল একবার। কথাটা আকস্মিক তো নয়ই, বরং এটা শোনবার জন্যেই যেন তার মন নিভৃতে এতক্ষণ আশা করে বসেছিল। বংশী বললে, বাধা দিচ্ছে কে? নায়েব মশাই?

—তো কে?—মহিন্দর ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, উ শালা শয়তানের হাড়।

—তুমি তো খুব ভালো বলছিলে তখন।

—কহিছিনু তো।—মহিন্দর অকপট স্বীকারোক্তি করলে এবারেঃ সাধ করি কি আর কহিছি নাকি? শয়তানকে উঁচা পিঢ়া দিবা নাগে না? এখন তো দেখিবা পাছি—শয়তানকে পিঢ়া দিয়া বা কী হেবে—উ শালা শালাই থাকে চিরকাল।

কথাটা নতুন রকমের লাগল। নায়েবের প্রতি মহিন্দরের ভক্তিটা বিখ্যাত জিনিস, তার রাজপ্রীতি একবারে শাস্ত্রীয় পথ অনুসরণ করে চলে কিন্তু হঠাৎ এ ব্যতিক্রম কেন?

বংশী প্রশ্ন করলে, কী বললে নায়েব?

—পষ্ট করি কিছু কহে নাই। তুমি আসিবা পর খুব হাসিলে। কহিলে কি, চামারক লাথি মারিলে গঙ্গাত্ নাহিতে যিবা নাগে, যে চামার পায়ের জুতা গঢ়ায়, সি শালারা সরস্বতী পূজা করিবা চাহে। তারপর হামাক কহিলে, একটা ছেঁড়া জুতা লিয়া পূজা কর—ওই জুতা সরস্সতীই তুদের দানাপানি দিবে।

বংশী চুপ করে রইল। একথাও শোনবার আশা করেছিল।

মহিন্দরের গলা হঠাৎ কেঁপে উঠল উত্তেজনায়।

—মাষ্টার?

—বলো।

—ঢের সহিছি আমরা।

—অনেক।

—কথায় কথায় জুতা মারিলে হামাদের, হামাদের প্যাটের ভাত কাড়ি খালে, হামাদের বৌ-ঝিক আইত্ (রাত) করি লিই গ্যালে কাছারিত্—হামরা সহি গেনু। এত করোছি খোসাছি, তোয়াজ করোছি, তাঁয় তভু হামাদের মানুষ বলি মানিবা চাহে না! ক্যানে, অ্যাতে কী দোষ করোছি হামরা?

বংশীর চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তবে ভুল হয়নি। তার সব্জীক্ষেতের ছোট ফসল বীজ ছড়াবার উপক্রম করেছে। মানী লোক মহিন্দরের মানে ঘা লেগেছে, একদিন—এমনি করে দেশের সমস্ত মানুষের মানেই ঘা লাগবে নিঃসন্দেহ। সেদিন দূরে নয়, তা এগিয়ে আসছে। সরস্বতী পূজোকে অবলম্বন করে উদ্বোধন হবে চামুণ্ডার -দিকে দিকে তারই রক্তাক্ত সংকেত।

— তুমি কী করবে মহিন্দর?

— কী করিমু? সিটাই তো তোমার ঠাঁই জানিবা আইনু।

মহিন্দরের মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত ভাববিবর্তন ঘটে গেছে একটা। প্রথমে এসেছিল উপদেশ দিতে, তখন সে মুখে ছিল আতঙ্কের ছায়া, ছিল সাবধানীর সতর্কতার দ্যোতনা। কিন্তু চট্টরাজের কথাগুলো স্মরণ করতে গিয়েই দপ করে শিখায়িত হয়ে উঠেছে মহিন্দর। হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, শয়তানকে উঁচু পিঁড়ি দিয়ে আর লাভ নেই, তাতে তার খাঁই মেটে না, বরং লাফে লাফে সেটা বেড়েই চলতে থাকে। তাই হঠাৎ বিদ্রোহী হয়েছে মহিন্দর। জলো ঢোঁড়া এতকাল দাপাদাপি করেছে নিশ্চিন্ত সুযোগে, এবার খোঁচা লেগেছে কাল্ কেউটের গায়ে।

বংশী বললে, আমার কথা শুনবে ?

—সিটাই শুনিবা আইনু।

বংশী বললে, তবে পূজো করতেই হবে।

—পূজা ?

—হাঁ, পূজা।

—করিবা হেবে ?

—নিশ্চয় করতে হবে। তোমাদের এমন করে অপমান করে যাবে, তোমার মতো মানী লোককে যা মুখে আসে তাই বলবে, তবু তুমি সয়ে যাবে মহিন্দর ?

মহিন্দর এবার চোখ তুলল। আগ্নেয় চোখ।

—না।

—তবে কী করবে ?

মহিন্দর কঠিন স্বরে বললে, পূজাই করিমু।

—যদি বাধা দেয় ?

—সিটা তখন দেখা যিবে। মারামারি করিবা জানি হামরা। মহিন্দর হঠাৎ উঠে পড়ল ঃ তুমি নাগি যাও মাষ্টার—টাকার জন্য ভাবেন না। হামি ঠিক করি দিমু।

—এইটেই পাকা কথা।

—হামার কথা নড়ে না।

—নায়েবকে কী বলবে ?

—কিছুই কহিমু না—কঠিন কণ্ঠে মহিন্দর বলে চলল, উ শালা তো কাইল চলি যিবে। যদি জানিবা পারে, যদি বাধা দেয় তো হামরাও লাঠি ধরিবা শিখিছি। হামরা ছোটলোক, হামরা মুচি, হামাদের লাথি মাইল্লে গঙ্গাত্ চান করিবা নাগে! হামাদের ছেঁড়া জুতা পূজা করিবা কহে! আচ্ছা দেখিমু!

মহিন্দর চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, বিকালে ফের আসিমু মাষ্টার।

আকাশে প্রথম ঝোড়ো মেঘ। জলন্ত বিদ্যুতের কশাঘাত। বংশী মাষ্টারের হৃৎপিণ্ড আনন্দে যেন লাফাতে লাগল।

* * * *

একটা গানের আড্ডা আছে যোগেনের, সেই আড্ডাতেই আলকাপের দল করে গড়ে তোলার কথা ভাবছে। মোটামুটি সবই আছে, অভাব শুধু একটা ক্ল্যারিয়োনেটের। যাত্রার দলে থেকে বাদ্যবাজনাগুলো সম্পর্কে তার একটা ধারণা হয়েছে চলনসই রকমের, ক্ল্যারিয়োনেট বাঁশী না থাকলে আজকাল আর গান জমে না। কিন্তু নিতান্তই চামারদের গ্রাম। ক্ল্যারিয়োনেট বাজনাতো দূরের কথা, অনেকে তা চোখেও দেখেনি। কিনে একটা আনা যায় বটে, কিন্তু অনেক দাম, গাঁট থেকে অতগুলো টাকা দেওয়া এখন সম্ভব নয় যোগেনের। মার হাতে টাকা নেই আর সুরেনের ভাইয়ের সুধাকণ্ঠ সম্পর্কে যত অনুরাগই থাকুক, অতগুলি টাকা চাইতে গেলে একেবারে খ্যাঁক খ্যাঁক করে তাড়া করে আসবে। সুতরাং যখন খবর পাওয়া গেল দামড়ি গাঁয়ের ধলাই মুচি আজকাল বিয়ে বাড়িতে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যারিয়োনেট বাজিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন উৎসাহিত হয়ে উঠল যোগেন। সকালে উঠেই গেল দামড়িতে। ধলাইকে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু মেজাজ দেখে মাথা গরম হয়ে উঠল যোগেনের।

ধলাই বললে, হুঁ, বাজাবা হামি পারি। কিন্তু কী রকম দলের সঙ্গে বাজাবা হেবে সিটা তো হামার জানিবা নাগে।

—না দল ভালোই আছে।

—ভালো?—অনুকম্পার হাসি হাসল ধলাই: সাহার আলকাপের দলে হামি বাজান্থ, ফের বাজাইনু বদন মণ্ডলের যাত্রার দলে। সি সক্কলের চাইতেও তুমার দল ভালো না, কি হে?

বলাইয়ের কথার ভঙ্গিতে যোগেন অপমানিত বোধ করল। কিন্তু গরজের বালাই যখন তার, তখন খোঁচাটা হজম করে যেতেই হবে। শুষ্ক হাসি হেসে যোগেন বললে, অত ভালো কি আর হেবে হামার দল? একটু কষ্ট করিই বাজাবা হেবে তুমাক।

সৌখিন সরু গোঁফে মিহি করে একটু তা দিলে ধলাই। বেশ বোঝা যায় একটু ওপর থেকে, একটু বাঁকা করুণার দৃষ্টিতে যোগেনকে পর্যবেক্ষণ করছে সে। অহঙ্কারে ফেটে পড়েছে লোকটা—সাতখানা গাঁয়ের ভেতরে একটি মূল্যবান ক্ল্যারিয়োনেটের মালিক সে।

ধলাই বললে, গাঁ[illegible]বে কে?

—হামি।

—তালমান জানো হে?

এটা চূড়ান্ত। যোগেন বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে করে ধলাই তার হাত ধরে ফেলল। হেসে বললে, আরে, আরে চটি যাচ ক্যানে? বইস, তামুক খাও, দুটা একটা কাজ-কামের কথা কহো। গুণী মানুষের কাছেই তো ফের গুণী মানুষ নিজের কথাটা কহিবা চাহে। অমন ক্যস করি চটি গেলে কি কাম হয়?

এবার বোঝা গেল মুখে যেমন করুক না কেন, মনের দিক থেকে একটা তাগিদ আছে ধলাইয়ের নিজেরও। একটা কোনো জায়গা তারও দরকার, তারও প্রয়োজন কোনো একটা জায়গাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া। ওটুকু অহমিকা শিল্পী-সুলভ, ওটুকু না থাকলে নিজের ওপর যেন নিজেরই জোর থাকে না। শেষ পর্যন্ত কথা পাকা হয়ে গেল। লাভের চার আনা। একটু বেশিই হল, কিন্তু উপায় ছিল না তা ছাড়া। সত্যিই তো যোগেন ছাড়া এমন গুণী তার দলে আর কে আছে?

কথাবার্তা শেষ করে যোগেন যখন বাড়ীর দিকে ফিরছিল তখন বেলা দুপুর। শীতের দিনেও এই খোলা মাঠের ভেতরে ধূলোর পথটা গরম হয়ে

উঠেছে। পথের এপাশে আমগাছগুলোতে এরই মধ্যে 'বউল' পড়েছে, সোনালি সৌন্দর্য আর দুটি চারটি কচি কোমল পাতায় পুলকিত আত্মপ্রকাশে একটা নতুন ঐশ্বর্য ভাণ্ডার যেন বিকসিত হয়ে পড়েছে।

পথ চলতে চলতে একটা মোহন মাদকতায় ভরে গেছে মন। কাল অনেক রাত পর্যন্ত গান লিখেছে, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অতন্দ্র ভাবনার মধ্যে শুনেছে সুরের আশ্চর্য সঞ্চার। কোথায় যেন এতদিন পর্যন্ত বন্ধ দরজা ছিল একটা, তার বাইরে মাথা কুটেছে যোগেনের সমস্ত চেষ্টা, কিন্তু ভেতরে ঢোকবার পথটাকে খুঁজে পায়নি। কখনো কখনো সেই বন্ধ দরজার ফাঁকে ফাঁকে এক একটা আলোর রশ্মির মতো এসেছে সুর, এক একটা বিস্ময় বিচিত্র পুলক। যতটুকু পেয়েছে তা অনেকটা না পাওয়ার ব্যথাকেই তুলছে সজাগ আর সুতীক্ষ্ণ করে। যোগেনের মনে হয়েছে, অনেক কথা আছে তার, অনেক গান আছে—অথচ ঠিক তাদের সে ধরতে পারছে না। অতৃপ্তি বোধ হয়েছে, অভিমান জেগেছে নিজের ওপরে। কিন্তু কী যে হল কাল—কেমন করে যেন সে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে অপরূপ অপর্যাপ্ত আলো এসে তাকে যেন স্নান করিয়ে দিয়ে গেল। কাল এক রাত্রির মধ্যে আট দশটা গান সে লিখে ফেলেছে, সুর দিয়েছে তাতে। নিজের ভেতরে এমন যে সৃষ্টির প্রচুরতা তার ছিল, এ যোগেনের জীবনে একটা আকস্মিক আবিষ্কার। ফুলে ফুলে আলো হয়ে ওঠা শরতের একটা শেফালি গাছকে হঠাৎ নাড়া দিলে যেমন এক মুহূর্তে ঝুর ঝুর করে অজস্র ফুল স্নিগ্ধ হাসির মতো ঝরে পড়ে, তারও ঠিক তেমনি হয়েছে। কথার শেষ নেই, গানের শেষ নেই। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবে বুঝতে পারে না। একটা গান লিখতে লিখতে আর একটা গান এসে পড়ে, একটা সুরের ভেতরে ঘটে আর একটা সুরের অনধিকারী সঞ্চার। বিস্মিত বিহ্বল হয়ে গেছে যোগেন, সহস্র সুরে মন তার গান গেয়ে উঠতে চায়।

কিন্তু কেন ?

রক্তের ভেতরে মৃদু কল্লোল শুনতে পাওয়া গেল। কী অদ্ভুত সন্ধ্যা! প্রদীপের আলোয় সুশীলার মুখ সন্ধ্যাতারার মতো ঝলমল করছিল। আর একটি প্যাচপেঁচে গলির একটি বীভৎস অন্ধকারের সঙ্গে এর কত পার্থক্য। মেয়েমানুষের সম্পর্কে একটা কুশ্রী ঘৃণায় যোগেন বিতৃষ্ণ হয়েছিল এতকাল, হঠাৎ দেখতে পেল এর আর একটা দিকও আছে। মনকে কালো করে দেয় না, বন্ধ দরজাটা হাট করে দিয়ে সমস্ত আলো করে তোলে।

এই ভালোবাসা? এই পিরিতী? এরই জন্যে মানুষ এমন করে আকুতি করেছে গানে গানে, এরই জন্য শ্রীরাধা যমুনার কালো জলে ভাসিয়ে দিলেন তাঁর যৌবন? আশ্চর্য নয় কিছুই, অবিশ্বাস্য নয় এতটুকুও। যোগেন বুঝতে পেরেছে এবার। বুঝেছে কেন বন্ধুর জন্যে কলঙ্কের ডালা অসংকোচে মাথায় তুলে নিতে বাধে না এক বিন্দুও, কেন বারবার একথা মনে হয়, 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কেরই হার গলায় পরিতে সুখ'।

যোগেন গুন গুন করতে লাগল:

আর কত কাল রহি ঘরে পাষাণে বুক বাঁধিয়া,
হায় হায় হায়, জনম গেল কাঁদিয়া!
তিলেক তুমায় না দেখিয়া,
হে, পরাণ আমার যায় জ্বলিয়া
তভু তো মথুরা গেইল্যা, ওরে আমার দরদিয়া—

শরতের শিউলি ডালে ঝাঁকুনি লেগেছে। ফুল ঝরছে, রাশি রাশি ফুল। একটি ছোঁয়ায়, বুকে বুকে কয়েকটি মুহূর্তের মাতলামিতে মাতাল করে তুলেছে সমস্ত জীবন। এবার সত্যিই বড় আলকাপওলা হবে যোগেন, সত্যিকারের গাইয়ে হবে, দিকে দিকে নাম ছড়িয়ে যাবে তার, লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে ওই যাচ্ছে যোগেন আলকাপওলা।

কিন্তু বংশী মাস্টার। হঠাৎ মনের প্রসন্নতার ওপরে লঘু মেঘ ভেসে গেল

এক টুকরো। মাষ্টার যে মন্ত্র দিয়েছে সে মন্ত্র কি ফুল-ঝরা পথে চলার, না কোন দূর দুর্গমের অভিযাত্রায়? ফুল না কাঁটা?

যেন যোগেনের বিদ্রোহ করে উঠতে ইচ্ছে করল। কী লাভ তার জমিদারকে আক্রমণ করে, মহাজনকে গাল দিয়ে? জমিদার থাকুক জমিদারের মতো, মহাজন থাক তার নিজের মর্জিমাফিক। আরো তো লোক আছে দেশে, আরো তো বহু মানুষ জর্জরিত হচ্ছে জমিদারের অত্যাচারে! কিন্তু কী দরকার তার—কী প্রয়োজন তারই একমাত্র প্রতিবাদ জানিয়ে? সকলের যেমন করে দিন কাটছে, তারও কাটুক। সকলে যেমন করে ঘর বাঁধে, ভালোবাসে নিজের বউকে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে, তাইই করবে যোগেন, তাদের থেকে সে আলাদা হতে চায় না, চলতে চায় না কোন দুঃসাহসিক নতুনের দুর্গমতায়।

বংশী মাস্টারের ওপরে রাগ হতে লাগল। অকারণে দুর্বুদ্ধি দিচ্ছে তাকে। ব্যস্ত করে তুলছে দিব্যি জলজ্যান্ত সুস্থ শরীরটাকে। সৃষ্টিছাড়া লোকের সৃষ্টিছাড়া বুদ্ধি, অনর্থক কতগুলো মানুষকে চটিয়ে দিয়ে ঝামেলা বাধিয়ে তুলতে চায়। আর তা ছাড়া প্রতিপক্ষও নগণ্য নয়। জমিদার, মহাজন, বামুন। সমাজের তিন তিনটে মাথা, যারা ইচ্ছে করলে চাষার যা কিছু ফোঁসফোঁসানি এক লহমায় সব ইতি করে দিতে পারে। চাষাদের সরস্বতী পূজো! কী দরকার ওসব বাবুয়ানা করে! জুতো সেলাই আর জমিতে লাঙল দিয়ে যাদের সাতপুরুষ কেটে গেল, কোন মতে নামটা সই করতে পারলেই যারা সমাজে মাতব্বর হয়ে যায়, তাদের পক্ষে ও সব বদখেয়ালের কোনো মানে হয় না। এরই নাম গরীবের ঘোড়ারোগ. সবশুদ্ধ ডুবে মরবার মতলব।

তার চেয়ে দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাট সুশীলা। ফুলের মতো নরম। এত সুন্দর, এমন বুকভরা। যোগেন আর কিছু চায় না। রাশি রাশি কথা, রাশি রাশি গান। ঝুর ঝুর করে ফুল ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গে—নিশ্চিন্ত আরামে, অপরূপ একটা আবেশে যেন ঝিম ধরে আসে, যেন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

কিন্তু মাঠের রোদটা হঠাৎ যেন অতিরিক্ত গরম বলে বোধ হল। হঠাৎ যেন মনে হল গায়ের চামড়াটায় একটা মৃদু উত্তাপ লাগছে, জামার ভেতরে ঘাম গলে পড়ছে এই শীতের দুপুরেও। বেলাটা কত চড়েছে সেটাই যেন বুঝবার জন্যে একবার আকাশের দিকে তাকালো যোগেন। আর তখনি—

তখনি চোখে পড়ল আকাশে জ্বলন্ত সূর্য।

জ্বলন্ত সূর্য। ধক্ ধক্ করে আগুন ছড়াচ্ছে—জ্বলছে—হিংস্র নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর একটা চোখের মতো। ছায়া রাখবে না কোথাও, রাখবে না স্নিগ্ধতা, তার তাপে শরতের ঝরা শিউলি শুকিয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। পৃথিবীটা শুধু শরতের শিশিরে ভেজা সকালই নয়।

সূর্যের দিকে চোখ কুঞ্চিত করে বিকৃত মুখে তাকালো যোগেন। যতই তীব্র হোক, অস্বীকার করবার যো নেই ওকে। আর ওই চোখ—

ওই চোখ বংশী মাষ্টারের। আজ সন্ধ্যায় তাকে দেখা করতেই হবে বংশীর সঙ্গে। উপায় নেই, সুশীলাকে নিয়ে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না অপরূপ অন্ধকারের আড়ালে।

আট

ক্ষেতে ক্ষেতে শীতের সর্ষে ফুল ফোটা প্রায় শেষ হয়ে গেল। মাঠের ওপর শেষরাত্রে আর তেমন করে শাদা রঙের কুয়াসা ঘন হয়ে নামে না আজকাল। আমের কচি মুকুল ধরেছে, সোনার মতো রঙ। পৃথিবী বদলাচ্ছে। বাসন্তী পূর্ণিমার দিন আসছে এগিয়ে—ফিকে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে গাছের পাতার চেহারা। বাসন্তী রঙের স্বপ্ন ছড়াচ্ছে চারদিকে।

এর মধ্যে সময়টাও এগিয়ে গেছে দ্রুত। মাষ্টারের সব্‌জী ক্ষেতে কপি-মূলো প্রায় নিঃশেষ। একা মানুষ—সামান্যই খেয়েছে, বাকীটা দিয়েছে ইচ্ছে মতো সকলকে বিতরণ করে। দুটি চারটি যা বাকী আছে তা সরস্বতী পূজোর সময় কাজে লাগবে। টম্যাটো গাছের ঝাড়গুলো ক্রমশ শুকিয়ে আসছে, ফল আর তেমন বড়ো হয় না—একটু বাড়তে না বাড়তেই কন্টিকারী ফলের মতো হলদে হয়ে যায়, তারপর পড়ে যায় মাটিতে। মূলোর গাছ অবশিষ্ট দু একটা যা আছে, তাদের পাতাগুলো ঝাঁঝরা ঝাঁঝরা করে খেয়েছে সবুজ রঙের ছোট ছোট কীট—এক রকমের উড়ন্ত পোকা। মহিন্দরের হুঁকোর জল দিয়ে তাদের ঠেকানো যায়নি।

ইস্কুলের বারান্দায় সরস্বতী তৈরী হচ্ছে। একটু দূরের গ্রাম থেকে এসেছে একজন রাজবংশী। কুমোর-টুমোর এদিকে নেই, একেবারে শহরের কাছাকাছি না গেলে তাদের পাত্তা মেলে না। তাই চাষী রাজবংশী এই সুবল বর্মণই তাদের ভরসা। একটু একটু মাটির কাজ নিজে নিজেই

শিখেছিল, প্রথম প্রথম তা দিয়ে খেয়াল-খুশি মাফিক শীতলা আর বিষহরী তৈরী করত, এখন রোজগারের একটা নতুন পথ পাওয়া গেছে দেখে দস্তুর মতো এ নিয়ে ব্যবসা করে সুবল। শীতলা বিষহরী তো গড়েই, তা ছাড়া ফরমায়েস্ অনুযায়ী সব কিছু গড়তে চেষ্টা করে। গত দু বছর থেকে কালীও বানিয়েছে খানকতক। পয়সার খাঁই নেই সুবলের, দু তিনটে টাকা পেলেই বেশ বড় গোছের মূর্তি তৈরী করে দিয়ে যায়।

ইস্কুলের বারান্দায় সে প্রতিমায় খড় বাঁধছে, একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে বংশী। সুবল বর্মণের সরস্বতী সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। যা একটি গড়তে যাচ্ছিল তা ছিন্নমস্তাও হতে পারে—গণেশ হওয়াও আশ্চর্য নয়, অন্তত তার খড় বাঁধার নমুনা দেখে এরকম একটা আশঙ্কাই জাগছিল। তাই হৈ হৈ করে এসে পড়েছিল বংশী মাষ্টার। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখিয়ে দিয়েছে—পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে সে ঠিক কী চায়। শুনে মাথা নেড়ে সুবল বলেছে, হুঁ—হুঁ, ইবারে বুঝিছু। খানিকটা বিষহরীর মাফিক করিবা হেবে।

—ঠিক ঠিক।—বংশী উৎসাহ দিলে: তবে একেবারে বিষহরীর মতো নয়। রঙটা ধপ্‌ধপে সাদা করে দিতে হবে।

—মেম সাহিবগুলার মতন?

বংশী হেসে বললে, হ্যাঁ, সরস্বতীর রঙ মেম সাহেবদের মতোই।

—আর কী করিবা হেবে?

—তাতে সাপ থাকবে না।

—তো কী থাকিবে?

—বীণা।

—বীণাটা ফের কেমন হৈল্?

বীণার আকার প্রকার বোঝাতে গিয়ে বংশী দেখল পণ্ডশ্রম। তাই কাজটাকে সহজ করবার জন্যে বললে, গাব্‌গুবাগুব্ জানো?

সুবল দাঁত বের করে বললে, হে, হে সিটা আর ক্যানে জানিমুনা?

—ঠিক সেই রকম।

—আর কী করিবা হেনে?

—পায়ের কাছে একটা পদ্ম আর হাঁস দিতে হবে।

—হাঁস? কী হাঁস? পাতি?

—না না, রাজহাঁস।

—তো ঠিক বুঝিন্থ—জবাব দিয়ে সুবল কাজে লেগে গেছে। কিন্তু ঠিক বুঝেছে বলাতেও বংশী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখেছে। তবু যতদূর মনে হচ্ছে, হাঁসটা ঠিক হাঁস হবে না, ময়র আর শকুনের মাঝামাঝি কিছু একটা রূপ নেবে। কিন্তু উপায় নেই—এর বেশী কাজ সুবল বর্মণের কাছ থেকে আশা করা সম্ভব নয়।

খুব গম্ভীর মুখে কাজ করছে সুবল। ইস্কুলের পড়ুয়া আট দশটা আধ-ন্যাংটো ছেলে এসে কাছে জুটেছে, এই মহৎ কাজে কিছু একটা ফুট ফরমাস্ খাটতে পারলে একেবারে চরিতার্থ হয়ে যাবে। সুবল নিজের উপযুক্ত পদ মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করিয়ে নিচ্ছে ছেলেগুলোকে দিয়ে। হাতের কাছে তারা খড়ের যোগান দিচ্ছে, দড়ি দিচ্ছে এগিয়ে। একটু ভুল হলেই ধমক দিচ্ছে সুবল: হেঃ দেখ দেখ, বোকাটা কি বা করোছে হে!

এরই মধ্যে মহিন্দর এল।

—শুনিলা হে মাষ্টার?

—শুনছি, কী বলবে বলো।

—চল্লিশটা টাকা উঠিলে। আর ক্যাতে নাগিবে?

বংশী বিস্মিত হয়ে বললে, চল্লিশ টাকা তুলেছ? তবে তো ঢের হয়েছে—এর বেশি আর লাগবে না মহিন্দর।

—নাগিবে না? ইতেই হই যাবে?

—হ্যাঁ।

—হামাদের পুজা হেবে—হামরা ইঠে একটা গানের যোগাড় নি করুম?

—গানের যোগাড় ?—বংশী আত্মমগ্নভাবে অল্প একটু হাসল : সেজন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না। সে ব্যবস্থা আমিই করব এখন। কোন ভয় নেই, গান হবেই।

—কুন্‌ঠে থেকে গান আনিবা হে তুমি ?—এবারে মহিন্দর আশ্চর্য হল।

—এখন বলব না। কিন্তু কিছু ভাবতে হবে না মহিন্দর, গান ঠিক এসে যাবে তোমাদের।

মহিন্দর আর পীড়াপীড়ি করল না। অনেক নিখিছে মাষ্টার, তার সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধা মহিন্দরের। মাষ্টার যা খুশি তাই করতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত বোধ করল। তবুও এখনো অনেক সমস্যা আছে— সেগুলোর ভালো করে একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না মহিন্দরের মন।

—হামাদের পূজা, আর সব গাঁয়ের কুটুম-কাটুমগুলাক তো নেওতা (নিমন্ত্রণ) দিবা হয়।

—তা দিয়ো।

—হাঁ, ওই সনাতনপুরের ভূষণকে কহিবা হেবে, রাসুকও খবর দিবা নাগিবে।

—দিয়ো খবর—বংশী নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলে, সকলকে ডেকে এনে পেট ভরে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিয়ো, খুশি হয়ে বাড়ি চলে যাবে।

আনন্দে ঝলমল করে উঠল মহিন্দরের মুখ : ই কথাটাই তো হামি কহিবা চাহোছিনু ! পূজা হেবে, জাত-কুটুমক ভালো করি তো খিলাবা নাগে। না তো ফের শালার ঘর বদনাম করি বেঢ়াবে। তো কয়টা পাঁঠা লাগিবে ?

—পাঁটা ?—বংশী আশ্চর্য হয়ে বললে, পাঁটা কী হবে ?

—ক্যানে, বলি দিবা নাগিবে না ?

—না, এ পূজোয় পাঁটা বলি দিতে নেই।

—তো ফের কিবা বলি দিবা হয় ? ম্যাড়া ?

—না, ম্যাড়াও নয়। কিছুই বলি দিতে হবে না।

—হায়রে বাপ, বলি দিবা হয় না? মহিন্দরের আনন্দোজ্জ্বল মুখে আশাহত বিস্ময় দেখা দিল: বলি না হয় তো ক্যামন পূজা?

—এই নিয়ম। দেবী বোষ্টুম কিনা, মাছমাংস খান না।

—নি খান?—মহিন্দর নিরাশাক্ষুব্ধ স্বরে বললে, তবে কী খিবে?

—কুমড়ো, কাঁচকলা, কপি, মূলো, আলু—সবরকম আনাজ। শুধু পেঁয়াজ নয়।

—হুঁ, বুঝিনু—খানিকক্ষণ মুখটাকে হাঁড়িপানা করে রইল মহিন্দর। পূজো সম্পর্কে তার যা স্বাভাবিক ধারণা সেটা স্পষ্ট। পাঁটা বলি হবে, মাংস রান্না হবে, চলবে মদের শ্রাদ্ধ। জ্ঞাতি-কুটুম নিয়ে বসা যাবে আসর জমিয়ে। কালীপূজো কিংবা বিষহরী উপলক্ষে এটাই চিরাচরিত রেওয়াজ। কিন্তু নিছক কচু কুমড়োর ঘ্যাঁট খাওয়াতে চায়, এটা কেমন পূজোর ব্যবস্থা মাষ্টারের!

ক্ষুণ্ণ স্বরে মহিন্দর বললে, তো কুটুমগুলাক্ কি খিলামু? মাংস না থাকিলে—

মহিন্দরের মনের অবস্থা বুঝলে বংশী। হেসে বললে, তা আলাদা করে তোমরা পাঁটা কেটে রান্না করতে পারো, খাওয়াতে পারো তোমার জাত-কুটুমদের।

—দোষ হেবে না?

—না।

মহিন্দর প্রসন্ন হল। বললে, তো হামি খাসীর যোগাড় করি।

—কর।

চলে যাচ্ছিল মহিন্দর, মুখ ফিরিয়ে বললে, গানের কথাটা ভুলিয়ো না হে মাষ্টার।

শান্ত স্বরে মাষ্টার বললে, না, না, সে ঠিক আছে, ভুলব না।

মহিন্দর চলে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিমার খড় বাধতে সুবল বর্মন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। আগ্রহ ব্যাকুল স্বরে বললে, এইঠে কি গানও হেবে?

—হাঁ, হবেই তো।

—কী গান?

—আলকাপ।

—বড় ভালো গান।—লুব্ধ কণ্ঠে সুবল বললে, শুনিবা আসিমু।

—নিশ্চয় আসবে। তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল।

অত্যন্ত খুসী হয়ে প্রতিমার কাঠামোতে খড় চাপিয়ে চলল সুবল, দেবীর প্রতি হঠাৎ একটা শ্রদ্ধা আর অনুরাগ জেগে উঠেছে তার মনে। আধ-ন্যাংটো ছেলেগুলো দড়ি আর খড় এগিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করেছে: এইঠে গান হেবে—গান হেবে—আলকাপের গান।

বংশী শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দূর প্রান্তরের দিকে। একি অতুল মজুমদারের অপমৃত্যু, না বিচিত্র একটা নবজন্মের সূচনা? আত্মহত্যা না আত্মবিকাশ?

পরিষ্কার জবাব নেই কিছু। শুধু মনের সামনে ভাসছে শান্তির মুখখানা। দুষ্টুমিভরা কালো চোখে শান্তি তাকিয়ে আছে তার দিকে: তুমি পারবে না, তুমি পারবে না।

প্রতিশ্রুতিটাই পালন করতে হবে। কী পারা সম্ভব আর কী নয়—সে কথা ভেবে আর লাভ নেই। এই অন্ধকূপের নির্বাসন—এই সাপের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে আর নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা—এইখানেই ঘটুক এর চিরসমাপ্তি। হয়তো নতুনের শুরু, নইলে শেষের পালা।

ছেলেগুলো তখনো ঘুরে ঘুরে নাচছে: গান হেবে, গান।

—গান তো হেবে কিন্তুক্—

কথাটা আরম্ভ করেই সন্দিগ্ধভাবে থেমে গেল ধলাই।

—থামিলে ক্যানে? কী কহিবা চাহো সাফ সাফ কহো।

—কহিমু?—ধলাই আবার ইতস্তত করতে লাগল।

কথাগুলো হচ্ছিল যোগেনের বাড়ির দাওয়াতে। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অল্প অল্প জ্যোৎস্না পড়েছে, সামনের নিম গাছটার পাতাগুলোর ভেতর থেকে আলো-আঁধারি এসে দোল খাচ্ছে দাওয়াতে। কোথায় যেন ভাঁট ফুল ফুটতে শুরু করেছে, বাতাসে আসছে তার সুগন্ধ। চাটাই পেতে বসেছে ওরা দুজন। অস্পষ্ট ছায়া মেশানো জ্যোৎস্নায় ওদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, শুধু ওদের মুখের বিড়ির আগুনদুটো ঝিকমিক করছে।

সন্ধ্যার পরে সুরেনের জুতো ঠোকা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এখানে গানের আসর বসায় যোগেন। প্রথম প্রথম তাদের চেঁচামেচিতে জেরবার হয়ে গিয়েছিল সুরেন, একদিন একটা ঠ্যাঙ্গা হাতে করে তেড়েও এসেছিল। কিন্তু ক্রমশ বিতৃষ্ণাটা কেটে গেছে, এখন সে দস্তুরমতো ভাইয়ের গুণ-মুগ্ধ। এমনকি এত খুশি হয়েছে যে, বলেছে: দু চারিটা জায়গাত্ যদি ভালো গাহিবা পারিস তো হামি নিজে তোক্ একটা কলের বাঁশি (ক্ল্যারিয়োনেট্) কিনি দিমু।

আর আড়ালে আড়ালে বসে শোনে যোগেনের মা, সুকণ্ঠ সুদর্শন ছেলের গর্বে—গৌরবে তার বুক ভরে থাকে। মাঝে মাঝে দরজা ফাঁক করে এসে চকিতের জন্যে উঁকি দেয় সুশীলা, যোগেনের দৃষ্টি এড়ায় না। রক্তের ভেতরে যেন চঞ্চলতা জেগে ওঠে, মধুবর্ষী কণ্ঠে আরো বেশি করে মধু ঢেলে দিয়ে যোগেন গান ধরে:

কইন্যা, ভ্রমর জিনি লয়ন তোমার
উড়ি উড়ি যায় হে,
হামার বুকের ভিতর ফুল ফুটিলে
তাহার মধু খায় হে—
হায় হায়—!

যোগেনের চোরা চাহনি একজনের চোখে ধরা পড়ে গেছে—সে ধলাই। কোনো মন্তব্য করে না, মাঝে মাঝে মুচকে মুচকে হাসে। আজকাল অবশ্য একটু কাজ বেড়েছে তার, যোগেন বাড়িতে থাকবে না নিশ্চিতভাবে জেনেও সে আসে যোগেনকে ডাকতে। যদি বাড়িতে না পায় তা হলে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বাইরের দাওয়াতে, গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে, যে অউদ রোদ উঠিছে—বাপ্‌রে বাপ্‌। একটু পানি না খিলাইলে হামার চলিবার জোর নাই।

শুধু পানি খায় না, পানও খায়। সুশীলাই মাঝে মাঝে পান এনে দেয় তাকে। কথাটা শুনে, বলা বাহুল্য, যোগেনের ভালো লাগেনি। একবার ভেবেছে, ধলাইকে নিষেধ করে দেবে যখন তখন তার বাড়িতে আসতে, মাকে বলবে সময়ে অসময়ে ওকে পান বা পানি কিছুই না দিতে। ধলাইয়ের অল্প অল্প গোঁফের নীচে মিটমিটে হাসিটাকে কেমন সন্দেহ করে যোগেন, কেমন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা জাগে। কিন্তু কিছুই বলা যায় না—কেমন সংকোচে বাধে। সুশীলার বাপ বিয়ের প্রস্তাবে এখনো স্পষ্ট করে রাজী হয়নি, অনেকগুলো টাকা চেয়ে বসেছে, এখনো গজর গজর করছে সুরেন। কাজেই যোগেন এখনো দাবীটাকে প্রকাশ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি সুশীলার ওপরে, যেটা চলেছে সেটা একেবারেই আড়ালে আবডালে এবং অনেকখানি সামাল্ দিয়ে। তা ছাড়া মাকেও কিছু বলা যায় না, যোগেনের বন্ধু বলে এবং ধলাইয়ের মুখ ভারী মিষ্টি বলে মাও তাকে একটু স্নেহই করে আজকাল। বলাও যায় না কিছু ধলাইকে, সওয়াও যায় না। আরো মুস্কিল যে, ধলাই গুণী লোক। ক্ল্যারিয়োনেট রীতিমতো ভালোই বাজায়, বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই সে বিষয়ে। তাকে বাদ দিলে নিশ্চিতভাবে দলের ক্ষতি হবে—নইলে যে কোনো একটা ছুতো নিয়ে অনেক আগেই লোকটাকে বিদায় করা যেত। মনের বিতৃষ্ণাটা মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে প্রকট হয়ে পড়ে, এবারেও পড়ল। ধলাইয়ের কথার ধরণে বিরক্ত হয়ে যোগেন বললে, কী কহিছ, সাফ সাফ বলি দাও।

পাতলা গোঁফে একটুখানি তা দিয়ে ধলাই বললে ইগ্‌লান কী পালা বানাইছ?

—ক্যানে, কী দোষ হৈল্?

—দোষ নি হৈল্?—ধলাই কেমন একটা দৃষ্টিতে যোগেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তুমার মতলবখানা কি হে?

—কুন্ মতলব?—উষ্ণভাবে যোগেন প্রশ্ন করল।

—ই ক্যামন আলকাপের গান, হামি বুঝিবা নি পাইনু।

—ক্যানে?

—ক্যানে?—ধলাই গোঁফে আবার তা দিলেঃ আলকাপের গান হামরা যিটা জানি সিটা তো কাপ। রং হেবে, তামাসা হেবে। মানুষ মজা করিবে, হাসিবে। কিন্তুক্ তুমার ই গান দেখি হামার ডর ধরোছে দাদা।

—ডরিবার কী আছে? যিটা সাঁচ্চা ওইটা কহিমু না? যোগেন আরও উষ্ণ হয়ে উঠল। বয়েসে বড় এবং সংসারের ব্যাপারে আরো কিছু অভিজ্ঞ ধলাই হাসল করুণার হাসি। বললে, ছোয়াপোয়ার মতন মন লিয়ে কাম করিবা হয় না। যিটা সাঁচ্চা, তুনিয়ায় ওইটাই কি কহিবার যো আছে? হায়, হায়, সিটা হইলে তো কাম একদম ফতে হই যিত। সাঁচ্চাটাক্ ঝুটা করিবা পারিলে—তেবে—হুঁঃ!

মস্ত একটা দমক দিয়ে ধলাই বক্তব্যটা শেষ করল।

যোগেন বিদ্রোহীর মতো বললে, হামি কাঁউক নি ডরাই। যিটাক সাঁচ্চা বলি জানিমু, উটাই কহিমু, সাঁচ্চাক মুই ঝুটা করিবা চাহি না।

—তো নি চাহো তো নি চাহিবেন। কিন্তুক্ মুস্কিল হেবে।

যোগেন ঘাড় বাঁকিয়ে বললে, মুস্কিল হেবে না।

—হায় হায় দাদা তুনিয়াক চিন্হ নাই।—যেন খুব ভালো করেই চিনেছে এমনি ভঙ্গিতে ধলাই বলে চললঃ দেখিয়ো, শেষে ফাটক যিবা নাগিবে।

—ক্যানে ফাটক ?

—ক্যানে ফাটক ? দারোগাক গাইল দিবে, মহাজনক গাইল দিবে, আর উয়ারা ছাড়ি কথা কহিবে তুমহাকে ? জাত সাপের ল্যাজ ধরি কচলাবা চাহোছ, ফের কাঁদিবা হেবে কহি দিনু।

যোগেন চুপ করে রইল। ধলাইকে সে পছন্দ করে না, মনের কাছে অস্পষ্ট, অথচ অতি নিশ্চিত একটা সন্দেহও তার সম্পর্কে আছে যোগেনের। লোকটার গোঁফ পাকানো আর সেই সঙ্গে অবহেলাভরা মৃদু মৃদু হাসির ভঙ্গিতে তার পিত্ত পর্যন্ত জ্বালা করে ওঠে, এটাও ঠিক। তবু মানতেই হবে, তার বলার মধ্যে অন্তত খানিকটা সত্য আছে। যে গান বংশী মাষ্টার তাকে দিয়ে লেখাচ্ছে তা লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে ভয়ে তার নিজের আঙুলই আড়ষ্ট হয়ে যায়। এ কী লিখতে যাচ্ছে সে, ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে কোন্ ভয়ঙ্কর সর্বনাশের নিশ্চিত শিখাতে !

অথচ নিজের মন তার যে গান আজ লিখতে চায় সে গানের সঙ্গে এর তো কোনো সম্পর্ক নেই। তার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত কল্পনা এখন কিশোরী সুশীলার চারদিকে একটা গন্ধমাতাল মৌমাছির মতো ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। এখন তার আকাশের দিকে তাকিয়ে সেটাকে আশ্চর্য রকমের ঘননীল আর সুন্দর বলে মনে হয়, এখন চাঁদ উঠলে বুকের ভেতরে জোয়ার জাগে। দিনে রাত্রে ঘুমে জাগরণে সে যেন অপরূপ একটা স্বপ্নের গভীরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে— ধলাইয়ের ক্ল্যারিয়োনেট্ বাঁশির মতো কী একটা মিষ্টি সুর সারাক্ষণ তার কানে যেন ঝঙ্কার দিয়ে যায়। কখনো আবছা আলোয়, কখনো অন্ধকারের আড়ালে সুশীলা তার কাছে আসে, একান্ত হয়ে মিশে যায় তার বুকের ভেতরে, তার চুলের রাশিতে আবিষ্ট মুখখানাকে ডুবিয়ে দেয় যোগেন— নিশি-পাওয়া অবশ মুহূর্তগুলো যেন ঝড়ের পাখায় উড়ে যেতে থাকে।

গান আসে, কত গান। শরতের শিউলি ডালে ঝাঁকুনি লেগেছে। ফুল ঝরে, রাশি রাশি ফুল। পরীরাজ্যের রাজকন্যা নেমে এসেছে তার

জীবনে, তাকে বাঁচিয়েছে একটা বিকৃত সন্ধ্যার বীভৎস স্মৃতির পীড়ন থেকে। সুশীলার কানে কানে তার প্রেমের কথা সুর হয়ে ঝরে পড়েছে :

তুমি আমার পরাণ হে কইন্যা,
সাপের মাথার মণি
তুমারে আগুলি রাখি দিবস রজনী।
দিনে তুমি দিনের আলো,
রাইতে ঘুচাও রাইতের কালো,
মরিব মরিব কন্যা—
তোমা হারাইমু যখনি—

কিন্তু বংশী মাস্টার। জ্বলন্ত সূর্যের মতো চোখ। শিশির উড়ে যায়—ছায়া পুড়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। অনেকবার যোগেন ভেবেছে, রাজী হবে না তার কথায়। চারণ হয়ে তার দরকার নেই, দরকার নেই তার সৈন্যদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার দায়িত্ব নিয়ে। সে ছোটই আছে, ছোটই থাকবে, ছোট একটা ঘর বাঁধবে তার মনের মানুষকে নিয়ে। কিন্তু—

কিন্তু সূর্যের দিকে তাকালে দৃষ্টি যেমন জ্বলে যেতে চায়, সে অবস্থা তারও হয়েছে। অনেক কথা বলতে চায়, বলতে পারে না। শুধু কানের কাছে বাজে : তোমাকে কাজ করতে হবে যোগেন—ঢের বড় কাজ। আর এ কাজের দায়িত্ব তুমি—একমাত্র তুমিই নিতে পারো।

আর কোন কথা সরে না যোগেনের। মূঢ়ের মতো আবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কাঁচপোকার আকর্ষণে তেলাপোকা নাকি কাঁচপোকা হয়ে যেতে চায়, তেমনি একটা কিছু হতে চাইছে নাকি যোগেনেরও? আশ্চর্য, সময় বুঝেই কি মাষ্টার আসে! গভীর রাত্রে—পৃথিবী যখন অদ্ভুত নির্জনতায় ঝিম ঝিম করে, চারদিকের তন্দ্রা-গভীর পরিবেষ্টনী নিজের ভেতরে একটা অপরূপ অনুভূতির সঞ্চার করে, যেন ভালোমন্দ বিচারের সময় থাকে না। যোগেনের মনে হয়, মাষ্টার তার দুটো জ্বালা-ভরা চোখ তার চোখের দিকে বিকীর্ণ করে

পাহাড়ী অজগরের মতো তাকে যেন আকর্ষণ করতে থাকে। বোবা প্রতিবাদ গলার কাছে এসে অব্যক্ত অসহায়তায় থেমে যায়। মাষ্টার বলে, "লেখো লেখো যোগেন, নতুন দিনের নতুন গান লেখো। তুমি কবি, তুমি শিল্পী, নতুন প্রভাতের বৈতালিক।" আর তখনি লেখে যোগেন।

কী লেখে?

যোগেনের ভাবনার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে স্বর মিলিয়ে কথা কয়ে উঠল ধলাই: তোমাকই হামি কহোছি। ইটা কেমন ধারা গান হে তুমার?

ধলাই গানটা পড়তে লাগল:

হায়রে হায়, দ্যাশের একি হাল,
কুনবা পাপে এমন করি
পুড়িলে কপাল।
মহাজনে রক্তচোষা
জমিদার ফোঁস্ মনসা
দারোগা সে লাটের ছাওয়াল—
মোদের হৈল কাল।
প্যাটের জ্বালায় মৈল মরদ
বউয়ের গলাত্ দড়ি,
চ্যাংড়া-প্যাংড়া বিকায় হাটত
দামে কানাকড়ি।
বাঁচার নামে বিষম জ্বালা,
সকল হৈল ঝালাপালা—
ওই তিনটা শালাক মারি খ্যাদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল—
আর কতকাল সহিবা ভাই
দ্যাশের পোড়া হাল।

গানটা পড়তে পড়তে চোখ কপালে উঠছিল ধলাইয়ের, পাগল হৈছ নাকি যে তুমি ?

যোগেন হয়তো কিছুই বলত না, হয়তো চুপ করে শুনে যেত, হয়তো বা সচেতন হওয়ার চেষ্টা করতো নিজের অপরাধের গুরুত্ব সম্পর্কে, হয়তো বা এই দুর্বল বিতৃষ্ণাভরা মুহূর্তে ফস করে বলে বসত, হামার কুনো দোষ নাই। ওই মাষ্টারটা হামাকে দিয়া ইসব লেখাছে। হামি লিখিবা চাহিনা, কিন্তু ক্যামন যাদু জানে মাষ্টার—হামাক য্যান বশ করি ফ্যালায়।

কিন্তু স্বীকারোক্তিটা করতে গিয়েও যোগেন চমকে উঠল।

হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে ধলাই। সরু গোঁফের নীচে ঠোঁটের কোণায় একটুখানি হাসি দেখা দিয়েছে তার। হাসির রেখাটা সূক্ষ্ম যে, খুব সজাগ চোখ না থাকলে চট করে নজরে পড়ত না। চোখের দৃষ্টি তার কেমন কুঞ্চিত হয়ে গেছে, চোখের তারাগুলো কোণের দিকে ঠেলে সরিয়ে এনে কী একটা চকিতের মধ্যে সে দেখে নিলে। দরজার দিকে পিঠ করে বসেছিল তার মুখোমুখি। লণ্ঠনের আলোয় ধলাইয়ের দৃষ্টির বিশেষত্বটা লক্ষ্য করেই সে সঙ্গে সঙ্গে তাকালো ধলাইয়ের পিছন দিকে। আর দেখল --

দেখল চট করে কে যেন ওখান থেকে সরে গেল তৎক্ষণাৎ। একটা ছায়া মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ঠিন ঠিন করে অস্পষ্টভাবে সাড়া দিয়ে গেল কাচের চুড়ি।

ওই ছায়া, ওই চুড়ির শব্দ যোগেনের একান্ত করেই চেনা। আজ বোঝা গেল, আজ যেন মনের কাছে এটা আর চাপা রইল না যে, চাঁপার বরণী যে কন্যা, যার কালো চোখ থেকে ভ্রমর উড়ে উড়ে পড়তে চায়, তার জীবনে যে সাপের মাথার মণি, সে একান্তভাবে তারই শুধু নয় ! সেখানে আজ প্রতিদ্বন্দ্বীর ছায়াপাত হয়েছে। আজ যোগেনের গানের চাইতেও আরো মাদক, আরো বিভ্রম-জাগানো আকর্ষণ এসেছে সুশীলার কাছে—সে ধলাইয়ের ক্ল্যারিয়োনেট। সে বাঁশির সুর—যে সুরে স্বয়ং শ্রীরাধিকাও তাঁর কুলমান যমুনার কালো জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন !

যা বলবে ভেবেছিল, যোগেন বলল না। বরং অত্যন্ত তীব্র কটুস্বরে বলে বসল: হামার গান—হামি যা ভালো মনে কইমু, সিটাই নিখিমু।

—তো নিখ। হারা তুমার সাথ বাজাবা পারিমু না। ঝুটামুটা ইসব করি ক্যানে জ্যাল্ খাটিবা যিবার কহো?

—না পারিবা চলি চাও—

হঠাৎ বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে উঠল যোগেন: ক্যাহো তুমাক থাকিবা কহোছে না। খালি মেজাজ আর মেজাজ দেখাছ। খুব বাঁশি বাজাবা শিখিছ—দেমাকে পা পড়োছে না মাটিত্।

যোগেনের উত্তেজনায় ধলাই যতটা আহত হল, তার চেয়ে বিস্ময় বোধ করল বেশি। হঠাৎ এরকম চেঁচিয়ে ওঠার মানেটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

যোগেন বললে, চলি যাও—অ্যাখনে চলি যাও।

সূক্ষ্ম গোঁফের নীচে সরু হাসির রেখাটা ফুটতে না ফুটতেই আবার নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল ধলাইয়ের।

—চলি যামু?

—হঁ, চলি যাও।

নীচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ধলাই বললে, ফের পাও ধরে সাধিলেও নি আসিমু।

—তুমার মতো ছোটলোকের পাও ধরি সাধিতে হামার বহি গেইছে।

—হামাক্ গালি দিলে? ধলাইয়ের স্বর হিংস্র শোনাল: গালি দিলে হামাক?

—হঁ, দিমু তো।

ধলাই বললে, ইটা পাকা কথা?

—হঁ, পাকা কথা।

—আচ্ছা, হামি চইমু—

ক্ল্যারিয়োনেট বাঁশিটাকে তুলে নিয়ে ধলাই উঠে পড়ল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, নিজের পাওত্ নিজে কুড়াল মাইল্লে। যা করিবা যিছ, দুদিন বাদ মাথায় হাত দিই কাঁদিবা হেবে—ইটা কহিনু তুমহাক।

—তখন তুমহাক ডাকিমু না হামি—তীব্র তিক্ত স্বরে প্রত্যুত্তর দিলে যোগেন।

—সিটাই তেবে মনে রাখিও—

ধলাই দাওয়া থেকে নেমে পড়ল। শেষ বার বললে, বাড়িত্ ডাকি আনি হামাক তুমি অপমান করিলেন। ইয়ার বদলা নিতে না পারি তো চামারের বাচ্ছা নহো হামি।

তারপরেই দ্রুত হাঁটতে স্বরু করল। যোগেন রক্তচক্ষে সেদিকে তাকিয়ে রইল, ইচ্ছে করল ঘরের মধ্যে উঠে গিয়ে প্রাণপণে সুশীলার গলাটাই সে হাতের মুঠিতে নিষ্পিষ্ট করে দেয়।

নয়

কিন্তু যোগেন সুশীলার গলাটা টিপে ধরবে কি, যা ঘটবার তা ঘটে গেছে দিন কয়েক আগেই।

একটা ছোট দলের সঙ্গে মাইল বারো দূরে বাঁশি বাজাতে গিয়েছিল ধলাই। শেষকালে পাওনা-গণ্ডা নিয়ে গণ্ডগোল লেগে গেল দলের চাঁই ঢোলওলার সঙ্গে।

ঢোলওলা বললে, ওই যা কহিনু পাঁচসিকা, অর বেশি একটা পাইসা বেশি না দিমু।

—আর তুমি লিবেক আড়াই টাকা করি?

—ক্যানে লিমুনা? হামার ঢোল, হামার দল। তুমি কুন্ তালুকদারের ব্যাটাটা আইলেন হে? তুহাক পাঁচসিকা দিলে তো ওই বাঁশিঅলাক্ও দিবার নাগে।

—ত তুমি অক্ পাঁচ পাইসা দাও—হামার বহি গেইছে। হামাক্ দুই টাকা দিবার নাগিবে।

—ক্যানে—ক্যানে? অ্যাতে সখ ক্যানে তুমার?

—সখ হেবেনা?—ধলাই চটে উঠল এতক্ষণে: এমন বাঁশি দেখিছ কুনে ঠৈ? দেখিছ বাপের বয়সে?

—বাপ তুলিয়ো না কহি দিনু—হ্যাঁ!—ষণ্ডা যোয়ান ঢোলওলা রুখে উঠল: ত দাঁতগুলান্ বেবাক উড়াই দিমু। ওঃ ভারী বাঁশি ছাখাবা আসোছেন! অমন বাঁশি হামি—

তারপরে ঢোলওলা যা বললে সেটা অনুচ্চার্য। ধলাই খানিকক্ষণ রক্ত চোখে তাকিয়ে দেখল তার দিকে, দেখল তার শরীরের ডুমো ডুমো পেশীগুলোকে। বুকভরা কালো লোম লোকটার, নাকের নীচে পুরু গোঁফ আর তার তলায় এক সারি দাঁত—যেন একটা বুনো ভালুকের চেহারা। সম্মুখ যুদ্ধ এখুনি হয়ে যেতে পারে, ও পক্ষ তৈরীও আছে বোঝা যায়, কিন্তু তার পরিণাম যে কী হবে সেটাও কল্পনা করে নিতে খুব বেশি অসুবিধে হলনা ধলাইয়ের।

তবু সম্মান রাখবার জন্যে দুর্বল কণ্ঠে বললে, খুব যে তেজ দেখাছ! মারিবা নাকি হে?

—মারিমু তো। বেশি চ্যাটাং ফ্যাটাং করিবেন তো হাড়গুলান্ লিয়ে বাড়িত্ ঘুরি যাবা না নাগে—হঁঃ!

—হামি নি বাজামু ভুমার দলে।

—নি বাজাবু তো নি বাজাবু!—কালো গোঁফের নীচে এবারে কোদালে কোদালে দাঁতগুলোকে একসার গাজরের মতো খিঁচোল ঢোলঅলা। হঠাৎ কতগুলো টাকা পয়সা ছুঁড়ে মারল ধলাইয়ের দিকে, নাকে হাত দিয়ে বসে পড়ল ধলাই।

—লে, তোর দুই দিনের পাওনা আড়াই টাকা। যা চলি যেইঠে তোর মন চাহে। তোর মত বাঁশিওলাক্—আবার একচোট অশ্রাব্য গাল। ধলাই আহত কুকুরের মতো উঠে দাঁড়াল, সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে কুড়িয়ে নিলে পয়সাগুলোকে, তারপর মনে মনে ঢোলঅলার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে ফিরে চলল।

ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছিল শেষ রাতে। এ দেশের 'মান্‌সিলা'র (মানুষগুলোর) রাতে চলা ফেরা করবার অভ্যাস আছে, তার ওপর শরীর গরম করে নিয়েছে এক পেট তাড়িতে, গোঁ গোঁ করে হেঁটে চলল ধলাই। ভয়ানক রকম বিগড়ে গেছে মেজাজ। দেশ-গাঁয়ের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে

যাচ্ছে ধলাই। এ দেশের বোকা-হাবা দেহাতীগুলো না বোঝে তার কেরামতি, না বোঝে তার বাঁশির বাহাদুরী। এই 'বরিন্দ' দেশের (বরেন্দ্রভূমি—রাঢ় মাটি) 'বারিন্দা' গুলোর চাল-চলনের কথা মনে পড়লেও পিত্তিশুদ্ধ রী রী করে জ্বলে ওঠে তার। তাল মানের বালাই নেই, ডুম্ ডুম্ করে ঢোল পেটে আর ট্যাং ট্যাং শব্দে খালি বাজাতে পারে ফাটা-কাঁসর। শানাইতে এক 'বুড়া হে, ক্যানে পরিলা বাঘের ছাল' ছাড়া আর কোন সুরই ওঠে না তাদের। মোটা মোটা চামড়ার জুতো তৈরী করা, পাঁঠা-ছাগল-মোষ যা পায় নির্বিচারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে খাওয়া আর গাঁক্ গাঁক করে অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া করা—এই হল রুইদাসদের, তার জ্ঞাত্-গোত্তরদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিচয়!

অথচ, কলকাতা। কত বড় শহর, কেমন সব ফিন্‌ফিনে মিহি মানুষ! তালুকদার বাড়ির ছোটবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল, কাটিয়ে এসেছিল পুরো একটা মাস। অতি উগ্র মদের তীব্র প্রভাবের মতো তার রক্তের মধ্যে কলকাতা উঁকি দেয়, থেকে থেকে সঞ্চারিত হয় বিভ্রান্ত বিস্রস্ত চৈতন্যের নেপথ্য থেকে। কেমন শির শির করে ওঠে শরীর, রক্ত লাফাতে থাকে রগের মধ্যে। কলকাতা।

দিনের বেলা বাড়ি গাড়ি মানুষ। রাত্রে ঝলমলে আলো। এত আলো—সমস্ত মনটাকে যেন আলো করে দেয়। কলকাতাতেই চা খেতে শিখল ধলাই। যেখানে খুশি বসে যাও, ইচ্ছে মতো চা খাও এক ঠোঙা তেলেভাজা দিয়ে, গরম ফুলুরী, নরম আলুর চপ। তিন আনা দিলেই বায়োস্কোপ, আর আট আনা খরচ করলে—

উস্‌স্—শব্দ করে লাল-টানার মত একটা আওয়াজ উঠল ধলাইয়ের জিভে আর দাঁতে। যেন স্বর্গ থেকে ছিটকে পড়েছে গলা ভর্তি পচা পাঁকের মধ্যে। এ আর সহ্য হয় না। আলোয় ভরা কলকাতার পাশে পাশে ধুলোয় আর বন-বাদাড়ে ভরা এই 'বরিন্দের' তুলনাটা যখনি মনের মধ্যে এসে দেখা দেয় তখনি যেন দুঃসহ একটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করে তার।

এ তার দেশ নয়। কোন মানুষেরই দেশ নয়। এখানকার বাসিন্দাদের মানুষ বললে কলকাতার লাগাম আঁটা ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াগুলো পর্যন্ত হো হো করে হেসে উঠবে বলে মনে হয় তার। এখানকার কন্টিকারী আর মরা ঘাসে ভরা মাঠের মধ্যে চরে বেড়ায় যে গোরু ছাগলগুলো, তাদের সঙ্গে কোনো পার্থক্যই নেই এদের। এই ঢোলঅলা লোকটাই তার নমুনা। তবে ও লোকটাকে গোরু-ছাগল বললে কম বলা হয়—আসলে বলা উচিত ষাঁড়।

এক যোগেন কবিওলার মধ্যে একটু ভদ্রতা আছে। গান-বাজনা কিছু শিখেছেও মনে হয়। কিন্তু বুদ্ধিটা বড় সুবিধের নয় যোগেনের। তার মতলবটা এখনো ঠিক ধরতে পারেনি ধলাই। বুদ্ধি-শুদ্ধি তো যথেষ্ট আছে, লেখেও নিতান্ত খারাপ নয়, কিন্তু লেখে কী? রাজ্যশুদ্ধ লোককে গাল দিচ্ছে, গাল দিচ্ছে পুলিসকে, গাল দিচ্ছে জোতদারকে। কিন্তু এতো ঠিক হচ্ছেনা, অকারণে খোঁচা দেওয়া হচ্ছে ঘুমন্ত বাঘের গায়ে। একটা কেলেঙ্কারী হবে শেষ পর্যন্ত—নাকের জলে চোখের জলে একাকার হতে হবে যোগেনকে।

যোগেনের কথা মনে পড়তেই ধলাইয়ের চমক ভাঙল। চোখ তুলে দেখে কালো আকাশে ফিকে হয়ে এসেছে রাত্রির নক্ষত্রগুলো, ছাই রঙ ধরেছে পুবদিকে। পাখির কিচির মিচির শুরু হয়েছে গাছে গাছে। পথ থেকে উঠেছে শিশির ভেজা ধুলোর গন্ধ, পায়ের পাতায় জড়িয়ে ধরছে ভিজে ভিজে ধুলো। ভোর হয়ে এসেছে। শেষ শীতের ভোর। মাঠের ওপর, গাছের মাথায় আবছা কুয়াশা। তাড়ির নেশাটা মরে গেছে এখন, শীত ধরেছে শরীরে। টপ করে এক ফোঁটা অত্যন্ত শীতল শিশির এসে পড়ল কপালে, ফোসকা পড়বার মত যন্ত্রণা বোধ হল একটা, কুঁকড়ে গেল গায়ের চামড়া।

একটু গরম হওয়া দরকার। অন্তত এক ছিলিম তামাক। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?

থেমে দাঁড়াল ধলাই। রোদ নেই, তবু বরাবরের অভ্যাস মতো চোখের ওপর হাতটা তুলে ধরে তাকালো সামনের দিকে। চেনা যাচ্ছে সামনের

গাঁ-টাকে। ওই তো জোড়-টিলা, বাঁ-দিকের টিলাটার মাথার ওপর ত্রিভঙ্গ ধরণে হেলে আছে যাজ্ঞে পোড়া তালগাছটা।

হাঁ—ওটাই সনাতনপুর।

আঃ—অনেকদিন পরে ভুলে যাওয়া চায়ের স্বাদটা মনে পড়ল। কলকাতার সেই মিষ্টিগরম চা, পাঞ্জাবী দোকানে চায়ের মালাই। সেই রকম এক কাপ চা যদি পেত এই শীতের আড়ষ্ট, ক্লান্ত, মন্থর সকালটাতে! ক্লান্তি জুড়িয়ে যেতো, গরম হয়ে যেতো শীতের বাতাসের ছোঁয়াতে শরীরের মধ্যে জমাট বেঁধেআসা হিমরক্ত! এখানে অবশ্য সে চা জুটবার আশা বৃথা। তবু যোগেনের বাড়িতে ছিলিমখানেক তামাক যদি মেলে সেও মন্দ হবে না। বিড়িতে আর শানাচ্ছে না তার, দরকার খানিকটা কড়া দা-কাটা তামাক।

চারদিকে শীতের কুয়াশা। তাই রাঙা আকাশ ফ্যাকাশে শাদা হয়ে আসছে, চাঁদটাকে দেখাচ্ছে মড়ার খুলির একটা ভাঙা চোক্‌লার মতো। পায়ে পায়ে লেপ্‌টে ধরেছে শিশিরে ভেজা ধুলো। আবার হাড় কাঁপানো একবিন্দু শিশির এসে পড়ল ধলাইয়ের মুখে। কড়া তামাকের সম্ভাবনায় গলাটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে, পথ কাটবার উদ্যমও বেড়েছে খানিকটা। জোরে পা চালিয়ে দিল ধলাই।

কলকাতা। বহুদূর থেকে তার লক্ষ লক্ষ আলোক চোখের মায়াবী সঙ্কেতে ডাক দিচ্ছে ধলাইকে। ছোট জাত বড় জাত নিয়ে মাথা ঘামায়না কেউ, ধুতি পরলেই বাবু। অনায়াসেই ধলাই নিজের জায়গা করে নিতে পারে সেখানে। সে গুণী। ওখানে সমজদার মানুষ আছে, তার গুণের কদর করবে।

জোড় টিলার কাছাকাছি পৌঁছুতে আরো অনেকটা ফর্সা হয়ে এল পৃথিবী। পাখির কিচিরমিচির বেড়ে উঠেছে চারদিকে। বাতাসে দূর থেকে মোরগের দরাজ গলা ভেসে এল।

সুরেনের বাড়ির পেছন দিয়ে রাস্তাটা। রাস্তার লাগাও একটা ডোবা,

তার ধার দিয়ে পৌঁছুতে হয় বাড়ির সদরে। ডোবার পাড়ির সেই ফালি পথটুকুতে পা দিতেই মুচিপাড়ার দুতিনটে কুকুর হাঁক দিয়ে উঠল সমস্বরে, আর ডোবার ঘাট থেকে যে মেয়েটি একটা মেটে-কলসী বগলে করে উঠে আসছিল সে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ধলাইয়ের মুখোমুখি।

বাঃ, বাঃ, খাসা। বড় ভালো জিনিস চোখে পড়ল সকালে, দিনটা কাটবে ভালো! চৌদ্দ-পনেরো বছরের দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটি, ভোরের প্রথম ছোঁয়াতে মুখখানা ঢলঢল করছে একেবারে। চোখ দুটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবু চোখের স্নিগ্ধ শঙ্কিত দৃষ্টিটাকে অনুমান করে নেওয়া চলে।

ধলাই বললে, মোক দেখি ডর খায়েন না। হামি চিন্হা মানুষ—ধলাই।

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। বোঝা গেল ধলাই আগে তাকে না দেখলেও সে তাকে দেখেছে। মৃদুস্বরে বললে, ধলাই বাঁশিওয়াল?

—হুঁ, হুঁ, বাঁশিওয়াল।—পরিচয় দিতে গিয়ে আত্মপ্রসাদ বোধ হল ধলাইয়ের। মনে হল এমন মিষ্টি করে নিজের নামটা সে কোনোদিন শোনেনি।

—এত ভোরে কুন্ঠে থাকি আইলেন?—আবার মৃদুস্বরে প্রশ্ন এল।

—ভিন্ গাঁওত্ গেইছিনু—

আরো কী বলতে যাচ্ছিল ধলাই, কিন্তু মুখে আটকে গেল কথাটা। তার চোখের দৃষ্টিটা ধ্বক্ করে জ্বলে উঠেছে তখন। কাঁখে জলভরা কলসী নিয়ে একদিকে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, গায়ের কাপড়টা সরে গেছে। আর সেই অবসরে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে বসেছে চন্দনের ফোঁটা পরানো সোনার পাত্রের মতো প্রথম যৌবনের একটি অপূর্ব পরিপূর্ণতা। ধলাইয়ের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করে মেয়েটি সন্ত্রস্ত হাতে কাপড়টা ঠিক করে নিলে, আড়ষ্টস্বরে বললে, সরি যান।

এতক্ষণে ধলাইয়ের খেয়াল হল সে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু

এর মধ্যেই শরীর গরম হয়ে উঠেছে তার, বিনা চা কিংবা তামাকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে হিমরক্ত।

ধলাই নেশাভরা গলায় বললে, একটু খাড়াই যাও ক্যানে। দুইটা কথা কহিলে ক্ষেতি কী হেবে? কী নাম তুমার?

—সুশীলা।

—সুশীলা? বড় মিঠা নাম। যোগেন কী হয় তুমার?

—ক্যাহোনা, কুটুম।

ধলাই দু পা এগিয়ে এল: হামার বাঁশি শুনিছ?

—হুঁ।

—কলিকাতায় গেইছ কুনোদিন?

—না।

ধলাই বললে, তাজ্জব জায়গা হে ই কলিকাতা। ক্যাতে মটর গাড়ি, ক্যাতে বাড়ি, ক্যাতে আলো। কলিকাতা যিতে তুম্‌হার মন চাহেনা?

সুশীলা বললে, চাহে তো। ফের যামু কার সাথ?

—হামি লি যামু। যিবা?

সুশীলা বললে, ধ্যাৎ।

ধলাই নেশাগ্রস্তের মতো বললে, হামি লি যামু। বিহা করিমু তুম্‌হাক।

—ধ্যাৎ। হামার বিহা হেবে যোগেনের সাথে।

ধলাই বললে, যোগেনের সাথ? উহাক্ বিহা করি কী ফায়দা হেবে তুমহার? উ তো ভাইর ঘাড়ত্ চড়ি বসি খাছে, খ্যাদাই দিলে কী হেবে দশাটা? হামার সাথে চল। শাড়ী দিমু, সোনা দিমু, পাকা বাড়িত থাকিবা দিমু—

এক মুহূর্ত ধলাইয়ের দিকে তাকালো সুশীলা। ভোরের আলোয় চমৎকার লাগছে লোকটাকে। আড়াল থেকে বাঁশিও শুনেছে তার। যোগেন সম্বন্ধে একটু মোহ আছে বটে, কিন্তু দূরের মানুষটিকে এই মুহূর্তে আরো আশ্চর্য,

আরো রহস্যময় লাগছে। সুশীলার মনের ভেতরে যেন কেমন ছলছলিয়ে উঠল। পুরুষের আলিঙ্গন পেয়ে যেমন যৌবন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে সমস্ত চেতনায়, তার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছে মুচিদের সহজ উচ্ছৃঙ্খল রক্ত। বড় চেনা হয়ে গেছে যোগেন, বড় বেশি স্বাভাবিক হয়ে গেছে তার কাছে। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া অত্যন্ত সাবধানী, অত্যন্ত হিসেবী। সময় আর সুযোগমতো মাঝে মাঝে সুশীলাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় বটে কিন্তু তাতে আশ মেটেনা সুশীলার। একটা তীব্র অস্বস্তিতে গায়ের মধ্যে যেন জ্বালা ধরে যায় তার—আরো কিছু চায় সে, আরো অনেকটা যেন প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা করে শরীরের প্রতিটি রোমকূপে, প্রতিটি রক্ত-মাংসের কণায় কণায়। পিষে যেতে ইচ্ছে করে তার, ইচ্ছে করে যেন ভেঙেচুরে তচনচ হয়ে যেতে। কিন্তু তার সে প্রত্যাশা পূর্ণ করেনা যোগেন। সে ভীরু, সে সাবধানী। আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু নেভাতে জানেনা। প্রেম আছে, কিন্তু দাবী নেই তার।

ধলাই আবার বললে, কী ভাবিছ সোনার বরনী কন্যা, কথা কহিছ না যে?

—ধ্যাৎ।

—ক্যানে ধ্যাৎ ধ্যাৎ করোছ! তুম্হাক দেখি হামার মন মজি গেইছে কইন্যা। হামার সাথ কলিকাতায় চল, রাজার হালত্ রাখিমু তুমহাক্—এই কহি দিনু।

—পথ ছাড়ি দেন।

—দিমু। তার আগে কহ তুম্হার সাথ ফের দেখা হেবে?

—হেবে।

—কাইল?

এতক্ষণে চোখের একটা ভঙ্গি করলে সুশীলা, কথার চাইতেও সে দৃষ্টির ভেতরে তার বক্তব্য ঢের বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল যেন। বললে, পথ ছাড়ি দেন।

—দিমু, কিন্তু—

তার আগেই ধলাইয়ের পাশ দিয়ে চট করে সরে গেল সুশীলা। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক একটুখানি স্পর্শও যেন দিয়ে গেল তাকে। পরক্ষণেই ঝাঁপ ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির মধ্যে।

একমুহূর্ত মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল ধলাই। চিকচিক করে উঠল বাসনা-লুব্ধ চোখদুটো, মৃদু হাসি ফুটে উঠল সরু গোঁফের নীচে বিচক্ষণ ঠোঁট দুটোতে। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে জোর গলায় হাঁক দিলে, হে যোগেন, জাগিলা নাকি হে যোগেন?

পূবের আকাশটা তখন আস্তে আস্তে রাঙা হয়ে উঠছে।

কিন্তু উঠোনে বসে আর ধানসেদ্ধ করতে মন চায়না সুশীলার।

ধলাইয়ের কথাটা কানের কাছে ভাসছে ক্রমাগত।—কলিকাতায় লি যামু, রাণীর হালে রাখিমু—

কলকাতা! সে আশ্চর্য দেশটার কথা কতজনের মুখেই যে শুনেছে! শুনেছে সে কলকাতা না দেখলে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যায় মানুষের। এক কলকাতায় যাওয়ার আকর্ষণই ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে যেতে পারে লোককে। তাদের গাঁয়ের হীরালাল সেই যে কলকাতায় পালিয়ে গেল মা-বাপ-বৌকে ফেলে, আর ফিরলই না। আশ্চর্য দেশ কলকাতা তাকে ফিরতে দিল না।

কিন্তু কারণটা কি শুধুই তাই?

বাঁশের হাতা দিয়ে হাঁড়ির ধানগুলো নাড়তে নাড়তে সুশীলার বুকের ভেতরটা কেমন তোলাপাড়া করতে লাগল। কারণটা শুধু তাই নয়। পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধলাইয়ের চোখে সে যা দেখতে পেল যোগেনের

চোখে তা নেই কেন? শান্ত ভীরু যোগেন। তার দৃষ্টিতে কেমন ঘোর লাগা। সুশীলাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে চায়, যেন স্নেহভরে দিতে চায় ঘুম পাড়িয়ে। কিন্তু ঘুমুতে কি চায় সুশীলা?

না। শরীরের রক্ত তার মাতামাতি করতে থাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কী ছিটকে ছিটকে বেড়ায় আগুনের মতো। দুবছর আগে একবার বিছেয় কামড়েছিল তাকে, মনে হয় তার সেই তীব্র ভয়ঙ্কর জ্বালাটা যেন আবার ফিরে এসেছে এতদিন পরে। সজোরে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে সুশীলা।

এক একদিন রাত্রে ঘুমুতে পারেনা। ছটফট করে শুয়ে শুয়ে, অস্থিরতায় কী করবে ভেবে পায়না যেন। তারপর যখন যোগেনের মার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে ঘন হয়ে, ঘুমের মধ্যে তার কথা বলা শুরু হয়ে যায়, তখন অসীম অস্বস্তিতে সে উঠে বসে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে যোগেনের ঘরে, তার বুকের মধ্যে নিঃশেষে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

—হামি মরি গেলাম, হামি মরি গেলাম—

কিন্তু ছুটে যেমন যেতে পারেনা সুশীলা, তেমনি বলতেও পারেনা। শুধু বুকের মধ্যে যেন কাঞ্চননদীর বান আসে, ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ নিজের কানেই শুনতে পায় যেন। উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায় যোগেনের ঘরের বেড়ার আড়ালে।

রেড়ীর তেলের আলোয় উবু হয়ে বসে লিখছে যোগেন। জ্বলজ্বল করছে তার চোখ, অদ্ভুত একটা দৃষ্টি সে চোখে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারেনা সুশীলা, বুঝতে পারেনা কিসের জন্যে এমন করে অতন্দ্র রাত কাটিয়ে যাচ্ছে যোগেন, কিসের পাগলামিতে সে কাগজের ওপর হরফের পর হরফের জাল বুনে চলেছে।

মনে হয় একটা আলাদা মানুষ। এ মানুষ তার জানা নেই, তার চিন্তা দিয়ে একে ছোঁয়া যাবেনা। খস্ খস্ করে লিখে যাচ্ছে, কখনো বা দোয়াতে

কলমটাকে ডুবিয়ে রেখে হাতের আঙুলগুলোকে কামড়াচ্ছে হিংস্র আর ক্ষিপ্তভাবে। যেন নিজের মধ্যে অনবরত কী একটা ভাঙচুর করছে সে. কিছুতে তার স্বস্তি নেই, কোনোমতেই যেন সে তৃপ্তি পাচ্ছে না।

এ কোন্ মানুষ? এ কোন্ জাতের? এক একটা নিভৃত অবসরে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে যে তার চুলে কপালে আঙুল বুলিয়ে দেয় এ সেও নয়। এর সঙ্গে সুশীলার পরিচয় নেই—এও সুশীলাকে চেনেনা। এর কাছে গিয়ে সে কি বলতে পারে, আমি ঘুমোতে পারছি না, আমাকে তোমার বুকের ভেতরে আশ্রয় দাও? বাঁচাও আমাকে, রক্ষা করো এই অসহ্য দুর্বোধ যন্ত্রণা থেকে?

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছটফট করে সুশীলা। চলে যেতে চায়, চলে যেতে পারে না। কিসে যেন আঁকড়ে ধরেছে তাকে, তার পা দুটো মাটির ভেতরে ঢুকে গিয়ে শক্ত আর অনড় হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়েছে যোগেন, পায়চারী করছে ঘরময়। তারপর গুন গুন করে গান ধরেছে:

ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ফসল ভরা
হামার সোনার মাটি,
সেই ফসলের হতাশ লিয়ে
মিছাই মরি খাটি!
গায়ের লোহু হৈল পানি,
ভুখার জ্বালায় যায় পরানি,
আর ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলিয়া
তুমি খাছ ক্ষীরের বাটি,
হায়রে বরাত, হায়রে—

নড়ে সরে যেতে চায় সুশীলা। হাতের চুড়িতে শব্দ হয়, খস খস আওয়াজ ওঠে শাড়ীতে। তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে যোগেন বলে ওঠে: কে?

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ধ্বক্ করে ওঠে সুশীলার। নির্জন নিঃশব্দ রাত্রি। সমস্ত বাড়ি ঘুমুচ্ছে, কেউ জেগে নেই কোথাও। রাত্রির এই অবকাশে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, আবির্ভাব ঘটতে পারে যে কোনো একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার। যোগেনের মন কি উদ্বেল হয়ে উঠতে পারেনা মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্যও ?

আবার তীক্ষ্ণ স্বরে সাড়া আসে : কে ?

—ক্যাহো না, হামি। হামি সুশীলা।

—সুশীলা—ওঃ !—একটা নিরুত্তাপ শান্তি ভেসে আসে যোগেনের স্বরে : অ্যাতে 'আইতে' (রাইতে) জাগি জাগি কী করোছ ?

—যাও—ঘুমাও।

যাও—ঘুমাও ! সুশীলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে একসঙ্গে। যেন পাথরের মতো মানুষ—শরীরে গরম রক্ত নেই একবিন্দুও। অথচ এই রকম রাত্রি—এরকম নির্জনে দুটি জোয়ান ছেলেমেয়ের দেখা, তার পরেকার বহু আশ্চর্য মন মাতানো গল্পই তো শুনেছে সুশীলা। শুনতে শুনতে মুখ চোখ দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে যেন রক্তের ঝাঁঝ বেরিয়ে এসেছে, মনে হয়েছে—

আর যোগেন ?

যাও—ঘুমাও ! হিংস্রভাবে সুশীলা ফিরে এসেছে ঘরে।···

···হঠাৎ কেমন একটা গন্ধ—ধান ধরে এল বোধ হয়। সুশীলা অপ্রতিভ ভাবে আবার হাতা দিয়ে নাড়তে লাগল। আর ধলাইয়ের দৃষ্টি ! ভোরের আবছা আলোতেও সে তার নিজের কথা বলে দিয়েছে। সুশীলা বুঝতে পেরেছে তাকে। অত্যন্ত পিপাসার সময় যেন এক ঘটি ঠাণ্ডা জলের স্নিগ্ধ মধুর সম্ভাবনা বয়ে এনেছে ধলাই।

—কলিকাতায় লি যামু, রাণীর হাল্‌ত রাখিমু—

মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় যোগেন—কিন্তু এ তো তা নয়। আলকাপওলা রাত জেগে শুধু গানই লিখতে জানে, আর কিছু বোঝবার ক্ষমতা নেই তার।

কিন্তু বাঁশিওলা জানে। তার দৃষ্টি তার কথা সমস্ত মনের মধ্যে বারে বারে ওঠাপড়া করছে। সে জানে সুশীলা কী চায়, সুশীলা জানে তাকে তা দিতে পারবে বাঁশিওয়ালা।

তা ছাড়া কলকাতা—কত দূরের দেশ! কত দেশ, কত নদী, কত জঙ্গল পার হয়ে সে কলকাতা! সেই বহুদূরের হাতছানি সুশীলার কানে এসে পৌছয়। বহুবার শোনা বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুর মনের কাছে নতুন করে বাজতে থাকে।

নতুন করে বাজল বইকি। বাজল পরের দিন ভোর বেলায়।

তখনো ভোর হয়নি, মেটে মেটে কাকজ্যোৎস্না চারদিকে। হালকা হয়ে আসা ঘুম চকিতে টুকরো টুকরো হয়ে যেন ছিঁড়ে গেল সুশীলার। আকুল কান্নার মতো মৃদু বাঁশির শব্দ। শেষ রাত্রির শান্ত হাওয়ায়, ভিজে মাটি আর শিশিরের গন্ধের সঙ্গে মিশে সে বাঁশির সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে। সে সুরে ধলাইয়ের উজ্জ্বল তীব্র চোখের দৃষ্টি জড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে ছড়িয়ে আছে বহুদূর কলকাতার মোহময় আহ্বান।

যোগেনের মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একবার তার দিকে তাকিয়েই নিঃশব্দে উঠে পড়ল সুশীলা, অন্ধকারের মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। এমন অনেক রাত্রিই তার ব্যর্থ করে দিয়েছে যোগেন, কিন্তু এই সকালটাকে সে নষ্ট হতে দেবেনা।

কিন্তু অত কথা কী করে জানবে যোগেন আল্‌কাপওয়ালা? মহকুমা শহরে মেয়েদের যে রূপ দেখে সে ভয় পেয়েছে, যে রূপের কথা ভাবলেও তার শরীর আঁতকে ওঠে, তারও যে একটা সহজ তাগিদ আছে সে তা জানেনা। তার ভুলের মিথ্যে বোঝা বইতে কেন রাজী হবে সুশীলা, কেন রাজী হবে তার স্বপ্ন লোকের সোনার কন্যা? রক্ত মাংসকে ভুলে গিয়ে গানের রঙীন্ ফানুষ তৈরী করতে থাকুক যোগেন, কিন্তু ধলাই হিসেব বোঝে, মাটির কাছে তার যেটুকু ন্যায্য পাওনা, তা সে আদায় করে নিতে জানে কড়ায় গণ্ডায়।

—দশ—

বংশী মাষ্টার চলে যাওয়ার পরে খানিকটা হাসাহাসি করেছিল চট্টরাজ। এই শীতের সকালেও পায়ে তেল ডলতে ডলতে ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছিল মহিন্দর আর চট্টরাজের ধারালো ধারালো কথাগুলো ছুরির ফলার মতো এসে বিঁধছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু জবাব দেবার জো নেই—সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোবার মতো দুঃসাহস নেই তার।

সামনে 'কাঁদড়ের' কাদা মাখা এক হাঁটু জল। তিনঘর ডোম বাস করে গ্রামের প্রান্তে, তাদেরই গোটা কয়েক শূয়োর হুটোপুটি করছিল কাঁদড়ে। সেদিকে তাকিয়ে চট্টরাজ বললে, দেখেছিস মহিন্দর?

—দেখিছু।

—তোরা ওই শূয়োরগুলোর মতো—কাদাই ঘেঁটে মরবি চিরটাকাল।

—হঁ—গোঁজ হয়ে জবাব দিলে মহিন্দর।

—অ, বাবুর রাগ হয়েছে বুঝি? মানে ঘা লেগেছে মানী মানুষের?

—হামাদের ফের মান কুন্‌ঠে বাবু? হামরা মুচি—ছোট নোক—

—বাঃ, বাঃ, বিনয়ের একেবারে অবতার—অ্যাঁ?—টানের চোটে হুঁকোটাকে প্রায় কাটিয়ে ফেলবার উপক্রম করে চট্টরাজ বললে, আবার আত্মদর্শনও হচ্ছে দেখি। বেশ, ভালো ভালো। তা এই মাষ্টারটি জুটল কী করে?

—ক্যামন করি কহিমু বাবু? কুন্‌ঠে থাকি আসোছে ওই জানে।

—হুঁ, মাষ্টারই বটে! আরে ব্যাটা একে জাতে নাপিত, তারপর 'মেঘনাদ বধ'ই পড়েনি! লেখাপড়া শিখতে হলে আগে 'মেঘনাদ বধ' পড়তে হয়—হ্যাঁ, বই বটে একখানা! কী ভাষা, আর কী তার জোর! হাতের হুঁকোটা মাথার ওপর জয়োদ্ধত পতাকার মতো তুলে ধরে চট্টরাজ আবার ভৈরব স্বরে শুরু করলে:

"অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে,
লড়িল মস্তকে জটা, ভীষণ গর্জনে
গর্জিল ভুজঙ্গ বৃন্দ। ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বকে
জ্বলিল অনল ভালে। ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিল ত্রিপথগা—"

বলি, বুঝলি কিছু?

—অ্যাঁ?

বক্তৃতার দাপটে পা টেপা বন্ধ হয়ে গেছে মহিন্দরের, নির্বাক বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে চট্টরাজের অপরূপ মুখ ভঙ্গির দিকে। অপূর্ব! একটা দেখবার জিনিসই বটে। কোথায় লাগে গাজনের সং? একবার পুতুল নাচ দেখেছিল মহিন্দর—রাম-রাবণের যুদ্ধ; তারই ভস্মলোচনের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে নায়েবমশাই আর আওয়াজ যা তুলছে তা শুনে মনে হয় যেন হামলা করছে একটা এঁড়ে বাছুর।

—বলি বুঝলি কিছু?

মহিন্দর সভয়ে বললে, আইজ্ঞা না।

—তবু এসব উট্‌কেল-বিট্‌কেল সখ চেগেছে, কেমন? পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার জন্যে। বলি ওরে ও মুচির পো, সেই হাতী আর কোলা ব্যাঙের গল্পটা জানা আছে?

—আইজ্ঞা না।

—ওরে শোন্। শুনে জ্ঞানলাভ কর। হাতী যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, তাই

ডোবার কোলা ব্যাংয়েরও সাধ হল হাতীর মত মোটা হবে। সেই আনন্দে সে তো পেট ফোলাতে শুরু করল। তারপর কী হল জানিস?

—ত মোটা হই গেইল্ নাকি? —ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলে মহিন্দর।

—হঁঃ, মোটা হই গেইল্?—দাঁত খিঁচিয়ে উঠল চট্টরাজঃ ওরে ব্যাটা গাড়োলেরা, ও রকম মোটা তোরাও হবি মনে হচ্ছে। ফুলতে ফুলতে শেষে ফট্টাস্—ফেটে একদম চৌ-চাকলা!

—ফাটি গেইল্?

—হঁঃ, গেইল্ তো।—তেম্নি মুখভঙ্গি করে চট্টরাজ বললে, চাঁদ, তোমরাও একদিন যাবে। যা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ তোমাদের আর বেশি দেরী আছে বলে মনে হচ্ছে না আমার। সুখে থাকতে ভূতের কিল পড়ছে পিঠে. যেদিন সত্যিকারের কিল পড়বে সেদিন ও ভূত ছেড়ে যাবে। ধম্মো এখনো আছে, জমিদারের জমিদারী লাটে চড়েনি আজ পর্যন্ত। হতভাগা গো-ভাগারা, ওসব বদ্‌বুদ্ধি এখনো ছেড়ে দে—ওই অলক্ষুণে মাস্টারটা তোদের বরাতে ধূমকেতু হয়ে এসেছে—বুঝলি?

—হঁ বুঝিনু তো।

চট্টরাজের মনে হল ঢের বোঝানো হয়েছে, এতেই শিক্ষা হয়ে যাবে মুচিদের। কিন্তু সন্ধ্যের পর সেরটাক খাসির মাংস আর সেরখানিক ক্ষীর খেয়ে নরম বিছানায় শুয়ে পড়বার পরেও ঘুম এল না। পেট গরম হয়ে উঠেছে, গরম হয়েছে মাথাটাও। চট্টরাজ উঠে বসে এক ছিলিম তামাক ধরালেন নিজের হাতেই।

কাঁদড়ের ধারে শেয়াল ডাকছে, বাইরে থেকে আসছে ঝিঁঝিঁর কলধ্বনি। একা ঘরে কেমন ভয় ভয় করে উঠল শরীর। না—এত সহজেই ভোলা যায়না ব্যাপারটাকে—ধামা চাপা দিয়ে দেওয়া যায়না। এসব বড় খারাপ লক্ষণ। শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম্। এ চোখ মেলবার সূচনা, এমনি করে আস্তে আস্তে চোখ দুটো যদি সম্পূর্ণ খুলে বসে তাহলে হালে আর পানি

পাওয়া যাবে না শেষ পর্যন্ত। আজ যেটাকে কেঁচো মনে করে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে সেটা যে ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা কেউটের বাচ্চা নয় এমন প্রতিশ্রুতিই বা জোর গলায় দিতে পারে কে?

অভিজ্ঞতা অল্পে অল্পে হচ্ছে বই কি। দু হরফ পড়তে শিখেছে কি ব্যাটাদের মাতব্বরীর যন্ত্রণায় টেঁকা দায়। শহর থেকে আনিয়েছে চার পয়সা দামের নতুন প্রজাস্বত্ব আইনের বই, কিছু বলতে গেলেই গড়গড় করে আউড়ে দেবে:

"চক্রবৃদ্ধি স্থদ দিব না
বসত-বাটি নীলাম হবে না,
বিশ বছরের কিস্তিবন্দী—"
নায়েব মশাই, এই হইল্ নতুন আইন।

নতুন আইনই বটে। সবই নতুন—সারা ছুনিয়াটাই প্রায় নতুন হয়ে যাচ্ছে আজকাল। আগে দাখিলার চেকে পাঁচ টাকা লিখে দিয়ে সাত টাকা আদায় করা প্রায় স্বাভাবিক নিয়ম ছিল, পাওনা-গণ্ডা যে কত দিকে ছিল তার প্রায় হিসেবই নেই। আরে বেশিদূর যেতে হবে কেন, একটা কাছারীতে গেলে না হোক পনেরো ষোলটা টাকা নজর তো মিলতই। এখন নজর দূরস্থান—একটা পাঁঠা, ছুটো লাউ বড় জোর। তাও দিতে কতরকমের গাঁইগুঁই—যেন ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে ব্যাটাদের।

আর এর জন্যে দায়ী এই ইস্কুলগুলো। জেলা বোর্ডের খেয়ে দেয়ে আর কাজ জুটল না, এই রকম কতগুলো আজে বাজে ল্যাঠার স্থষ্টি করে বসে আছে। মুখ ফুটিয়েছে, চোখও ফুটিয়েছে। প্রতিবাদ যেমন করে, তেমনি মাঝে মাঝে রসিকতাও করে: ও তশিলদার মশায়, ইটা কী হইল্? হামি দিনু পাঁচ টাকা, তুমি সাড়ে তিনটাকা নিখিলেন? ভুল হই গেইছে, ঠিক করি নেখেন।

বলে মিটি মিটি হাসে। কিন্তু সে হাসি বিছুটির ঘায়ের চাইতেও মারাত্মক,

তার চেয়েও অসহ্য জ্বালা। একটু সামান্য রসিকতা, কিন্তু তার ধার যেন কেটে কেটে বসতে থাকে বুকের মধ্যে। বেশ বোঝা যায় উপরি-পাওনার যুগ শেষ হয়ে গেছে, রস মরে গেছে অমন সোনার চাকরীর।

কোত্থেকে এই মাষ্টারগুলোও যে আমদানী হচ্ছে ভগবান জানেন। এই বংশী পরামাণিকের হাল-চাল দেখে তো দস্তুরমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে মন। আর একবার নাড়াচাড়া দিয়ে দেখতে হচ্ছে তাকে। কী উদ্দেশ্যে অমন গড়গড় করে অতগুলো মিথ্যে কথা আউড়ে গেল, আসল মতলবটা কী তার ?

কোনোরকম দাগী আসামী-টাসামী নয় তো ?

হুঁ, আশ্চর্য নয়। চট্টরাজের কপালে কতগুলো কালো কালো রেখা ফুটে উঠল। এই বয়েসে অনেক দেখল সে, আর যাই হোক মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাটাও ঘটেছে প্রচুর। কোথায় একটা গণ্ডগোল আছে বংশী পরামাণিকের মধ্যে। নাঃ কালই একবার—

খুট্-খুট্—

ইঁদুরের আওয়াজের মত একটা আওয়াজ এল দরজার কড়ায়।

—কে ?

—চাঁপা।

ডোমপাড়ার অনুগৃহীতা মেয়েটা। দিনের বেলা অবশ্য ও পাড়ার ধার দিয়েও হাঁটেন না চট্টরাজ—যা নোংরা ! আর তা ছাড়া শূয়োর পোড়াবার গন্ধটা নাকে এলে যেন উঠে আসতে চায় অন্নপ্রাশনের অন্ন। কিন্তু রাত্রিতে যখন ডোমপাড়াটা কালো অন্ধকারে মিলিয়ে যায় আর চট্টরাজের গলার শাদা পৈতেটাকেও স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়না, তখনকার ব্যাপার একেবারে আলাদা। এই বিদেশে-বিভুঁয়ে রাত্রিতে একজন কাছে না থাকলে একটু দেখাশোনাই বা করে কে, কেই বা একটুখানি সেবাযত্ন করতে পারে তাঁকে ?

উঠে দোর খুলে দিলেন চট্টরাজ।

কিন্তু রাত্রে যা স্থির করে রেখেছিলেন পরের দিন তা হয়ে উঠল না। সকালে উঠতে না উঠতেই একটা বরকন্দাজ খবর নিয়ে এল ভগ্নদূতের মতো। আলীচাকলায় গণ্ডগোল বেধেছে একটা বেয়াড়া প্রজাকে নিয়ে। ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। আদালতের পেয়াদা গিয়েছিল ঢোল-সহরত নিয়ে, কিন্তু গ্রামের লোকে দল বেঁধে এমন তাড়া করেছে তাদের যে তারা পালাতে পথ পায়নি। ঢুলীরও পাত্তা নেই। কাঁইমাই এমন ছুট মারল যে তাকে আর ফেরানো গেলনা।

—নাঃ, আর পারা গেল না। যত সব ইয়ে—

চট্টরাজ টাট্টুতে চেপে বসলেন।

আলীচাক্‌লায় পৌঁছেও তাঁর ল্যাঠা কাটেনা। সরকারী লোক তো আছেই, পঞ্চাশ জন লাঠি-সোটাধারী লোকও জুটেছে, দরকার হলে খুন-খারাপী করবে তারা, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। সবই আছে, কিন্তু ঢুলী নেই। কোঁৎকা দেখে সেই যে দৌড় দিয়েছে, বোধ হয় মাইল পনেরো রাস্তা সে পার হয়ে গেছে এতক্ষণ।

চটে আগুন হয়ে গেছে চট্টরাজ।

—যা, যেখান থেকে পারিস ঢুলী যোগাড় করে আন। ঢোল-সহরত না হলে সাব্যস্ত হবে কেমন করে!

—আইল্গা ও ঢুলী তো ডর খাই পালালে, ফের কঁ্যাহোক্ তো—

—নইলে যেতে হবে চামারহাটি কিংবা সনাতনপুর—চট্টরাজ হুঙ্কার ছাড়লেন : এটুকুও কাজ করতে পারোনা, খালি খাও-দাও আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, কেমন? যা, দৌড়ো সব। ঢোল না পাওয়া যায় তো তোদের পিঠের চামড়া দিয়েই ডুগডুগি বাজাব আমি—মনে থাকে যেন।

কিন্তু চামারহাটি পর্যন্ত আর ছুটতে হলনা, তার আগেই ঢুলী জুটে গেল একজন।

লোকটা পড়েছিল মাইলখানেক দূরে রাস্তার পাশে একটা বটতলায়।

মাথার কাছে একটা ঢোল, পাশে একটা মদের বোতল, আর মুখের সামনে ভনভনে মাছি। পুরোপুরি নেশা করে সে পরম শান্তিতে যোগনিদ্রা উপভোগ করছিল। পাইক শিবু তাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, এই, উঠ্, উঠ্!

লোকটা উঠলনা, সাড়াও দিলনা।

শিবু হাতের লাঠি দিয়ে আবার শক্ত করে একটা খোঁচা দিলে তার পাঁজরে। এবারে লোকটা আড়ষ্ট আরক্ত চোখ মেলে তাকালো, তারপর বিরক্তিভরে কী একটা বিড় বিড় করে পাশ ফিরল।

শিবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হল। হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে তুলে ফেলল, তারপর ঢোলটা কাঁধে ফেলে তেমনি হুড়মুড় করে টানতে টানতে তাকে একেবারে হুজুরে এনে হাজির করে দিলে।

ততক্ষণে নেশা কেটে গেছে লোকটার। আতঙ্কে ও বিস্ময়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, টলমলে পায়ে আনতে চেষ্টা করল জোর, তারপরে আবার সটান হয়ে পড়ল চট্টরাজের পায়ের সামনে। কিন্তু সেটা নেশায় না শ্রদ্ধাতে ঠিক বোঝা গেলনা। জড়ানো গলায় বললে, দণ্ডবৎ।

চট্টরাজ বললেন, ওঠরে ব্যাটা ওঠ। ওঃ, ভক্তিতে যেন একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। তবু যদি মুখ দিয়ে ভকভক করে ধেনোর গন্ধ না বেরুত।

—না হুজুর, দারু খাওনি হামি, সাঁচ কহোছি—

—না, না, দারু খাবে কেন, দারুব্রহ্মের পাদোদক খেয়েছে! কিন্তু—চট্টরাজ কপাল কুঁচকে তাকালেন: মুখটা যেন চেনা চেনা ঠেকছে! ব্যাটা তুই সনাতনপুরের সুরেন মুচির ভাই না?

লোকটা বিনয়ে গলে গিয়ে বললে, হুজুর কিবা না জানেন।

—হুঁ। তোর নাম হারান নয়?

তেমনি গলিত স্বরে উত্তর এল: হঁ।

—আর তুই না একটা মেয়েমানুষের ব্যাপারে একবার আমার হাতে দশ ঘা জুতো খেয়েছিলি চামারহাটির কাছারিতে?

হারাণ জিভ কাটল : উসব কহি আর ক্যানে সরম দেছেন হুজুর। ভুল হই গেইছিল—হামি খাঁটি মানুষ—

—হ্যাঁ, একেবারে হাড়ে হাড়ে খাঁটি।—চট্টরাজ ভ্রূভঙ্গি করলেন : সে সব যাক—রসালাপের সময় নেই এখন। শোন্, ঢোল বাজাতে পারিস ?

—নি পারি তো অস (রস) করি ইটা বহি বেড়াছি হুজুর ? একবার কহেন তো একটা ঘাও মারি গোটা গাঁও জড়ো করি দেছি এইঠে। হুঁ—হুঁ, কেষ্ট মুচির ব্যাটা হামি, ঢোল বাজাই হামার সাতপুরুষ নাম রাখি গেইল্ হুজুর—বংশ গৌরবে একেবারে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল হারান। তারপর টলমলে পায়ে একটা প্রচণ্ড পতনকে অতি কষ্টে সামলে নিলে সে।

—বেশ, খুব ভালো কথা। চল তাহলে—ঢোল কাঁধে কর।

—কুন্ঠে যাবা হেবে হুজুর ?

—অত জেনে কী হবে তোর। বকশিস পাবি, তা হলেই হল।

—হঃ, বক্শিস!—হারান দাঁত বের করলে, হুজুরের চরণধূলো পোয়া গিলেই হামার বক্শিস মিলিবে।

—বাপরে ভক্তিরস একেবারে উথলে পড়ছে! তবু যদি ইস্কুলে ক খ পড়েই উঁচ্ জাতের মাথায় পা দেবার চেষ্টা না করতিস।—চট্টরাজ তিক্তহাসি হাসলেন : নে, চল এখন।

—চলেক, চলেক—ঢোলটাকে কাঁধে করে হারাণ বললে, এমন বাজাই দিমু যে হুজুরের সাবাস্ দিবা নাগিবে—হঃ!

কিন্তু যাত্রার আয়োজন দেখেই কেমন খটকা লাগছে হারাণের। নেশাটা যত ফিকে হয়ে আসছে, তত বেশি করে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে মন। ঢোল বাজাতে যেতে হবে কিন্তু এসব কেন তার সঙ্গে ? এই লাঠি-শোটা, এই লোক-লস্কর ?

—হুজুর, হামি কিছু বুঝিবা পারোছিনা।

—বুঝি কুন্ কামটা হে তুমার ? হুজুর কহিছেন, সিধা ঘাঁটা ধরি চল।

বকর বকর কইরছ ক্যানে?—শিবু ধমকে উঠল, অভ্যাসবশে একটা লাঠির খোঁচা বসিয়েও দিলে হারাণের পাঁজরে।

—উঃ, বড় জব্বর খোঁচা মারিলা হে—

—বেশি বাত করিবা তো ফের মারিমু--শিবু শাসিয়ে দিলে। হুজুরের বরকন্দাজ, ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।

—থাউক দাদা, ঢের হইছে—

পোয়াটাক পথ ভাঙতেই সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে গেল হারাণের কাছে। দুরু দুরু করে উঠল বুক, শির শির করে একটা শিরহণ বয়ে গেল শরীরের রোমকূপগুলোর ভেতর দিয়ে। এ উচ্ছেদের ব্যাপার—কারুর সর্বনাশ হচ্ছে, ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কারো সুখের আশ্রয়, জমিদারের অত্যাচারে ছেলেপুলের হাত ধরে পথে দাঁড়াতে হবে আর একজন হতভাগা মানুষকে।

গ্রামের যে সব অত্যুৎসাহী পরোপকারীর দল লাঠি-ঠ্যাঙ্গা নিয়ে সরকারী লোককে তাড়িয়ে দিয়েছিল আর এতক্ষণ ধরে ঘাঁটি আগলাচ্ছিল বসে বসে, হাল-চাল দেখে তারা সব যে যেদিকে পারে সরে পড়েছে। বীররসের পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে একটা মর্মভেদী দৃশ্যের, একটা বেদনা-করুণ আবহাওয়ার।

লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ি, লক্ষ্মীহীনের সংসার। কুঁড়ে ঘরটার দরিদ্রতা কাউকে ডেকে বলে দিতে হয়না। এক কাঠা জমির ওপরে ছোট একখানি পেঁয়াজের ক্ষেত—রাজবংশী উপাসুর ওইটুকুই উপজীবিকা। উপাসুই বটে। তিন মাস চলে পরের ক্ষেতি-খামারে আধির কাজ করে, দুমাস চলে দু পয়সা সেরে পেঁয়াজ বিক্রী করে, কিছুদিন চলে বন থেকে তিত্ পোরল আর বুনো কচু খেয়ে অথবা দুমুঠো 'কাওনে'র চাল খেয়ে। বাকীটা বিশুদ্ধ উপবাস—উপাসু নামটা তার সার্থক।

দলবলটা এগিয়ে আসতেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল উপাসু। পরনে একটা লেংটি, কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারণ হয়না। ম্যালেরিয়ায় টিংটিংয়ে

শরীর, কটা বিবর্ণ রঙের চুল। সারা গায়ে খড়ি উড়ছে। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত তার চোখের দৃষ্টি, হাড়ি-কাঠে ফেলা একটা বলির পশুর মতো কেমন বিচিত্র বীভৎস আতঙ্কে চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার।

উপাসু ছুটে এল। দুহাতে দুটো ন্যাংটো শিশুর নড়া ধরে টানতে টানতে আনছে। সোজা এসে চট্টরাজের পায়ের তলায় ছেলে দুটোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, নিজে দুহাতে তাঁর হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল। বানে ডুবতে ডুবতে যেন আশ্রয় করেছে একটা কিছুকে, পেয়েছে কোনো একটা নিশ্চিত অবলম্বন।

—হামাক বাঁচান হুজুর—হামার ছেইলাপেইলার মুখ চাহি বাঁচান হুজুর—

—পা ছাড় হারামজাদা—ভৈরব স্বরে গর্জে উঠলেন চট্টরাজ।

—না হুজুর, পাও নি ছাড়িমু। এই জাড়ার দিনে ঘরর থাকি বাহির করি দিলে ছোয়াপোয়া সব মরি যিবে হুজুর, হামাক ভিটা ছোড়া নি করেন—

—কেন, নিজের হাতেই না আইন তুলে নিয়েছিলি ?—অশ্লীল গাল দিলেন চট্টরাজ : গ্রামের সে সব লোক, তোর সেই বারো বাপেরা সব গেল কোথায় ? ডেকে আন তাদের, তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবে !

—ওরা ভাগি গেইছে হুজুর—

—তবে তুইও ভাগ্‌—সজোরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে চট্টরাজ একটা লাথি বসিয়ে দিলেন উপাসুর বুকে। কোঁং করে একটা শব্দ হল, সাত হাত দূরে ছিটকে চলে গেল উপাসু। ছেলে দুটো আর্তনাদ করে উঠল বকের ছানার মতো।

হারানের নেশা এতক্ষণে সম্পূর্ণভাবে কেটে গেছে। গায়ের মধ্যে একটা তীব্র জ্বালার মতো কী যেন চম্‌কে চম্‌কে খেলে যাচ্ছে তার, রক্তের ভেতর শব্দ হচ্ছে ঝিন্ ঝিন্ করে। ঠোঁটের পেশীগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল হারানের, কী একটা বলতেও চাইল, কিন্তু বলতে পারল না।

—ভাঙ্ ভাঙ্, ঘর ভেঙে ফেল ব্যাটার। পরনে একফালি ন্যাকড়া

জোটে না, পেটে ভাত নেই, তবু তেজ দেখো একবার! সাতখানা গাঁয়ের লোক এনে জড়ো করেছে, হাঙ্গামা করবে জমিদারের সঙ্গে!

লোকগুলো তৈরীই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দমাদম ঘা পড়তে শুরু করল মাটি-খসা পচা বাঁশের বেড়ায়, ছাউনিহীন ঘরের চালে। দেখতে দেখতে একদিকের বেড়া নেমে গেল মাটিতে।

উপাসু চীৎকার করে উঠল। খাঁড়া পড়বার আগে পশুর শেষ আর্তস্বর যেন শুনল হারাণ। তারপরেও শিবু ঝাঁপ দিয়ে পড়ল উপাসুর ওপর—। কী যে হল কে জানে, মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে রইল উপাসু, আর মাথা তুললনা, প্রতিবাদও করলনা আর। শুধু ন্যাংটো ছেলে দুটো তার পাশে বসে তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে।

লাঠির ঘা পড়ছে, ভেঙে পড়ছে বেড়া। মানুষের উন্মত্ত পায়ের চাপে দলে পিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে উপাসুর পেঁয়াজের ক্ষেতের নরম সবুজ কলিগুলো—তার জীবনের সঞ্চয়। হিংস্র আনন্দে জ্বলজ্বল করছে লোকগুলোর চোখ—সমস্ত মুখে ঝকঝক করছে আসুরিক আনন্দের দীপ্তি।

—বাজা, ওরে ব্যাটা বাজা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী?

যন্ত্রের মতো ঢোলে কাঠি দিতে যাচ্ছিল হারাণ, মন্ত্রমুগ্ধের মতো উদ্যত হয়ে উঠেছিল তার হাত দুটো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ব্যাপার ঘটে গেল একটা।

হঠাৎ কাকের বাসা ভাঙবার মতো আওয়াজ করে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল তিনটি নারী। একটি বছর ত্রিশেক—উপাসুর বৌ; আর একটি বছর আঠারো, উপাসুর বোন; তৃতীয়টির এগারো-বারো বছর বয়েস, উপাসুর মেয়ে। ছেঁড়া ফতা-পরা মেয়ে তিনটি একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো এদের দিকে। সে দৃষ্টির তুলনা নেই! তারপর যেমন করে আর্তস্বর তুলেছিল উপাসু, তেম্‌নি বিশ্রী খানিকটা আওয়াজ করে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে দিলে পেছনের একটা আমবাগান লক্ষ্য করে।

কিন্তু কয়েক পা এগোতেই একটা গর্তের মধ্যে পা দিয়ে পড়ে গেল উপাসুর

বোন। তারপর ধড়মড় করে যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন দাঁড়ালো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে—একটা কাঁটা গাছে আটকে আছে তার ফতাটা। পরম বিপদের মুখে প্রকৃতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে।

রাক্ষসের গর্জনের মতো কলরব উঠল প্রবলভাবে—আকাশ-ফাটানো হাসির আওয়াজ মুখর করে তুলল চারদিক, একশো চোখের নির্লজ্জ, কুৎসিৎ, ক্ষুধিত দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই অসহায় করুণ নগ্নতার ওপরে। পাথরের মতো মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি, এক মুহূর্তের জন্যে যেন নিজের সমস্ত আকুতি নিবেদন করে দিলে নগ্ন আকাশ আর নিরাবরণ পৃথিবীকে, তারপর তেমনি ভাবেই ছুটে চলে গেল আমবাগানের দিকে। শুধু নতুন কালের নতুন দ্রৌপদীর অভিশাপ আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত হয়ে রইল।

একশো চোখ তেমনি কুৎসিতভাবে অনুসরণ করতে লাগল তাকে, আবার একটা প্রবল আর পৈশাচিক হাসির আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে উঠল। চট্টরাজও হাসছেন সমানভাবে, লোভে চোখদুটো কুৎকুৎ করছে তাঁর।

শিবু বললে, ধরি লি আসিমু নাকি ছুঁড়িটাক ?

চট্টরাজ স্নেহভরে ধমক দিলেন একটা, কিন্তু আবার সেই উচ্ছ্বসিত হাসির বন্যায় তাঁর কথাটা তলিয়ে গেল। কিন্তু লজ্জায় বেদনায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে হারাণ; লম্পট, চরিত্রহীন হারাণ। ইচ্ছে করল হাতে ঢোলটা তুলে ধাঁ করে বসিয়ে দেয় চট্টরাজের মাথায়, গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয় দেড়হাত টিকিশুদ্ধ ওই নায়েবী মাথাটা। কিন্তু পারলনা। তার বদলে ট্যাঁক থেকে ছোট ছুরিটা বের করে সজোরে বসিয়ে দিলে ঢোলের মধ্যে, চড় চড়াৎ করে ফেটে গেল চামড়া।

—কইরে হারাণ, বাজা, ঢোল বাজা—

—কার বা সড়কির খোঁচ লাগি ঢোল ফাটি গেল হামার—নি বাজিবে—।
—শুষ্ক তিক্তস্বরে উত্তর দিলে হারাণ, তারপর ঢোল কাঁধে করে সোজা হাঁটতে শুরু করে দিলে।

তড়াং করে গালে একটা চড় পড়ল—শিবু বসিয়েছে। মাটিতে বসে পড়ল হারাণ, বসে পড়ল চোখ বুজে।

—ইচ্ছা করি ঢোলটাক ফাঁসাই দিলু নাকিরে শালা?

—থাক, ছেড়ে দে—চট্টরাজ বললেন: আর ঢোল-শহরতের দরকার হবে না। কাজ হয়ে গেছে।

উপাস্থর বাস্তুভিটা তখন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, পেঁয়াজ ক্ষেতে খানিকটা দলিত সবুজের পিণ্ড ছাড়া কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কাল সকালেই লাঙল দিয়ে একে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে, বুনে দেওয়া হবে শর্ষে কলাই। বিদ্রোহী প্রজার চিহ্নটুকুকেও মুছে দিতে হবে চিরদিনের জন্যে।

শুধু এতগুলো লোকের মধ্যে একজন চোখ বুজে নিথর হয়ে পড়ে রইল—সে উপাস্থু। আর একজন হারাণ, লম্পট, চরিত্রহীন, মাতাল হারাণ। জমিদারের লোকের মতো ন্যায় আর ধর্মবোধ তার প্রখর নয় বলেই ফাটা ঢোলটা আঁকড়ে ধরে সে চোখ বন্ধ করে বসে রইল অন্ধের মতো।

এগার

হাবিবপুর থানার বড় দারোগা সাহেব চা খাচ্ছিলেন। বেশ সৌখীন মেজাজের লোক। দুটি বিবি আর একটি বাঁদী—একুনে এই তিনটি পরিবার। এবং তিনজনের মনোহরণ করবার জন্য সব সময়েই তাঁকে সজাগ থাকতে হয়, ধারণ করতে হয় যথাসাধ্য কন্দর্পকান্তি। সিল্কের লুঙ্গি পরেন দারোগা, গোলাপী আতর দেন দাড়িতে, চোখে মাঝে মাঝে যে সুর্মা মাখেন না, এমনও নয়। গড়গড়ায় ভালো তামাক নইলে তাঁর ঠিক মৌজটা জমে ওঠে না, তাই বিষ্ণুপুরী তামাক চৌকিদার পাঠিয়ে নিয়মিত আনিয়ে নেন সহর থেকে। একটা স্ত্রী বন্ধ্যা, তার ক্ষতিপূরণ করেছেন আর একজন। বছর বছর তিনি যমজ সন্তানের জন্মদান করে থাকেন, তাই দারোগা সাহেব ছয় বছরের ভেতরেই ছয়টি কন্যা আর চারটি পুত্রের সগৌরব পিতৃত্ব লাভ করেছেন। এহেন পুণ্যবান এবং ভাগ্যবান লোক যে সব সময় হাসিতে এবং প্রসন্নতায় একেবারে সমুজ্জল হয়ে থাকবেন, এটা প্রশ্ন তথা সংশয়ের অতীত। সুতরাং মহিন্দরেরা তাঁর দাড়ি-বিভাসিত পুলকিত মুখখানা দেখে চরিতার্থ বোধ করে থাকে, তাঁকে ভেট নিবেদন করে পিতৃপক্ষে পিণ্ডদানের মতো অক্ষয় পুণ্য অর্জন করে।

দারোগা সাহেব চা খাচ্ছিলেন এবং অবসর সময়ে দাড়িটাকে আদর করছিলেন পুত্রস্নেহে। সামনে একখানা সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকা খোলা আছে। এসব গ্রাম-মফঃস্বল জায়গায় এই ধরণের পত্র-পত্রিকাতেই বিশ্বপৃথিবীর

খবর আসে। প্রথম পাতাটা সাধারণত দারোগার ভালো লাগে না—বাজে কচকচিতে ভরা থাকে। ওগুলো উলটে গিয়ে তিনি অষ্টম পৃষ্ঠায় চলে আসেন—যেখানে আইন-আদালতের খবর মেলে। আইন-আদালত বড় ভালো জিনিষ, মধ্যে মধ্যে ও পাতায় অনেক রসালো ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। যেদিন তেমন কোনো খবর থাকে না, সেদিন নিরাশ হয়ে তিনি বিজ্ঞাপনে মনোনিবেশ করেন এবং বহু আশ্চর্য আশ্চর্য ওষুধের সন্ধান মেলে। "দুর্বলের বল, হতাশের আশা"। ওই সব বিজ্ঞাপন পড়লে নিজেকে অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত মনে হয়, মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করেন দুটির জায়গায় চারটি বিবির জন্যে একবার চেষ্টা করে দেখবেন কিনা। বাদশাহী ওষুধের গুণাগুণ একবার পরখ করতেই বা আপত্তি কী।

একটু দূরেই একটা চৌকিদার খুরপী হাতে করে দারোগার ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটছে। কাগজ পড়তে পড়তে অন্যমনস্কভাবে দারোগা তাকাচ্ছিলেন তার দিকে। চৌকিদারের নাম কদম আলী। ওর একটা দিব্যি চেহারার বোন আছে—মাসখানেক হল তার খসম তালাক দিয়েছে তাকে। একবার এক লহমার জন্যে মেয়েটা তাঁর চোখে পড়েছিল, সেই থেকে একটা নেশা জমে আছে। বাদশাহী বটিকার বিজ্ঞাপন পড়ে মনে হচ্ছে একবার কদম আলীকে ডেকে নিকার কথাটা পাকা করে নেবেন কিনা। সংসারে একটু অশান্তি হয়তো দেখা দেবে—বিশেষ করে ছোট বিবির তো দস্তুরমতো বাঘিনীর মতো মেজাজ। তবে বাইরে যতই প্রসন্নমুখ সদানন্দ হোন না কেন, অন্তঃপুরে দারোগা অত্যন্ত হুঁশিয়ার—একেবারে সিংহ অবতার। যতই ঘ্যান ঘ্যান করুক না কেন—বেশী ওস্তাদী চলবে না—ঠাণ্ডা করে দেবেন।

প্রথমে অন্যমনস্কভাবে কদম আলীকে দেখছিলেন দারোগা, লক্ষ্য করছিলেন কী করে সে ঘস্ ঘস্ করে নিপুণ হাতে ঘাস কেটে চলেছে। তারপর ক্রমশ তিনি কাগজটা একেবারে নামিয়ে রাখলেন, ভুলে গেলেন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে। কাণের কাছে গুন গুন করে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো একটা

শব্দ হতে লাগল—মন্দ কী, তা নেহাৎ মন্দ কী। ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয়। রাজী হবেই কদম আলী, না হলে ওর বাপ হবে। কিন্তু গণ্ডগোল বাধছে সামাজিক মর্যাদাটা নিয়ে। তিনি এই থানার দুর্দান্ত বড় দারোগা, আর ও ব্যাটা নিতান্তই চৌকিদার—অতি ছোট, অতি নগণ্য। ওর বোনকে বিয়ে করলে লোকে ঠাট্টা করবে, আঙুল বাড়িয়ে বলবে থানার দারোগা কদম চৌকিদারের বোনাই। কাজেই মুস্কিল আছে। অথচ মেয়েটার কথাও ঠিক ভোলা যাচ্ছে না। দারোগা কদমের দিকে তাকিয়ে রইলেন, ভাইকে দেখেই বোনকে দেখার সাধ এবং স্বাদটা মেটানো যাক যথাসাধ্য।

বিশ্রী একটা চীৎকারে বাদশাহী বটিকার স্বপ্নটা হঠাৎ ভেঙ্গে চুরে গেল দারোগার। একটা লোক আর্তনাদ করছে হাজতে। চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহ করে ওকে ধরে আনা হয়েছে, কাল রাত্রে জমাদার বাবু ওকে একটু পালিশ করেছেন, তাই গায়ের ব্যথায় আর্তনাদ করছে। অবশ্য এখনো কিছুই হয়নি, আরো বিস্তর দুঃখ কপালে আছে ওর। চুরি করুক আর নাই করুক, যতক্ষণ না স্বীকার করছে সে চুরি করেছে ততক্ষণ এইরকম দলাই মলাই চালাতেই হবে। কী করা যাবে, উপায় নেই। সব চোরকে ধরতে পারে এমন ক্ষমতা খোদা কেন, সাক্ষাৎ ইবলিশেরও নেই। কিন্তু ইন্সপেক্টর ব্যাটা সেটা বোঝে না, কাজেই দায়ে পড়ে চাকরীটা বজায় রাখবার জন্যই এসব করতে হয়।

লোকটা চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে: হামাক ছাড়ি দাও, দোহাই বাপ, ছাড়ি দাও হামাক। খোদার কসম, হামি কিছু করি নাই। ঘরত হামার রোগা ব্যাটাটা মরি যাছে—হামাক—

ক্যাঁক্। শব্দটা থেমে গেল। ভোজপুরী পুলিশ কর্তব্য পালন করেছে, রুলের খোঁচা পেটে বসিয়ে দিয়েছে ঠাণ্ডা করে। ভালোই করেছে। বড্ড চীৎকার করছিল, তিন নম্বর বিবির সম্ভাবনাময় সুখস্বপ্নে বিশ্রী রকমের ব্যাঘাত করছিল। লোকগুলোর যেন ফুলের শরীর হয়েছে আজকাল—দু একটা

খোঁচাখোঁচি খেলেই একেবারে বাপ্‌রে মারে বলে ডাক-চীৎকার শুরু করে দেয়। একেবারে মিহি ফিনফিনে মাখনের মতো চামড়া হয়েছে বাবুদের। অথচ আগেকার ক্রিমিন্যালগুলো ছিল আলাদা জাতের। মেরে আধমরা করে দিলেও টুঁ শব্দ করত না, এমন কি বাঁশডলা দিয়ে যখন হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হত তখনও না। আর এ ব্যাটাচ্ছেলেরা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি। নাঃ, সব দিক দিয়েই দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে!

—শালারা—

অস্ফুট স্বরে প্রায় স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলেন দারোগা। এইটেই তাঁর প্রধান গুণ, তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গালাগালিটাও তিনি এমন আস্তে আস্তে করেন যে, লোকে বুঝতে পারে না—অনুমান করে তিনি মসনবি আওড়াচ্ছেন। হুকুমটা তিনিই দেন বটে, কিন্তু হুকুম পালনকারী জমাদারবাবু সেটাকে কেন্দ্র করে এমন তর্জন-গর্জন শুরু করে দেন যে, লোকে বুঝে নিয়েছে দারোগার মতো মাটির মানুষ আর হয় না এবং ওই জমাদারটাই যত নষ্টের গোড়া। দোষ অবশ্য জমাদারেরও আছে। পরের বারে এস্‌-আইয়ের নমিনেশন পাওয়ার আশায় এখন থেকেই সে প্রাণপণে গলাবাজী আরম্ভ করেছে। যেন প্রমাণ করতে চায় সে কেমন কড়া মানুষ, ভবিষ্যতে কি রকম দুঁদে দারোগা হয়ে উঠবে।

দারোগা হাসলেন, দাড়িটাকে আদর করলেন স্নেহভরে। ভুল করছে জমাদার। আজকাল আর ও করে সুবিধে হয় না। দিন বদলাচ্ছে—মানুষ বদলে যাচ্ছে। গরম চোখ দেখিয়ে এখন আর কাউকে বশীভূত করতে পারা যায় না। একটার পর একটা ঢেউ উঠছে। চারদিকের মানুষগুলো এখন আর মাথা নীচু করে সভয়ে মাটির দিকে তাকায় না, কেমন ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় বিদ্রোহীর মতো। আজ এটা নিঃসন্দেহ যে, প্রতিবাদ ঘনিয়ে উঠছে দেশের মানুষের মধ্যে। কোথায় যেন অঙ্কুরিত হচ্ছে আসন্ন একটা বিরোধের বীজ। শহরে, মহকুমায়, গঞ্জে মাঝে মাঝে মাথা তুলছে

মানুষ, কিন্তু পরক্ষণেই তাদের সে বিদ্রোহ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আইনের যাঁতার নীচে, গলার জোরালো আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফাঁসির দড়িতে।

কিন্তু—

কিন্তু মরেও মরছে না। থেকে যাচ্ছে চাপা আগুনের মতো। শহর, মহকুমা, গঞ্জের বুকের ভেতর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তা সব জায়গায় নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু বোঝা যায়—। বোঝা যায় সব ঠিক আছে বটে, তবু কোথায় যেন সবই এলোমেলো হয়ে আছে। একদিন একটুখানি ঘা লেগেই হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়তে পারে।

আজকাল ভয় করে। কেমন একটা ছমছমানি এসেছে বুকের মধ্যে, এসেছে দুর্বলতা। আগে রাত-বিরেতে যেখান-সেখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতেন, মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় কোন কিছুতেই বিন্দুমাত্র পরোয়া ছিল না তাঁর। দারোগা জানতেন, তাঁদের প্রতাপ কত ভয়ঙ্কর—কী নিদারুণ তাঁদের তেজ। সে তেজে শুধু মানুষ নয়, জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত পালাতে পথ পায় না। জিনেরা লুকিয়ে যায় কবরের ভেতরে, ভয় পায় ধরতে পারলে হয়তো আবার দারোগা সাহেব তাদের হাজতে নিয়ে গিয়ে বাঁশডলা দেবেন। মরেও সে বিভীষিকা থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এখন? এখন সব আলাদা।

বাইরে খুব বেশি কিছু যে ঘটেছে তা নয়, ভয়টা জেগেছে নিজের বুকের মধ্যেই। আজকাল অন্ধকারে আসতে ভয় করে, পথের পাশে পাশে কালো কালো ঝোপগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন একটা আশঙ্কা শির শির করে যায় গায়ের মধ্যে। ভয় করতে থাকে, মনে হয় কারা যেন লুকিয়ে আছে ওদের ভেতরে, ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হিংস্র চোখে সন্ধানী আলো জ্বেলে যেন প্রতীক্ষা করে আছে। যে কোনো সময় একটা বল্লম তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিতে পারে, একেবারে সোজা ফুঁড়ে দিতে পারে পেটটা। অথবা গলার ওপরে নেমে আসতে পারে কোনো ধারালো রামদার অব্যর্থ লক্ষ্য।

তাই—

তাই দারোগা এই আপাত-অহিংসার পথটা গ্রহণ করাই সমীচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। যদি কিছু সুবিধে হয়, এতেই হবে। ভবিষ্যতে কোনোদিন ভরাডুবি যদি হয়, এবং হওয়ার আশঙ্কাটা যে একেবারে কল্পনা তাও নয়—সেদিন এই থেকেই হয়তো কিছুটা আত্মরক্ষা বা পিত্তরক্ষা করা সম্ভব। দারোগা সাহেব বুদ্ধিমান লোক, তিনি আগে থেকেই বিবেচনা করে পথ চলাটা পছন্দ করেন। কাজটা হাঁসিল করাই কথা, একটু মিষ্টি মুখ হলে ক্ষতি কী।

ধ্যেৎ। যত এলোমেলো ভাবনা। দারোগা আবার হিতবাদীখানা হাতে তুলে নিলেন।

কোথা থেকে মনটা কোথায় চলে গেছে। ছিল কদম আলীর বোন আর বাদশাহী বটিকা, সেখান থেকে এ সব দুর্ভাবনার মধ্যে এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। মনের ভেতরে শয়তানের আস্তানা আছে, খালি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে চায় দুশ্চিন্তার ভেতরে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

দারোগা চোখ তুলে দেখলেন, একটা লাল রঙের বেঁড়ে টাট্টু ঢুকছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। তার ওপরে রোগা কালো রঙের একজন সোয়ারী। মাথার আধপাকা চুলের ভেতরে একটি খাড়া টিকি আকাশকে খোঁচা দিচ্ছে। চট্টরাজ নায়েব।

দারোগা হাসলেন। রাজ্যপাট যদি বজায় থাকে তা হলে ভবিষ্যতে এসব লোকের জন্যেই থাকবে। পৃথিবীটা যখন দিনের পর দিন মরুভূমি হতে চলেছে তখন চট্টরাজের মতন লোকেরা হচ্ছে পান্থপাদপ। ছায়া দেয়, আশ্বাস পাওয়া যায় অন্তত। পারস্পরিক স্বার্থের সোজা সম্পর্ক।

ঘোড়ার উপর থেকেই অভিবাদন জানালেন চট্টরাজ। দাঁত বের করলেন কৃতার্থভাবে। দারোগাও হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন, সেলাম করলেন অনুরাগ

ভরে। বিগলিত স্বরে বললেন, হঠাৎ কী মনে করে পায়ের ধুলো পড়ল আজকে? ব্যাপারখানা কী?

ঘোড়া থেকে চট্টরাজ নামলেন, পুলিশ ব্যারাকের একটা লোহার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললেন সেটাকে। তারপর দারোগার দ্বিগুণ হাসিতে কালো মুখখানা আলো করে বললেন, কেন, হুজুরের সঙ্গে একটু দেখা করতে এলেও কি ক্ষতি আছে নাকি?

জিভ কেটে দারোগা বললেন, তোবা, তোবা।

চট্টরাজ থানার বারান্দায় উঠে এলেন, বসলেন দারোগার পাশের চেয়ারখানাতে। দারোগা চোখ মিট মিট করে বললেন, তারপর কী মনে করে?

—একটু উপকার করতে হবে।

—কী উপকার?—দারোগা সাহেব তেমনি চোখ মিট করতে লাগলেন: গরজ না হলে পায়ের ধুলো যে পড়ে না সে তো জানাই আছে।

চট্টরাজ মৃদু গলায় বললেন, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

আরো চাপা গলায় দারোগা বললেন, কী, খুনটুন নয়তো? তা হলে কিন্তু সামাল দিতে পারব না।

—না, না, সে সব নয়। ও সমস্ত করবার দিন নেই আর, সময় বড় খারাপ পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চট্টরাজ: একটা লোককে একটু শায়েস্তা করতে হয়েছে।

—বলে যান।—দারোগা চোখ বুজলেন।

—লোকটাকে জুতো-পেটা করা হয়েছে, দুদিন না খেতে দিয়ে কাছারীতে আটকে রাখা হয়েছে।

—খুব ভালো হয়েছে।—দারোগা তাচ্ছিল্যভরে বললেন, এ আর নতুন কথা কী—এতো আপনারা হামেশাই করছেন। কিন্তু এর জন্যে এত ভয় পাওয়ার কী হল?

—কারণ আছে। লোকটা মানী মানুষ—প্রায় দেড়শো বিঘে জোত রাখে। বেশ শক্ত তেজী মন, টাকার জোরও আছে। বলছে—মামলা করবে।

—করুক না, ভয় কী! ফেঁসে যাবে।

—উহুঁ, ল্যাঠা আছে—

চট্টরাজ ঠোঁট ওল্টালো: সাক্ষী-সাবুদ জুটিয়ে আনতে অসুবিধে হবে না ওর। দেশের চাষা-মজুরগুলোকে তো দেখতে পাচ্ছেন আজকাল, বড্ড হারামজাদা হয়ে গেছে। জমিদারের পেছনে না হোক, অন্তত নায়েবকে একটা খোঁচা দিতে পারলেও সে সুযোগটা ছাড়তে চাইবে না। সময়টাই খারাপ।

—বুঝলাম—

—তা সদরে যাওয়ার আগেই একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আর—চট্টরাজ থামলেন।

—আর?—দারোগা হাসিভরা চোখে তাকালেন।

কথা পাকা হয়ে গেল। চট্টরাজ উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় শোনা গেল বাজনার শব্দ। কোথায় বেশ সাড়া-শব্দ করে ঢাক আর কাঁসর বাজছে।

—কিসের আওয়াজ?

দারোগা বিস্মিত হয়ে বললেন, জানেন না? আপনাদেরই তো পরব। পরশু বোধহয় সরস্বতী পূজা। ওদিকে কোথায় একটা পূজো হচ্ছে—তারই আয়োজন।

—সরস্বতী পূজো? ওঃ—

কথাটা বলেই ভুলে যাচ্ছিলেন চট্টরাজ—হঠাৎ আর একটা জিনিস মনে পড়ল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, ঠিক, ঠিক, আমারও তো একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

—কী কাজের কথা আবার?

—যত সব কাণ্ড!—বিরক্ত উত্তেজিত গলায় চট্টরাজ বললেন, এই মুচি শালারা আজকাল যেন মাথায় চড়ে বসেছে। না মানে দেবতাকে, না ভক্তি আছে ব্রাহ্মণে। এমন আস্পর্দা যে, সরস্বতী পূজো করতে চায়। ওই চামারহাটির হারামজাদাদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—হুঁ?

চট্টরাজ চটে গিয়ে বললেন, যদি সত্যিই পূজোর ধাষ্টামো করে তা হলে এমন ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করব যে, কোনোদিন ভুলবে না। আর ওদেরও দোষ নেই, ওই ব্যাটা মাষ্টারই যত কুবুদ্ধির গোড়া, ওই নাচাচ্ছে ওদের। নাপিত হয়ে দেবীর পূজো করতে চায়, হাত খসে পড়বে না কুষ্ঠরোগে?

দারোগা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। ওই মাষ্টারটা কে বলুন তো? আমি ওর সম্পর্কে যা রিপোর্ট পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে যে লোকটা ঠিক সোজা নয়। কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ ব্যাপার নেই বলে নাড়াচাড়া করে দেখতে পারিনি। আপনি চেনেন মাস্টারকে?

চট্টরাজ মুখভঙ্গি করে বললেন, হুঁ, চেনবার সৌভাগ্য হয়েছে বই কি। কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা—আমাদের মানুষ বলেই তিনি মনে করেন না বলে বোধ হল। তাছাড়া—চট্টরাজ হঠাৎ থেমে গেলেন।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তাছাড়া কী?

চট্টরাজ ভ্রুকুটি করে দারোগার মুখের দিকে তাকালেন: কথাটা আগে আমারই বলা উচিত ছিল দারোগা সাহেব। লোকটাকে দেখে আমার সন্দেহ হল।

—কী সন্দেহ? কী বলুন তো?

—যখন জিজ্ঞেস করলুম, বাড়িটা কোথায়, তখন যা-তা একটা পরিচয় দিলে। বললে, ফুলবাড়ির পরামাণিক বাড়ির লোক। কিন্তু আমার মামার বাড়ী তো ওখানেই, সবই ভালো করে চিনি। ওখানে কোনো পরামাণিক বাড়ি আছে বলে আমি জানি না। তা ছাড়া মুখ-চোখের ভাব দেখে বেশ

বুঝলুম মিথ্যে বলছে। কেন মিথ্যে বলল, সেটাই আমি এ পর্যন্ত ঠাহর করতে পারিনি। কিছু একটা গোলমাল আছে বলে বোধ হল যেন।

অসীম আগ্রহভরে দারোগা কথাগুলো শুনছিলেন। চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে। বড় গোছের শিকার নয়তো কিছু? অ্যাব্‌সকণ্ডার? কোনো রাজনৈতিক আসামী?

—সত্যি বলছেন?

—আপনাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কী?

—তবে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। চামারহাটির মুচিদের বিষদাঁত আমিই ভাঙব। আপনি আমার সঙ্গে একবার ভেতরে চলুন, কয়েকখানা ছবি দেখাব আপনাকে। দেখবেন তো কাউকে চিনতে পারেন কি না।

* * *

আজ দুদিন থেকে দেখা পাওয়া যাচ্ছে না সুশীলার। এতকাল যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সচেতনার প্রয়োজনই ছিল না, আজ তার সম্পর্কে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে উঠেছে সে। হঠাৎ মনে হয়েছে, সত্যিই ভাবান্তর ঘটেছে সুশীলার, সত্যিই বদলে গেছে সে।

চোখাচোখি দুএকবার দেখা হতে না হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। প্রায় একমাস ধরে যে স্বপ্ন-কল্পনা মনের ভেতর একটা অপূর্ব রূপকথার জগৎ গড়ে তুলছিল, টলমল করে দুলে উঠেছে তার ভিত। যোগেন বুঝতে পেরেছে, যা হওয়া উচিত ছিল, তা হচ্ছে না। তাদের দুজনের মাঝখানে আর কিছুর ছায়া পড়েছে।

কী তা? কী হতে পারে? সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাওয়া গেল। রাহুর মতো কে এসে সেখানে হাত বাড়িয়েছে তা আর মনের কাছে দুর্বোধ্য নয়। একটা হিংস্র অন্তর্জ্বালায় ঠোঁটটাকে কামড়াতে লাগল যোগেন। সে খবর পেয়েছে, এর পরও নাকি দুদিন এসেছিল ধলাই। তেমনি জল আর পান খেয়ে গেছে।

শুনে যোগেন প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল।

—আসিলেই উয়াক্ খ্যাদাই দিয়ো মা!

—ক্যান, কী হৈল্? অ্যাতে দোস্তি আছিল—যোগেনের মা আশ্চর্য হয়ে গেল।

ঠিক কী বললে ধলাইয়ের দোষটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে ভেবে পেল না যোগেন। অথচ সোজা কথাতেই বলা চলত। বলা চলত, ওর সঙ্গে আর আমার বন্ধুত্ব নেই, ও আর আমার দলের লোক নয়—ঝগড়া করে চলে গেছে। কিন্তু মনের ভেতরে অবস্থাটা এত সহজ নয় বলেই সহজ সত্যি কথাটা বলতে পারল না যোগেন। শুধু চুপ করে থেকে কোথাও একটা ক্ষুব্ধ ঝড়ের আকুতি যেন সে অনুভব করতে লাগল।

নাঃ, যা হোক কিছু করতেই হবে। আর সহ্য হচ্ছে না যোগেনের—একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত স্নায়ুগুলো পর্যন্ত তার জ্বলে যাচ্ছে। এ অসম্ভব। সে তো বেশ ছিল; জীবনের এই যে একটা দিক আছে, এর কথা এতকাল তো তার মনে হয়নি। মহকুমা সহরের সেই রাত্রি—সেই কুৎসিৎ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া—একটা তিক্ত বিস্বাদে দূরেই সরিয়ে রেখেছিল তাকে। কিন্তু এল সুশীলা। অন্ধকার নির্জন উঠোনে তার মুখে পড়ল প্রদীপের আলো, প্রথম ফোটা ফুলের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যেন। অনেক মেয়ের ভেতরেও যে যোগেন হাঁসের পাখায় এক বিন্দু জলের মত ছিল নিরাসক্ত—মাতলামির মাতন জেগে গেল তার ভেতরে; রাতের পর রাত জেগে কবি লিখে যেতে লাগল একটা আশ্চর্য অনুভূতির কথা, রূপকথার রাজকন্যার কল্প-কাহিনী :

—কাজল কালো চইখে তোমার
ভমর উড়ি যায়—

যতদিন জানত না, ততদিন বেশ ছিল। যখন জানল তখন না পাওয়ার ব্যথাটা সমস্ত সহ্যশক্তিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সমস্ত বোধবৃত্তিকে দুঃসহভাবে পীড়ন করছে তার। যোগেনের ইচ্ছে করতে লাগল, সে তার মাথার

চুলগুলো দুহাতে উপড়ে উপড়ে শেষ করে দেয়, অসহায় স্বরে একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

সরস্বতী পূজোর রাত্রে চামারহাটিতে আলকাপের গান গাইতে হবে তাকে। নতুন স্বরে, নতুন ভাবনায়, নতুন ভাষাতে। দুটো জ্বলন্ত চোখে তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়ে মাষ্টার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে গেছে। কিন্তু—কিন্তু—

না, সে পারবে না ওসব। তার দরকার নেই চারণ হয়ে, তার প্রয়োজন নেই দেশের যত মানুষকে ভালো ভালো কথা শুনিয়ে জাগিয়ে দিয়ে। ওসব কাজ করবার অন্য লোক আছে, অন্য লোকের সামর্থ্য আছে ও দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার। সে নয়।

তবে কী করবে! হিংস্র একটা আক্রোশে নিজের একটা গানকেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল যোগেন। সে শিল্পী হতে চায় না, গুণী হতেও চায় না। নিজের প্রাণটাকে ভরে রাখতে পারলেই তার সমস্ত প্রয়োজন মিটে যাবে। আজ যদি তার সবচেয়ে বড় কিছু চাইবার থাকে, তা হলে সে সুশীলা। সুশীলাকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুরই কোনো অর্থ নেই তার কাছে।

সোজা পথ দিয়ে সুশীলাকে পাওয়ার উপায় নেই। ও ব্যাপারের প্রায় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। সুশীলার বাপের টাকার খাঁই শুনে সুরেন চেঁচিয়ে বলেছে, কাম নাই হামার উয়ার সাথ্ বিহা দিয়া। হামার এমন ভাইয়ের জন্য কি মেইয়ার অভাব হেবে? একটা ছাড়ি অর দশটা বিহা দিমু—এই তুমাক কহি দিনু মা।

মা শুধু দুঃখ করে বলেছে, হৈলে বড় ভালো হৈত—

—তো ফের কী করা যায়। হামার ভাইয়ের ঢের বিহা জুটিবে।

সুতরাং আলোচনাটা চাপা পড়ে গেছে। তাদের ছোটলোকের ঘরে এমন কথা অনেক ওঠে, অনেক ভাঙে। কেউ তার গুরুত্ব দেয় না। তাই

বিয়ের প্রস্তাবটা ভেঙে গেলেও কারো মনে কোনো বিকার দেখা দেয়নি। সুশীলা যেমন আছে, তেমনি আছে, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে, এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় বলে মনে হয় না কারুর। মরণ হয়েছে শুধু যোগেনের। সকলের কাছে যা সহজ, তার কাছে তা তত দুরূহ।

মরণ ছাড়া কী আর বলা চলে একে? খেতে শোয়াস্তি নেই, শুয়ে ঘুম আসে না। বুকের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালা। কদিন থেকে সুশীলা স্পষ্ট অবহেলা করছে তাকে। আর তা ছাড়া ভালো লাগে নি ধলাইয়ের সেদিন-কার সেই চোখের দৃষ্টি, একটা অস্বস্তিকর সম্ভাবনায় কেমন ছম ছম করছে মন। অথচ যদি পাওয়ার আশাটা পাকা হয়ে থাকত তবে ভাবনার কিছু ছিল না— বরং একটা অপূর্ব মধুরতাই এই প্রতীক্ষাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। কিন্তু এ নিতান্তই গোপন—এ একান্তই তার নিজস্ব; তাই এ অসহ্য, তাই দুদিনের এ অবহেলাও একটা নিশ্চিত অঘটনের সংকেত। একটা মাত্র পথ আছে। চরম পথ—আর উপায় নেই। এ না হলে পাগল হয়ে যাবে যোগেন, ক্ষেপে যাবে। তার কিছুই দরকার নেই। আলকাপের গান সে গাইতে চায় না, প্রকাণ্ড একটা কিছু হতেও চায় না জীবনে। চুলোয় যাক মাষ্টার, চুলোয় যাক তার গান। সুশীলাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে। যেখানে হোক—যতদূরে হোক। সেখানে সে একচ্ছত্র, সেখানে তার আর সুশীলার ভেতরে এতটুকু ছায়াসঞ্চার নেই কারো।

বন্দী একটা জানোয়ারের মতো ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল যোগেন। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রাত। শুধু সুরেনের নাক ডাকছে—বিশ্রী একটা গাঁ গাঁ শব্দে মুখরিত হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা—যোগেনের অসহ্য তীব্র বিরক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়েছে যেন।

—বারো—

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে যোগেনের মার দৃষ্টিটাও স্বচ্ছ হয়ে এল।

বুড়ো মানুষ, শীতটা এমনিতেই বেশি। তা ছাড়া কাল সাঁঝ রাতে অল্প বৃষ্টি হওয়ায় আজ যেন আকাশ ভেঙে হিম নেমে এসেছে। শেষ রাত্রের দিকে পা দুটো একেবারে কালিয়ে আসতে লাগল, কাঁথার ভেতরটাও যেন জলে ভিজে গেছে বলে মনে হল। হাতে হাতে পায়ে পায়ে ঘষেও একটুখানি গরম হতে চাইছে না শরীর।

এই রকম বিশ্রী শীতে ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে গেল যোগেনের মার। ঠিক ঘুম যে ভাঙল তা নয়, ঠাণ্ডায় ফিকে হয়ে এল সুপ্তির ঘন গভীর আবেশটা। অর্ধচেতন ঘরের মধ্যে একটা ইচ্ছে সঞ্চারিত হচ্ছে, উঠে আগুনের তাওয়াটা জ্বালিয়ে হাত পাগুলো একটু সেঁকে নিলে মন্দ হয় না একেবারে। কিন্তু আলস্য আর ঘুমের ঘোর চেষ্টাটায় বাধা দিচ্ছিল বার বার।

এমন সময় হঠাৎ টের পাওয়া গেল পাশ থেকে উঠে যাচ্ছে সুশীলা। তখন কিছু মনে হয়নি। তারও পরে শোনা গেল কোথা থেকে যেন অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট একটা বাঁশির সুর শোনা যাচ্ছে। চমৎকার লাগল সে সুর। শেষ রাতের স্তব্ধতায়, শীতের হিমাচ্ছন্ন জড়তার মধ্যে যেন চাঞ্চল্যের আলোড়ন একটা। ওই রকম বাঁশি শুনলে মন কেমন কেমন করে ওঠে, ঠাণ্ডা আড়ষ্ট রক্তের মধ্যে যেন একটা উত্তপ্ত আচ্ছন্নতা বিকীর্ণ হয়ে পড়তে চায়।

কখন বাঁশি বেজেছে টের পায়নি যোগেনের মা। আবার যেন ঘন হয়ে ঘুম নামছিল তার চোখের পাতায়। কিন্তু কেমন যেন খেয়াল হল অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে, পার হয়ে গেছে সুশীলার ফিরে আসবার সম্ভাব্য সময়। এতক্ষণ কোথায় কাটাচ্ছে সুশীলা, কী করছে? এই সাঁজ-সকালে এমন কিছু কাজ তাকে করতে হয়না। অবশ্য গেরস্তর বাড়ি, কাজের অন্তও নেই, কিন্তু তাই বলে কুটুমের মেয়েকে খাটিয়ে বদনাম করবার ইচ্ছে নেই যোগেনের মার। তা ছাড়া এমনিই একটু আহ্লাদে মেয়ে, কুঁড়েমিও আছে, যেচে সংসারের এটা ওটা খেটে দেবে এসব আশা যে তার কাছ থেকে করা যাবে তাও নয়। তবে গেল কোথায় সুশীলা?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ওই বাঁশির সুরের কথা। যোগেনের মার সম্মুখ থেকে আচমকা যেন একটা পর্দা সরে গেল। তারও একদিন বয়েস ছিল সুশীলার মতো। সেদিন বাঁশি বাজেনি বটে, কিন্তু বহু দূরদূরান্ত থেকে এমনি করেই যেন গানের সুর ভেসে আসতো। সেদিন সেও এরকম দরজা খুলে—

তড়াক করে উঠে বসল যোগেনের মা। আস্তে আস্তে উঠে এল বিছানা থেকে, স্বাভাবিক অনুমানবশেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলে যোগেনের ঘরের দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখানে তো নয়। ছেঁড়া লেপটা মুড়ি দিয়ে যোগেন পড়ে আছে, মাথার সামনে বুক জ্বলছে রেড়ীর তেলের প্রদীপটার, খোলা রয়েছে তার গানের খাতাখানা, দোয়াতের মধ্যে ডুবোনো রয়েছে কলমটা। কাল অনেক রাত পর্যন্ত লিখেছে যোগেন, অনেক রাত অবধি কানে এসেছে তার গুন্‌গুনানি। তার ঘরে তো আসেনি সুশীলা।

তবে? তবে কি সুরেনের এই কাজ? রাগে গায়ের ভেতর জ্বালা করে উঠল যোগেনের মার। সেই সঙ্গে বিস্ময়ও বোধ হল। বিয়ের আগে অবশ্য খুব খাঁটি ছিল না সুরেন, কিন্তু বিয়ে করবার পরে তো সে সব বদলে গেছে একেবারেই। দিনরাত চোটে-পাটে থাকে, বিব্রত আর বিরক্ত মুখে সংসারের বোঝাটা কাঁধে করে টেনে বেড়ায়, এসব ব্যাপারে মনোযোগ দেবার মতো

সময় তো তার আছে বলে বোধ হয় না। তবুও যদি নিজের শালীকে বাড়িতে এনে এ সমস্ত করবার দুর্বুদ্ধি তার হয়ে থাকে তা হলে তাকে ক্ষমা করা যাবে না। চেঁচিয়ে হাট বসিয়ে দেবে যোগেনের মা, ঝাঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে স্থরেনের। হোক সে বড় ছেলে, থাকুক তার অমন জাঁদরেল মেজাজ, এ কেলেঙ্কারীকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবেনা।

যোগেনের মা মনঃস্থির করে ফেলল। দাওয়ার কোন থেকে সংগ্রহ করে নিলে উঠোন ঝাঁট দেবার মুড়ো ঝাঁটাটা। তারপর সোজা এসে দাঁড়ালো স্থরেনের ঘরের সামনে।

ঘরের ঝাঁপ খোলা। ভেতরে হালকা হালকা অন্ধকার আর সে অন্ধকারে চামড়ার গন্ধ, জুতোর রঙের মিশ্র গন্ধ। বেড়ার ফাঁক দিয়ে আবছায়া ভোরের দুটি চারটি আলোর আভাস লেগে চিক চিক করে উঠছে স্থরেনের যন্ত্রপাতিগুলো। কিন্তু স্থরেনও যোগেনের মতো একাই ঘুমুচ্ছে, ঘুমুচ্ছে অঘোরে। তবে?

আর তাও তো বটে। কস্মিনকালে গলায় গান নেই স্থরেনের, বাঁশি বাজানো তো দূরের কথা। ঝোঁকের মাথায় ব্যাপারটা খেয়াল হয়নি, অবিচার করা হয়েছে স্থরেনের ওপর। কিন্তু গেল কোথায় স্থশীলা? নাকি সমস্তটাই ভুল বোঝা হয়েছে?

ঘরে ফিরে এসে আবার বিছানার দিকে তাকালো যোগেনের মা। না, স্থশীলা ফেরেনি এখনো।

তবে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়। এবং সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই কণামাত্রও। কিন্তু কে সে? কে হতে পারে?

পরের মেয়ে বাড়ীতে রেখে এ কেলেঙ্কারীকে কোনো মতেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। শেষে একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেলে অপযশটা তারই ছেলেদের মাথার ওপর এসে পড়বে। স্থতরাং গোড়াতেই এর মূলোচ্ছেদ করা দরকার।

বাড়ীর বাইরে এল যোগেনের মা। একটা স্বাভাবিক সংসারবশেই হাঁটতে

শুরু করল খিড়কির দিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। শুধু এক আধটা মোরগের ডাক ছাড়া পাখ্‌পাখালির সাড়া পর্যন্ত নেই কোনোখানে, শীতে যেন আচ্ছন্ন আর আড়ষ্ট হয়ে আছে। শুধু টুপটাপ করে শিশিরের ফোঁটা ঝরছে এদিকে ওদিকে, বাতাসে আমের মুকুলের গন্ধ।

এমন সময়ও নাকি ঘর থেকে বেরুতে পারে মানুষ!

কিন্তু ওই বাঁশি। ও বাঁশির নেশা আলাদা। কিছুতে ঠেকাতে পারে না, কোনো কিছুই বাগ মানাতে পারে না মনকে। যোগেনের গান মনে পড়ল : 'হাতে লিয়ে মোহন বাঁশী, কুলমান দিল্যা হে নাশি"—

কিন্তু কুলমান গেলে সেটা সুশীলার যাবে না, যাবে যোগেনের মার। ভাবতেই চড়াৎ করে মাথার ভেতরে ফুটে উঠল রক্ত। যোগেনের মা আবার হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলে ঝাঁটাটা। সুশীলাকে একবার ঠিক মতো ধরতে পারলে হয়। রেয়াত করা চলবেনা কুটুমের মেয়ে বলে। কড়া শাসন করতে হবে, নিজের ভালো ছেলেদের মাথায় অকারণ অপযশের বোঝা সে কোনোমতেই চাপতে দেবে না।

প্রখর শীত। বিদায় নিয়ে যাচ্ছে বলেই যেন রাশি রাশি ধারালো দাঁতে শেষ কামড় দিয়ে যাচ্ছে তার। ঠুক ঠুক করে কাঁপতে লাগল যোগেনের মা। কোথাও দেখা যাচ্ছে না মেয়েটাকে, পালালো কোথায়? অনর্থক আর শীতের মধ্যে কষ্ট করে খুঁজে লাভ নেই, ঘরেই ফিরে যাবে বরং। সুশীলা আসুক, তারপর না হয় দেখা যাবে কতখানি বুকের পাটা বেড়েছে হারামজাদা মেয়েটার।

ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে গেল যোগেনের মা। স্তব্ধ হয়ে কান খাড়া করল। বাতাসের শব্দ? ঘাসের মধ্যে নড়াচড়া করল কোনো জানোয়ার? না, মানুষই কথা কইছে, কথা কইছে ফিসফাস করে। কিন্তু কোত্থেকে আসছে শব্দটা?

একটু দূরেই ভাঙা একটা গোয়াল ঘর। কিছুদিন আগেও দুটো গোরু

ছিল যোগেনের মার, তারপর গো-মড়কে তুটোই মরল একসঙ্গে। সেই থেকেই ফাঁকা পড়ে আছে ঘরটা। গোরুর ঢের দাম আজকাল, কিছুদিন থেকে চেষ্টায়ও আছে স্বরেন, কিন্তু স্থবিধেমতো যোগাড় করতে পারেনি এখনো। সেই গোয়ালের ভেতর থেকেই কি আসছে না সন্দেহজনক শব্দটা ?

অনেক আগেই ঘরটাকে লক্ষ্য করা উচিত ছিল। যোগেনের মা নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ভাঙা বেড়ার কোনে, তারপর তাকিয়ে দেখল ঘরের ভেতরে। চোখের দৃষ্টিতে সন্ধানী তীক্ষ্নতা সঞ্চার করে পরিষ্কার দেখতে পেল সমস্ত।

স্তূপাকার পোয়ালের নরম বিছানার ওপরে কোনো অচেনা পুরুষের আলিঙ্গনে নিশ্চিন্তে এলিয়ে আছে স্থশীলা, কথা চলছে ফিসফাস শব্দে। তুহাতে স্থশীলার মুখখানি তুলে ধরে পুরুষটি—

এতক্ষণের ক্রুদ্ধ উত্তেজিত প্রস্তুতির পরে এবারে বিকট শব্দে ফেটে পড়ল যোগেনের মা। ধৈর্য এবং সহের শেষ সীমা তার পার হয়ে গেছে। যোগেনের মা গর্জন করে উঠল : হারামজাদী !

যেন বাজ পড়ল।

মুহূর্তের জন্যে নিথর হয়ে গেল আলিঙ্গনবদ্ধ যুগল মূর্তি। তারপরেই পুরুষের স্বাভাবিক প্রেরণাটা চলে এল একেবারে বিদ্যুতের চমকের মতো। এবং এক্ষেত্রেও তাই করল সে—ধাঁ করে লাফিয়ে উঠল, সোজা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। শুধু গ্রামের সদ্য-জাগা কুকুরগুলোর উত্তেজিত প্রতিবাদ তার পলায়নকে চিহ্নিত করতে লাগল।

স্থশীলাও উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে—চোখের দৃষ্টি তার মাটির দিকে।

যোগেনের মা আগুনভরা চোখে তাকাল তার সর্বাঙ্গে, আবার বললে, হারামজাদী !

সুশীলা জবাব দিলনা।

—কাক্ লিয়া মজা লুইটবা নাগিছিলু?

সুশীলা উত্তর দিলনা।

—কথা ক ছিনালী, কথা ক। কুন্ নাগরের কোলত্ শুতি আছিলু?

হঠাৎ চোখ তুলল সুশীলা। এতক্ষণে তারও দৃষ্টি ঝিকিয়ে উঠেছে। বললে, কহিমু না।

—কহিবু না? ছিনালপনা কইরবু, ফের চোপা দেখাছিস্ হামাক? ঝাঁটা মারি আজ তোর—

—ক্যানে?—ক্যানে মারিবা হামাক?—সুশীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: হামার খুশি, হামি যামু হামার নাগরের ঠাঁই। তুমার গায়ে ক্যানে জ্বালা ধরোছে?

—মুখ সামাল্, কহি দেছি তোক্।—রাগে আর শীতে যোগেনের মা যেন থর থর করে কাঁপতে লাগল: মুখ সামাল্। হামার ঘরত থাকি তুই—

—চলি যামু হামি তুমার ঘরত্ থাকি। হামি তুমার ব্যাটার বৌ নহো যে হামাক চোপা করিবা আসিছো।

—তো যা। যেইঠে মন চাহে চলি যা। হারামজাদী, ছিনাল, শ্যাষকালে—কদর্য ভাষায় একটা অবাঞ্ছিত সম্ভাবনার উল্লেখ করে যোগেনের মা বললে,- তখন কী হেবে?

—যা হেবে, সিটা হামার হেবে। তুমার অ্যাতে দরদ হৈল্ ক্যানে?—তীক্ষ্ণ চাপা গলায় সুশীলা বললে, আপনাক্ সামাল্ দিই রাখ আগত্, পিছে কথা কহিয়ো।

—কি কহিলু?—যোগেনের মা ঝাঁটা তুলে ধরল: আইজ তোক হামি—

দু পা সরে গেল সুশীলা। উগ্র কণ্ঠে বললে, মারিয়োনা হামাক, হামি কহি দেহি, মারিয়োনা।

—ক্যানে ? কিসের ডরত্ ?

—কিসের ডরত্ ?—সুশীলা মুখভঙ্গি করলে, ওঃ, ভারী সতী সাজোছেন আইজ। চ্যাংড়া বেলাত্ কত সতীপনা আছিল্ জানি হামরা।

মুহূর্তে হাত নেমে এল যোগেনের মার। চোখে ক্রোধের আগুন নিবে গিয়ে এক মুহূর্তে রাশি রাশি ভয় এসে আচ্ছন্ন করে দিলে দৃষ্টি। দুর্বল স্বরে যোগেনের মা জবাব দিলে, কী জানোস্ তুই ?

—সকলই জানো। বেশি ভালোমানুষী করিবা না নাগে। যৈবনের জ্বালা ধরিলে নাগর সকলেরই আসে, নিজের বুকত্ আগে হাত দিয়া ফের কথা কহিয়ো।

নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা বলতে হবে! যোগেনের মা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে পঁয়ত্রিশ বছর আগে চলে গেছে মন। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে স্নিগ্ধ অন্ধকার ছায়া-বেষ্টনী, মধু মাদকতায় ভরা অপরূপ রাত্রি।

শেষ চেষ্টা করে যোগেনের মা বললে, হামি কহিমু সুরেনকে।

—কহিয়ো, যাক খুশি কহিয়ো—

ঝটকা মেরে যোগেনের মার পাশ কাটিয়ে চলে গেল সুশীলা।

* * * *

কিন্তু কাউকে বলতে পারলনা যোগেনের মা। সুরেনকেও না, যোগেনকেও না।

আশ্চর্য আজকালকার মেয়েরা সব। লজ্জা-সরমের বালাই যে তাদের আছে এমন মনে হয়না। অসংকোচে হেঁটে বেড়াচ্ছে সুশীলা, বুক ফুলিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। সকালে এতবড় কাণ্ডটা যে হয়ে গেল বিন্দুমাত্র অপরাধ বোধ নেই সেজন্যে। অথচ তাদের দিন হলে—

. তাদের দিন। কত যত্নে, কত গোপনতার সঙ্গে পরম 'অতনের' (রতনের) মতো মনের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে হত। পাছে কেউ জানতে

পারে, কারো চোখে পড়ে। আঁচল চাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়েছে প্রাণের মাঝখানকার ধিকি ধিকি আগুনকে। সারা দিন কেটে গেছে তারই স্বপ্নে, সারাটা রাত তার দোলা ঢেউয়ের মতো এসে ভেঙে ভেঙে পড়েছে বুকের মধ্যে।

কিন্তু অনেকদিন পরে আজ কি আবার তেমনি করে দোলা লাগল তার? কেমন উড়ু উড়ু হয়ে উঠেছে মন, অনেকদিন পরে ঠাণ্ডা হয়ে আসা রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে একটা নিবিড় আর গভীর উত্তাপ। একদিন ছিল যেদিন চোখের দৃষ্টি এমন ঝাপসা হয়ে যায়নি, তার ডাগর ডাগর কালো চোখের দিকে তাকিয়ে মুচি-পাড়ার চ্যাংড়া আর জোয়ানদের বেভুল লেগে যেত। কাঁধ ছাড়িয়ে, পিঠ ছাপিয়ে নেমে আসত ঘন চুলের রাশ—লোকে বলত 'মেঘবন্ন'। রঙ ছিল কালোই, কিন্তু সে কালো রঙের ভেতর দিয়েও যেন তার রূপের জেল্লা ফুটে বেরুত। ভিন্ গাঁয়ের কোন্ একটা ছোকরা তাকে দেখলেই গান ধরত: 'কাল-নাগিনী মাইল্লে ছোবল, পরাণ জ্বলি যায় হে—'

কাল-নাগিনীই বটে। নাগিনীর মতোই উজ্জ্বল লতানে শরীর, সে শরীরে রূপের লহর বয়ে যেত তার। বাপের অবস্থা ছিল ভালো, হাট থেকে নানা রকম সখের শাড়ী কিনে আনত তার জন্যে। সেই শাড়ী পরে কোমর দুলিয়ে যখন সে চলত, তখন তার দিকে তাকিয়ে ভিন্-গাঁয়ের অচেনা মানুষগুলোও থমকে থেমে যেতো একবার, প্রশ্ন করত, ইটা কার বিটি হে?

তারপরে বিয়ে হল তার। টাকার জোরে সনাতনপুরের কেষ্ট মুচি বিয়ে করল তাকে। হাবা ভালো মানুষ লোক, তাড়ি খেত একটু বেশি পরিমাণে, আর নেশায় খানিক জোর ধরলেই তাকে জাপ্টে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করত। লোকটার প্রতি করুণা আছে তার, একধরণের দয়াও আছে। কিন্তু মন সে নিতে পারেনি, তা কেড়ে নিয়েছিল আর একজন।

দাওয়ায় বসে কলাই ঝাড়তে ঝাড়তে আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশ বছর বয়েসটা হঠাৎ একটা পাক খেয়ে ফিরে গেল পনেরো বছরে। এই স্বামীর

ভিটে, ছেলেরা আর ছেলেদের বৌরা, এই ভরপুর সংসার, হঠাৎ এর সব কিছু ছাড়িয়ে ভাবনাটা ফিরে চলে গেল পেছনে! সুশীলাকে শাসন করতে গিয়েছিল, কিন্তু পারল না। তার একটি কথায় পঞ্চান্ন বছরের হিসেবী-বুদ্ধিটা চলে গেল পনেরো বছরের ভয়-ভাবনাহীন ছেলে-মানুষিতে, সুশীলার মুখের আয়নায় যেন সে তার হারিয়ে যাওয়া মুখখানাকে আবার দেখতে পেল নতুন করে।

বাড়ির পেছনের পুকুরটা। ওখানে দুটি চারটি শাপলা পাতা, খানিকটা কলমী লতা লকলক করছে। এদিকের জল টলটলে নীল, ঝকঝকে পরিষ্কার। তাতে নিজের মুখও যেন দেখতে পাওয়া যায়।

ঝিমঝিম করছিল দুপুর। রোদ কাঁপছিল কাঠবাদাম গাছটার পাতায়, কাঁপছিল শান্তজলে। পুকুরের ঘাটলায় দাঁড়িয়ে সেই রোদে ভরা জলের দিকে তাকালো সরলা, দেখতে পেল নিজেকে। আর সেদিন যেন দেখতে পেল তার সর্বাঙ্গে ঢল ঢল করছে প্রথম যৌবন, আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে তার দেহের গড়ন। ঘাটলার নীচে, ঝিলমিলে জলের ভেতরে এই যার ছায়া পড়েছে সে যেন সরলা নয়, আর কেউ; তার মতো অমন রূপবতী কোনোদিন চোখে পড়েনি সরলার।

কতক্ষণ নিজেকে দেখেছিল সে জানেনা। রোদে আর বাতাসে মিলে যেন দিশেহারা করে দিয়েছিল তাকে, ওই দুলে ওঠা, ওই ঝিলমিল করা জলের ভেতরে দৃষ্টি স্থির রেখে দাঁড়িয়েছিল বিহ্বলের মতো। তারপর হঠাৎ গানের সুর এল কানে: 'কালনাগিনী মাইল্লে ছোবল, পরাণ জ্বলি যায় হে'—

ভিন্ গাঁয়ের সেই রসিক ছেলেটি। কখন এসে দাঁড়িয়েছে ঘন-পাতার ছায়ায় ভরা বাদাম গাছটার নীচে। সরলা চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। দিব্যি চেহারা মানুষটার, দিব্যি গানের গলা। ভারী মিষ্টি করে সে হাসল, হঠাৎ ফাগের গুঁড়োর মতো রক্তকণা ছড়িয়ে গেল মুখে।

—কথা কও কইন্যা, তাকাও হামার মুখের দিকে।

—ভারী অসভ্য মানুষ—লজ্জারুণ মুখে জবাব দিলে সরলা।

কিন্তু অসভ্য মানুষটি লজ্জা পেলনা, বরং এগিয়ে এল একটু একটু করে।

ঝিমঝিম দুপুর, ঝিলমিলে রোদ। রোদে আর বাতাসে মিলে কী যেন হয়ে গিয়েছিল সেদিন, কী যেন একটা ঘটে গিয়েছিল জলের ভেতরে সেই মেয়েটির আশ্চর্য রূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। মহিন্দর এল সরলার জীবনে, নিয়ে এল গান আর নিয়ে এল ভালোবাসা। আজ সুশীলা যেন সেই দিনটি তার কাছে ফিরিয়ে এনে দিলে।

—মা, পাঁচটা টাকা দিবা হেবে, চামড়া কিনিবা নাগে।

সুরেন এসে দাঁড়িয়েছে। লজ্জিত অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকালো যোগেনের মা, বয়েসের প্রভাবে শুকনো শীর্ণমুখে কী একটা ঝকমক করে খেলে গেল শুধু মুহূর্তের জন্যে। কবি যোগেন হয়তো লক্ষ্য করত, কিন্তু গদ্যময় সংসারী মানুষ সুরেন লক্ষ্য করলনা। সে কাজের লোক, অত সময় নেই তার।

—দেচ্ছে টাকা—একটু ইতস্তত করে যোগেনের মা বললে, একটা কথা কহিমু তোক্?

—কী?

—জমি লিয়ে ওই হুজ্জুতটা মিটাই ফ্যাল্ বাপ। একটা মানী মাইন্‌ষের সাথ—

কথাটা শেষ করবার আগেই সুরেন চেঁচিয়ে উঠল বিশ্রী গলায়।

—আঁ? ইটা তুমি কী কহিলা মা, আঁ?

যোগেনের মা ভীরু কণ্ঠে বললে, কহিছিনু—

—কিছু কহিবা হেবেনা তুমাক্! মানী লোক! ওঃ, অমন ঢের শালা মানীলোক দ্যাখেছি হামি। বে-আইনি করি হামার জমি কাঢ়ে লিবে আর আর সাথ হামি যামু মিটমাট করিবা। ত্যামন বাপের ছোয়া নহো হামি। তো হাইকোর্ট যিবা নাগে তো যামু হামি—ঘরবাড়ি বিক্‌কিরি করি চালামু মামলা। ইটা সাফ সাফ কহিনু—হঁ!

নতদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল যোগেনের মা।

সুরেন বলে চলল, শালা নাইবক্ হাত করি রাখিছে, গেন্থ তো হামাক আমলই দিলেনা। আইচ্ছা, হামিও কেষ্ট মুচির ব্যাটা। দেখি লিমু হামিও। মিট্‌মাট! মিটমাটের কথা কহিয়োনা, শালা হামার পায়ে ধরি পড়িলেও না।

দুপদাপ করে চলে গেল সুরেন। উত্তেজনার বশে ভুলে গেল চামড়া কেনবার জন্যে পাঁচটা টাকা নিতে এসেছিল মায়ের কাছ থেকে।

সুরেন বুঝবেনা, সুরেন কেষ্ট মুচির সন্তান। যে বুঝত সে যোগেন। সেদিনের গান আর সেদিনের ভালোবাসা যেন রূপ পেয়েছে যোগেনের মধ্যে, সরলার প্রাণের ভেতর থেকে, তার স্বপ্নের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে কবি যোগেন। কেষ্ট মুচির ব্যাটা হয়েও সে মহিন্দরের সন্তান—যে মহিন্দরের গানে একদিন সুশীলার মতোই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেত যোগেনের মা।

কিন্তু যোগেনও বুঝবেনা।

কান পাতল যোগেনের মা। ঘরের ভেতর থেকে ছেলের গানের সুর আসছে। কিন্তু কী এ গান?

প্যাটের জালায় জলি জলি গেলরে দিনমান।
কাঁদি কাঁদি জীবন যাবে, গরীবের নাই ভগমান।
বড়লোক রসের ঠাকুর,
মোরা হইনু পথের কুকুর
লাথি-জুতার বরাত করি সহি ক্যাতে অপমান,
কাঁদি ক্যানে ফুলাছ চোখ, গরীবের নাই ভগমান—

এ কোন্ গান? এর সঙ্গেও তো সেদিনের সুর মিলছেনা। সব আলাদা, সব আরেক রকম। শুধু একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায়, একটা অজানা সম্ভাবনায় মনের আকাশটা থমথম করছে।

তবু সুশীলার কথাটা বললে হত সুরেনকে। নাঃ, থাক। কী বলে বসবে

কে জানে। তার চাইতে পরের মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারা যায় সেই ভালো।

—টাকা পাঁচটা দিবা কি নাই ?—সুরেনের উত্তেজিত কণ্ঠ কানে এল।

—দেছে—

যোগেনের মা উঠে দাঁড়াল। আচমকা চোখে পড়ল উঠোনের ওপার থেকে কেমন অদ্ভুত কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সুশীলা। সে দৃষ্টির সঙ্গে মিল আছে সুরেনের ঔদ্ধত্যের, মিল আছে যোগেনের এই দুর্বোধ্য গানগুলোর। শুধু মিল নেই সেই বাদাম গাছটার ঘন ছায়ার আর মিল নেই রক্তে মাতলামি জাগানো সেই সব গভীর রাত্রির।

নতুন কাল এসেছে—সব নতুন। এদের সামনে দাঁড়ানো আর সম্ভব নয়, সুশীলার নয়, সুরেনের নয়, এমনকি যোগেনেরও নয়।

—তেরো—

—মা, মা—

একটা জোর হাঁক দিলে যোগেন ঃ মা, মা—

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অসীম বিরক্তি ভরে যোগেন আবার ডাকল ঃ কুন্‌ঠে গেইলা মা, মরিলা নাকি হে ?

—ক্যানে, এই সকালেই অ্যাত চেল্লাচিল্লি নাগাইলে ক্যানে নবাবের ছোয়া ? মার বোখার ধরিছে।—উত্তর এল সুরেনের।

—বোখার ?—যোগেনের চোখে মুখে ফুটে বেরল উৎকণ্ঠা ঃ ক্যানে, বোখার ধরিলে ক্যানে ?

—কও কথা—বোখার ধরিলে ক্যানে ?—সুরেনের স্বরে বিস্মিত ক্রোধ প্রকাশ পেল ঃ ইস্কুলে নিখি নিখি পাঁঠা হই গেলু নাকি তু ? বোখার ধরিছে —বোখার ধরিছে। ক্যানে ধরিছে উটা কি মানুষ কহিবা পারে ?

কিন্তু সুরেনের মন্তব্যের কোনো জবাব দিলে না যোগেন, কথা বাড়ালেই সুরেন গালাগালি আরম্ভ করে দেবে। দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল সে।

দাওয়ায় ময়লা চটের বিছানা। তার ওপরে একটা ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে হি হি কাঁপছে যোগেনের মা। কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁতে খট্‌ খট্‌ করে একটা শব্দ উঠছে, মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একটা অস্পষ্ট আকুতি। মাথার কাছে চুপ করে বসে আছে সুশীলা, কোনোরকম পরিচর্যা করছে বোধ হয়।

যোগেন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কদিন থেকেই কেমন বিস্বাদ-তিক্ত হয়ে আছে মনটা, মার এই জ্বরটা দেখে যেন আরো খারাপ লাগতে লাগল। হোক নিজের আত্মীয়, হোক একেবারে আপনার জন, কারো আধি ব্যাধি দেখলে বড় বিশ্রী লাগে যোগেনের। সহানুভূতি আসে না, করুণায় বিকল হয়ে ওঠে না মন। কেমন ভয় করে, কেমন ছমছমানি জাগে শরীরে। কারো অসুখ দেখলেই তার মনে হয়, কেন কে জানে মনে হয়, বাঁচবেনা। হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে যোগেনের, যেন দেখতে পায় তারও চারদিক ঘিরে ঘিরে মৃত্যুর একটা অপচ্ছায়া আসছে ঘনিয়ে।

—আইল্ বাপ ?—কম্পিত স্বরে মা বললে, বস্ এইঠে।

যোগেন বিস্বাদ মনে আসন নিলে।

—না, এইঠে আয়, হামার পাশে আয়—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের একেবারে কাছে গিয়ে বসল যোগেন—সুশীলার আঁচলের ছোঁয়া লাগল তার গায়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন কেমন সটকা মেরে উঠে দাঁড়ালো সুশীলা, তারপর সোজা ঘর থেকে চলে গেল বেরিয়ে।

কিছু একটা অনুমান যেন তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগালো যোগেনকে। হঠাৎ তার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল : হামাক দেখি অমন করি পালাছিস্ ক্যানে হারামজাদী ? হামি কি খাই ফেলিমু তোক ?—কিন্তু যা বলতে ইচ্ছে করে তাই বলা যায় না। গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল কি বেরুল না, দুটো ঝকঝকে চোখে যোগেন শুধু তাকিয়ে রইল সেদিকে।

—বাপ ?

মা ডাকছে। আস্তে আস্তে, স্নেহ ভরা গলায় ডাকছে : বাপ ?

—কী কহিবা ?—একটা নিশ্বাস ছেড়ে যোগেন জবাব দিলে।

—একটা কথা কহিমু তোক—কাঁপা গলার আওয়াজটা যেন মিনতির মতো শোনালো।

—কহো না—

মা একখানা হাত বার করল কাঁথার ভেতর থেকে, রাখল যোগেনের হাতে। জ্বরের তীব্র উত্তাপে শরীরটা যেন ছ্যাং করে উঠল যোগেনের। কী গরম, কী ভয়ানক গরম! যেন জ্বলন্ত আগুনের ছোঁয়াচ লেগেছে গায়ে। যোগেনের মনে হল মার হাতটা গায়ের থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত, যেন ওই হাতের ছোঁয়ায় সেও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

মা আস্তে আস্তে ছেলের হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

—হামি আর পারোছিনা যোগেন। বুঢ়া হই গেছি, শরীর ভাঙি গেইছে। কখন বা টপ করি মরি যাই। ইবার একটা বিহা দিমু তোর। আর ব্যাটাগুলানের বিহা দিয়া তো খুব সুখ হইছে হামার, তোর বউ আসি হামাক দেখাশুনা করিবে।

যোগেন উত্তর দিল না।

—তোর বউ হামি ঠিক করি ফেলছু। ইবারে আর বাগড়া না দিস বাপ।

যোগেনের মনে একটা নতুন চিন্তা তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। ধলাইয়ের সেই হাসি আর ছায়ার মতো সুশীলার সরে যাওয়া—এরপরে কি আগের মতো একেবারে একান্ত করে নিজের বলে ভাবা চলে সুশীলাকে? কিন্তু ক্রোধ আর বিতৃষ্ণার আক্ষেপে সেটা মনে জাগতে পরক্ষণেই একটা যন্ত্রণাবোধ এসে তাকে আচ্ছন্ন করে দিলে। না, না, এ ভাবা চলে না। এই পরম দুঃখকর সম্ভাবনাকে কোনোমতেই স্থান করে নিতে দেওয়া যাবেনা নিজের চিন্তাতে। হয়তো নিছক একটা যোগাযোগ, একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র। তার মন সন্দিগ্ধ বলেই একটা স্বাভাবিক সহজ ঘটনা তার চিন্তাটাকে বারে বারে ঘোলা করে তুলছে।

মার উত্তরটা জেনেও দুষ্টুমি করলে যোগেন। লঘুস্বরে বললে, কার বিটির কপাল পোড়াবা চাহোছ মা?

জ্বরের কাঁপা গলার মধ্যেও মার স্বরে রাগের আভাস পাওয়া গেল: কপাল

পুড়িবে ক্যানেরে? হামার এমন সোনার চাঁদ ব্যাটা—কপাল খুলি যিবে, সোনা-কপাল হেবে।

—তুমি সোনার চাঁদ কহিছ, আর মানুষে বান্দর কহে—কথাবার্তার স্বাভাবিকতার মধ্যে এসে মার অসুস্থতার কথাটা ভুলে যাচ্ছে যোগেন। গলায় তেমনি তরল কৌতুক সঞ্চারিত করে বললে, কিন্তু কার সোনা কপাল হছে সিটা তো কহিলে না।

মা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তর এল একটা।

—হাজারুর বিটি।

—হাজারুর বিটি!—যোগেন চমকে উঠল।

—হঁ—হঁ।—যোগেনের মা সন্ধানী একটা দৃষ্টি ছেলের মুখের ওপর ফেলল: ক্যানে, চিনিস নাই উয়াক? ওই গোরা মেইয়াটা—পদ্ম, পদ্ম। খাশা নাগিবে তোর পাশত্।

যোগেন স্তম্ভিতভাবে বসে রইল কিছুক্ষণ।

—কিন্তক্—

জ্বরের আবার একটা জোর ধমক এসেছে শরীরে। দাঁতে দাঁতে আবার শব্দ উঠেছে ঠক্ ঠক্ করে। যোগেনের হাতের ওপর মায়ের জ্বরতপ্ত হাতখানা কাঁপতে লাগল, শিহরণটা যেন বয়ে যেতে যেতে লাগল তার সর্বাঙ্গে।

—হামি বুঝিছু, তোর মনের কথাটা হামি বুঝিছু বাপ। কিন্তু সিটা হবা নহে।

যোগেন কথা বললে না। তাকিয়ে রইল। বেদনা, বিদ্রোহ আর বিস্মিত জিজ্ঞাসায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

—হবা নহে বাপ, হবা নহে। ওই পদ্মই ভালো বউ হেবে হামার ঘরে।

—হামি কিছু বুঝিবা না পাইনু মা।—প্রায় অস্পষ্টস্বরে কথাটা বললে যোগেন।

—ক্যামন করি বা কথাটা কহিমু তোক?—বেদনাসিক্ত কম্পিত গলায় যোগেন মা বললে, হামি কিছু কহিবা পারিমু না। ভুলি যা বাপ, ভুলি যা। পদ্মকু লিয়াই তুই সুখী হবু, ইটা কহি দিনু হামি।

যোগেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। মনের মধ্যে কুটিল সন্দেহের ছায়াভাসটা এবারে যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ একটা অবয়ব গ্রহণ করছে। পায়ের নীচে পৃথিবীতে দোলা লেগেছে হঠাৎ, মাথার মধ্যে সব যেন কেমন ফাঁপা ফাঁপা ঠেকছে। যোগেন উঠে পড়ল, নিজেকে বড় অসুস্থ মনে হচ্ছে তার, মনে হচ্ছে তারও বোধ হয় জ্বর আসবে।

*　　　*　　　*　　　*

বাড়ি থেকে দু পা বাড়িয়েছে যোগেন, সুরেন হাঁক দিলেন।

—অ্যাখেন ফের কুনঠে যাছু?

তিক্ত স্বরে যোগেন বললে, ক্যানে?

—কী কামে ফের? গান গাহিবা যাছ নাকি হে আলকাপওয়াল?—সুরেনের ক্রুদ্ধ গলার আওয়াজে শ্লেষের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

যোগেন বললে, খালি চিল্লাছ যে, দেখিছনা? মার জ্বর ধরিছে। ডাক্তারর ঠাঁই যানা নাগে।

সুরেনের স্বর নরম হয়ে এল।

—তা সিটা তো যিবা নাগে ঠিক। তো ম্যালোরিয়া হইছে, আপনি সারি যিবে। ডাক্তারের ঠাঁই গেলেই ফের পাইসা আর পাইসা। বোয়াল মাছের মতন হাঁ করে বসি আছে সব শালা, দিনভর গিলিবা চাহোছে।

—তো মা-টা জ্বর হই মরি যাউক? পাইসা লিই বউক গহনা করি দিয়ো তুমি—

গস্‌গস্ করতে করতে বেরিয়ে এল যোগেন।

ডাক্তারের কাছেই যেতে হবে। কিন্তু ডাক্তার নেই গ্রামে, আছে এক মুচি কবিরাজ—সোনারাম। একটা ঝুলি আছে সোনারামের, আর তার

ভেতরে আছে বিস্বাদ কতগুলো ছাতাপড়া কালো কালো বড়ি। জ্বর হোক, আমাশা হোক, এমনকি ওলাউঠা হোক, ওই এক বড়িই সোনারামের সম্বল। লাগে তুক, না লাগে তাক। তবু মাত্র দুগণ্ডা পয়সার বিনিময়েই তাকে পাওয়া যায় বলে তার ওপরে গ্রামের লোকের অখণ্ড বিশ্বাস। কিন্তু যোগেনের কিছুমাত্র আস্থা নেই সোনারাম সম্পর্কে। খানিকটা লেখাপড়া করেছে, ভূয়োদর্শী হয়েছে সহরে বেড়িয়ে, সুতরাং সে সোজাসুজিই বলে: উটা তো কবিরাজ নহে, যমের দূত।—রস দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলে: সোনারামের কামই হইল্, রুগীগুলার আত্মারাম সাবাড় করা।

অতএব যেতে হবে বামুনঘাটায়। সেটা ভদ্রলোকের গ্রাম। বড় গঞ্জ আছে, বাজার আছে, আর আছে সরকারী ডাক্তারখানা। সেখানে চারপয়সা দিয়ে টিকেট কিনলে ভালো বিলিতী ওষুধ মেলে। মাইল তিনেক রাস্তা অবশ্য হাঁটতে হবে,—তা হোক। যোগেন সরকারী ডাক্তারখানার উদ্দেশ্যেই দিলে পা চালিয়ে।

মার অসুখ একটা উপলক্ষ্য বটে, কিন্তু আদত কারণটা তাও নয়। আসল কথা, নিজের সমস্ত চিন্তার মধ্যে যেন একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে চলেছে যোগেনের। অমন করে কেন কথাটা বলল মা, কী এমন একটা ঘটেছে যার জন্যে কারণটা মা তাকে খুলে বলতে পারলনা? একটা তীব্র অস্থিরতায় যেন ছুটে বেরিয়ে পড়েছে যোগেন। মনে হয়েছে বাড়ির মধ্যে কোথাও এতটুকু বাতাস নেই, যেন তার দম আটকে আসছে, যেন কে তার গলাটা টিপে টিপে ধরতে চাইছে। সুশীলা, সুশীলা! যার রূপে সে বিভোর হয়ে মজে গেছে, যাকে নিয়ে সে বেঁধেছে তার সেই আকুল-করা গান:

"কইন্যা, ভমর জিনি লয়ন তোমার
উড়ি উড়ি যায় হে,
হামার বুকের ভিতর ফুল ফুটিলে
তাহার মধু খায় হে—"

সেই কন্যা বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তার সেই সোনার বরনী কেশবতী, যার মেঘের মতো চুলের মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে যোগেনের, ইচ্ছে করে নিশ্চিহ্ন, নিঃসত্তা হয়ে মিশে যেতে! অসম্ভব, এ হয়না। একথা ভাবতে গেলে যেন বুকের ভেতর থেকে শিকড়শুদ্ধ কী একটা উপড়ে আসতে চায়, মনে হয় সব কিছু ছিঁড়ে খুঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে।

তবে? আসল ঘটনাটা তা হলে কী? মার মত হঠাৎ বদলাল কেন? বেশি টাকা চেয়েছে সুশীলার বাপ? কিন্তু এমন কী বেশি টাকা? তিনরাত যদি ভালো করে আলকাপের আসর জমাতে পারে যোগেন, তবে কতক্ষণ সময় লাগবে ওই কটা টাকা সংগ্রহ করতে?

কিন্তু মার কথার ভঙ্গিতে তা তো মনে হয়না। কোন একটা আলাদা ব্যাপার আছে, আছে কোনো একটা নিগূঢ় অর্থ।

পথ চলতে চলতে যোগেন সজোরে একবার নিজের মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলে। থাকুক এর যা খুশি অর্থ, এর পেছনে নিহিত থাক একটা অজানা আশ্চর্য রহস্য। সে রহস্যকে উদ্ঘাটিত করবার জন্যে কোনো কৌতূহলই নেই যোগেনের। আজ এই সংশয়ের মেঘটা এসে মনের মধ্যে ছায়া ফেলেছে বলে এইটেই কি সত্য? সুশীলার কি আর কোন পরিচয় পায়নি সে কখনো? কত মুহূর্তে, কত অবসর-নির্জন মুহূর্তে কাছে এসেছে তার, লতিয়ে পড়েছে বুকের মধ্যে, সমস্ত চেতনা যেন আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যোগেনের। এমন একান্ত করে যে সুশীলা তার বুকের মধ্যে নিজেকে ধরে দিয়েছে, সে কি কখনো মিথ্যাচার করতে পারে, সেকি কখনো বঞ্চনা করতে পারে? তা যদি হয়, তা হলে দুনিয়াটাই যে একেবারে মিথ্যে হয়ে যায়।

—যোগেন নাকি হে? কুন্ঠে চলিলা?

ঢোল কাঁধে একটা রাক্ষুসে চেহারার লোক। মস্ত মাথাটায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মাঠের মতো চওড়া বুকে 'ইকৃড়ি' ঘাসের মতো কাঁচাপাকা রোমাবলীর সমারোহ। ঠোঁট দুটো পানের রসে টকটকে লাল। রসিক ঢোলওয়ালা।

রসিক বললে, কুন্ঠে চলিলা ?

—যামু বামুনঘাটা।

—অঃ।—রসিক পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে করে থেমে দাঁড়ালো শুইনন্থু আলকাপের দল করিছ তুমি ?

যোগেনের বিরক্তি লাগছিল। রসিককে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, কাকা বলে ডাকে। সুতরাং এড়িয়ে যাওয়া গেলনা। অপ্রসন্ন মুখে বললে, হঁ, কইম্নু তো।

রসিক বললে, বেশ, বেশ। হামাদের মুচির ঘরের দুইটা একটা ছোয়া ছেইল্যা গুনী হইলে তো সিটা ভালোই হয়। তো ফের শুইনন্থু দামড়ি গাঁয়ের ধলাই মুচিক্ দলে লিছ তুমি ?

—হঁ, লিছি—যোগেন জবাব দিলে। কিন্তু ধলাইয়ের নামটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল তার। পরক্ষণেই বললে, তো ছোড়ি দিন্থু উয়াক্।

রসিক বললে, বেশ করিছ, বড় ভালো কাম করিছ। উই কথাটা হামিও তুমহাক্ কহিমু মন করিছিন্থু। বড় বদমাস উশালা।

—বদমাস ?

—না তো কী ?—উত্তেজিত হয়ে রসিক বললে, হামার দলে তার ওই—একটা অশ্লীল বিশেষণ জুড়ে রসিক বলে চলল: বাঁশিটা লিই বাজাবা আসিছিল। তো ফের শালার ত্যাজ্ কত! রোজ আড়াই টাকা করি দিবার নাগিবে, তার মতন বাঁশি দুনিয়াত্ ক্যাহো কুনোদিন দেখে নাই! হামি শালাক্ খ্যাদাই দিন্থু।

—ভালোই করিলে—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সমর্থন জানালো যোগেন।

—অমন ছ্যাঁচোড় লিয়ে কাম করিবা হয়না, ফ্যাসাদে পড়িবা হয় ঝুটামুটা। —বিরক্তিভরে মন্তব্য করে এগিয়ে গেল রসিক। কিন্তু শুধুই কি ছ্যাঁচোড় লোক ধলাই ? রসিক জানেনা, কিন্তু যোগেন জানে। মর্মে মর্মে সে টের

পাচ্ছে কতবড় শয়তান ধলাই। শুধু পয়সার জন্যে নয়, সে এখন তার বুকে ছোবল মারবার চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে, এই মাঠের মধ্যে ধলাইকে পেলে যোগেন এখন তার রক্ত-দর্শন করে ছাড়ত।

কিন্তু থাকুক ধলাই, থাকুক তার কূট চক্রান্ত নিয়ে। মা নিষেধ করুক, তাড়ি খেয়ে প্রাণপণে চ্যাচাতে থাকুক সুরেন, কিন্তু যোগেন কোনোমতেই ভুলতে পারবেনা সুশীলাকে, কোনোমতেই তার প্রত্যাশা ছাড়তে পারবেনা। পৃথিবী একদিকে থাকুক, আর একদিকে থাকবে সুশীলা। বংশী মাষ্টারের গান তার চাইনা, কবি-যশেও তার দরকার নেই, সুশীলাকে পেলেই জীবনের সব পাওনা তার মিটে যাবে। নতুন গান আসবে, নতুন সুর আসবে, যদি কিছু ভেঙে চুরেই যায়, ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে তার চাইতে অনেক গুণে বেশি। তার সমস্ত মন-প্রাণ ভরে নতুন গানের উৎসব শুরু হয়ে যাবে।

অসুস্থ পা আর অসুস্থ মন নিয়ে যোগেন পৌছুল বামুনঘাটায়। বেশ বেলা বেড়েছে তখন, শীতের শীতলতা কেটে গিয়ে পায়ের নীচে গরম হয়ে উঠেছে বালি। ডাক্তারখানা তখন জমজমাট। ডাক্তার প্রিয়তোষ সেন নিশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছেন না। ঘস্ ঘস্ করে লিখছেন প্রেস্‌ক্রীপশন আর এক একজন করে রোগীর আদ্যশ্রাদ্ধ চলছে।

—কাল কবার ওষুধ খেয়েছিস?

—আজ্ঞে তিনবার।

—তা হলে আরো তিনদাগ তো আছে।

—আইজ্ঞা না।—রোগী বিনীতভাবে হাসল: সব ফুরাই গেইল্‌ছে।

—সব ফুরাই গেইল্‌ছে?—ডাক্তার প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন: বলিস্ কিরে ব্যাটা! অতগুলো ওষুধ একসঙ্গে!

—হেঁ—হেঁ—আমি ভাবিনু—

—ভাবলে, একসঙ্গে খেলেই রোগ মুক্তি? আরে হতভাগা, ওতে করে

দেহমুক্তি ঘটে যাবে যে! আচ্ছা ইডিয়ট্ নিয়ে পড়া গেছে সব। দাঁড়া, দাঁড়া, এখন সরে দাঁড়া।—হ্যাঁ, রহিম বিশ্বাস?

—জী।

—কদিন জ্বর তোর বিবির?

—জী তা হৈল্ পাঁচ সাতদিন।

—পাঁচ সাতদিন!—হাতের কলমটা নামিয়ে ডাক্তার গর্জে উঠলেন: এতদিন তবে করছিলে কী? হাঁ করে বসেছিলে? এখন আর কী করা যাবে, যাও ঠ্যাং ধরে ভাগাড়ে ফেলে দাও গে।

চিকিৎসার নমুনা দেখে যোগেনের যেমন অস্বস্তি, তেমনি বিশ্রী লাগতে লাগল। ঘৃণা আর বিরক্তিতে কালো ডাক্তারের মুখ, অত্যন্ত অনিচ্ছা আর অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে রোগী দেখছেন আর 'টিকিট' লিখছেন। না আছে সহানুভূতি, না আছে যত্ন। অনুগ্রহের দান ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, হাজার গালাগালি খেয়েও কৃতার্থমুখে মেনে নিচ্ছে মানুষগুলো। হঠাৎ মনে হল এর চাইতে তাদের সোনারাম কবিরাজও ভালো। তাদের সে আপনার মানুষ, তাদের জীবনের সঙ্গে তার যোগ আছে।

বংশী মাষ্টারের কথাই ঠিক। এই যে মানুষগুলো এখানে এক ফোঁটা ওষুধের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে—এরাই যোগেনের দেশের লোক, তার জাতি-গোত্র। ব্রাহ্মণ, জমিদার আর নায়েবের কাছ থেকে তারা যা পায়, এখানেও ঠিক তাইই পাচ্ছে। কোনো পার্থক্য নেই, কোনো ব্যতিক্রম নেই। সরকারী ডাক্তারখানা, গরীবকে ওষুধ দেবার জন্যেই খোলা হয়েছে। গরীব কতটুকু ওষুধ পায় কে জানে, কিন্তু যা পায় তা অপমান, তা লাঞ্ছনা। ঠিক কথা। ভদ্রলোকেরা আলাদা জাতের। তেলেজলে যেমন মিশ খায় না তেমনি ভদ্রলোকের সঙ্গেও তাদের মিল ঘটবে না কোনোদিন।

একপাশে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে যোগেনের ইচ্ছে করতে লাগল উঠে চলে যায়। এর চেয়ে তাদের সোনারাম কবিরাজই ভালো। কিন্তু উঠতে

পারল না। তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছে আর মায়ের অসুখটাও কেমন বাঁকা ধরণের। বিরক্ত বিব্রত মুখে যোগেন বসে রইল।

হঠাৎ ডাক্তারের চোখ গেল সেদিকে।

—ওহে, ওহে, শোনো তো।

ডাকের মধ্যে একটা সাগ্রহ অভ্যর্থনা আছে। যোগেনের বিস্ময় বোধ হল। এতক্ষণ ধরে ডাক্তারের যে কণ্ঠস্বর সে শুনছিল আর দেখছিল যে বিকট মুখভঙ্গি, তার সঙ্গে সুস্পষ্ট একটা পার্থক্য আছে এর। হঠাৎ তাকে এমন সমাদর করবার অর্থটা কী?

—হামাক ডাকোছেন?

—হাঁ, তোমাকেই তো।

যোগেন সভয়ে এগিয়ে গেল।

—সর সর, ওকে আসতে দে—ডাক্তার আশপাশের লোকগুলোকে ধমক দিলেন। ভীত বিস্ময়ে দুপাশে সরে গেল মানুষগুলো, যোগেনকে পথ করে দিলে, তাকালো ঈর্ষ্যাক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে।

—তুমি সনাতনপুরের যোগেন কবিওয়ালা না?

—হঁ। হামাক্ আপনি চিনেন?

—কেন চিনব না, তুমি যে স্বনামধন্য লোক। রায়হাটের মেলায় তোমার গান শুনেছি আমি।—ডাক্তার যেন যোগেনকে বাধিত করবার চেষ্টা করলেন: খাসা গলা তোমার। তারপর, কী মনে করে?

—হামার মার জ্বর ধরিছে কাইল থাকি, তাই—

—কী রকম জ্বর? কম্প দিয়ে?

—হঁ।

—ম্যালেরিয়া—কিচ্ছু ভাবনা নেই। চারটে পয়সা দাও—ডাক্তার খস্ খস্ করে একটা টিকেট লিখে ফেললেন: এইটে নিয়ে একবার কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে যাও, ওষুধ দিয়ে দেবে। শিশি আছে তো?

—হুঁ, আছে।

—তবে ওষুধ নিয়ে এসো। আর শোনো, যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। তোমাকে দিয়ে একটা দরকার আছে আমার—বুঝলে ?

—বুঝিনু—

টিকেট নিয়ে যোগেন ওষুধের সন্ধানে এসে দাঁড়ালো কম্পাউণ্ডিং রুমের সামনে। কিন্তু খটকা ধরেছে মনে। ব্যাপারটা কী ? তাকে দিয়ে কোন প্রয়োজন মিটতে পারে ডাক্তারের ? এই ভদ্রবাবুর কী দরকারে সে লাগবে ? কেমন সন্দেহ হয়। বংশী মাষ্টার বিশ্রী রকমের খটকা বাধিয়ে দিয়েছে একটা। ভদ্রলোকদের অত্যাচারটা চেনা, সেটা ধাতস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মিঠে কথা আরো মারাত্মক—মনে হয় যেন ফাঁদ পাতছে কিছু একটা মতলবে।

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর মিলতে বেশি দেরী হল না।

বেলা এগারোটা বাজতে কলম ফেলে ডাক্তার উঠলেন। রোগীর ভিড় তখনো আছে। ডাক্তার বিরক্তিভরে বললেন, সময় হয়ে গেছে, এখন আর নয়। আবার বিকেলে।

—ঢের দূর ঘাঁটা (রাস্তা) ভাঙি আইনু বাবু—মিনতি করলে একজন।

—তুমি ঢের ঘাঁটা ভেঙে এসেছ বললেই চলবে না বাপু, সরকারী আইন তো আছে। যাও, যাও, এখন আর গণ্ডগোল পাকিয়ো না। এসো যোগেন, এসো আমার সঙ্গে।

—কুন্ঠে যামু ডাক্তার বাবু ?

—আমার বাড়িত্।

—বাড়িতে ?

—হ্যাঁ, আমার মেয়ে জামাই এসেছে। জামাই আবার কল্‌কাতার মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক। সে এদিককার গানটান শুনতে চায়, বই লিখবে। তাকেই তোমার গান শোনাব, বুঝলে ?

—কিন্তু—যোগেন বিব্রত স্বরে বললে, বাড়িত্‌ হামার মায়ের ব্যারাম বাবু, দেরী করিলে—

—কিছু না, ম্যালেরিয়া জ্বর, ওই ওষুধেই ঠিক হয়ে যাবে। এসো—ডাক্তার ডাকলেন।

একান্ত অনিচ্ছা আর মনের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদ নিয়ে ডাক্তারকে অনুসরণ করলে যোগেন। আর যাই হোক, গান গাইবার মতো এখন মানসিক প্রস্তুতি নেই তার। সুশীলা, ধলাই, মা, বংশী মাস্টার—সকলে মিলে যেন তার চিন্তাকে তোলাপাড়া করছে। তাছাড়া ডাক্তার তার গানের যতই প্রশংসা করুক না কেন, মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি যোগেন। চোখের সামনেই সে ডাক্তারের আর একটা চেহারা দেখতে পেয়েছে, অনুভব করেছে ডাক্তারের সঙ্গে তাদের সীমারেখাটা কত স্পষ্ট! যোগেন বলতে যাচ্ছিল, তুমার জামাইক্‌ গান শুনাইবার জন্য হামি গাহি না—কিন্তু কথাটা আটকে গেল। ভদ্রবাবুদের ওপর যত প্রতিবাদই জেগে উঠুক মনের ভেতর, তাকে ঘোষণা করবার মতো জোর এখনো তাদের আয়ত্ত হয়নি।

ডাক্তারের কোয়ার্টার ডাক্তারখানার কাছেই। একতলা বাড়ি, সামনে চওড়া বারান্দা। সেই বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছেন ডাক্তারের জামাই। ফর্সা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, চোখে সোনার চশমা। ডাক্তার বললেন, রামেন্দু, এই হল এদেশের একজন কবি। এর নাম যোগেন, বড় ভালো গান গায়।

—তাই নাকি?—রামেন্দু অনুগ্রহের হাসি হাসল। শহরের হাসি, ভদ্রলোকদের হাসি। কিন্তু সে হাসিতে যোগেন চরিতার্থ বোধ করল না, গা জ্বালা করে উঠল।

রামেন্দু বললে, আমি থীসিস্‌ দেব, লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করছি। বুঝেছ?

যোগেন বললে, আইজ্ঞা না।

ডাক্তার একটা চেয়ারে আসন নিয়েছেন ততক্ষণে। জামাইয়ের অনুকরণে তিনিও হাসলেন এইবারে: ওসব ওরা বুঝবে না। বুঝলে যোগেন, তোমার গান নিয়ে ও বই লিখবে, তোমার গান ছাপা হবে বইতে। বুঝলে এইবার?

—হুঁ—মুখ গোঁজ করে জবাব দিলে যোগেন। অপমান বোধ হচ্ছে, কান জ্বালা করছে। এর ভেতরেও একটা দয়ার ইঙ্গিত, একটা অনুকম্পার ব্যঞ্জনা। তার গান নিয়ে বই লিখবে শহরের এই ফিন্‌ফিনে বাবু রামেন্দু। কিন্তু রামেন্দু কি বুঝবে এ গান শুধু গানই নয়? এ তাদের প্রাণের জ্বালা, এ তাদের বুকের যন্ত্রণা?

—কই, শোনাও দেখি এক আধটা গান—রামেন্দু সাগ্রহে বললে।

—কী গান গাহিমু?—বিস্বাদ মুখে প্রশ্ন করলে যোগেন।

—আলকাপের গান, রসের গান।—ডাক্তার জবাব দিলেন।

—রসের গান আর গাহি না বাবু, রস মরি গেইছে।—শুষ্ক প্রত্যুত্তর দিলে যোগেন।

—তবে কী গান গাও?

—যে গান গাই সি আপনাদের ভালো নাগিবেনা বাবু। আইজ ঢের বেলা চড়ি গেইছে, হামি যাছু—

রামেন্দু ব্যস্ত হয়ে বললে, আরে না, না, ভালো লাগবে না কেন! সবই ভালো লাগবে। গান ধরো তুমি।

—যন্তরপাতি কিছু নাই—

—দরকার নেই, ওতেই হবে।

যোগেন একটা আগ্নেয় দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে চারদিকে। আশ্চর্য! তিন মাইল পথ ভেঙে সে এসেছে। এত বেলা হয়েছে, এখনো এক ফোঁটা জলও তার পেটে পড়েনি। বাড়িতে তার মায়ের অসুখ, এখন কেমন আছে কে জানে। অথচ এতটুকু বিচার নেই এদের, একবিন্দু বিবেচনা নেই।

কৌতুক-প্রফুল্ল মুখে, ভরা পেটে আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বসেছে চেয়ারে, তার গান শুনবে, আমোদ করবে রসের গান নিয়ে।

যোগেনের গলা চিরে একটা তীব্র স্থর বেরুল। বোধ হল যেন আর্তনাদ!

ক্ষীর সন্দেশ খাও বাবুরা—
মোণ্ডা মিঠাই খাও,
হামরা পুড়ি প্যাটের জালায়
তুমরা মজা পাও!

রামেন্দু চেয়ারের ওপর চমকে উঠল, নড়েচড়ে বসলেন ডাক্তার। দুজনের মুখে যেন শ্রাবণের মেঘ এল থমথমে হয়ে। আর যোগেন গেয়ে চলল তেমনি একটা অসহ্য আর্তনাদের স্থরে :

কাহারো হইলে পৌষ মাস,
অন্যের হয় সর্বনাশ,
সুখের পাখি নি জানে হায়
পোড়া ছ্যাশের ভাও,
ক্ষীর সন্দেশ খাও বাবুরা—

নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে উঠে চলে গেল রামেন্দু। ডাক্তার বললেন, থাক। আর গাইতে হবে না যোগেন।

হিংস্র একটা হাসির সঙ্গে যোগেন বললে, গান ভালো নাগিলে বাবু? মৌজ নাগিলে তো?

ডাক্তার বললেন, হুঁ।

—জামাই বাবুর বইয়ে ত হামার গান ছাপা হেবে বাবু!

—জানি না। এখন তুমি এসো যোগেন।

যোগেন ডাক্তারের দিকে তাকালো, ডাক্তার তার দিকে তাকালেন। মাত্র মুহূর্তের জন্যে। তারপর আশ্চর্য শান্ত স্বরে যোগেন বললে, একটু জল খিলাইবা বাবু? বড় তিয়াস নাগিছে।

—আচ্ছা, আনাচ্ছি। ওরে, কেউ জল নিয়ে আয়তো এক ঘটি—

জল এল। নিয়ে এল আঠারো উনিশ বছরের একটি সুদর্শনা তরুণী। ডাক্তারের মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে চলে গেল যোগেনের চোখ, মেয়েটির মুখের ওপর গিয়ে আটকে রইল রূপমুগ্ধ দৃষ্টি। স্নিগ্ধ স্বরে মেয়েটি বললে, জল নাও।

জল নাও। কথাটা যেন গানের মতো সুন্দর লাগল কানে। হঠাৎ যেন চটকা ভেঙে গেল যোগেনের। মনে হল তার এতক্ষণের উত্তাপটা ওই কণ্ঠস্বরে যেন শান্ত হয়ে গেল, মিটে গেল এতক্ষণে বুকের মধ্যে ক্রুদ্ধ তৃষ্ণার দুঃসহ জ্বালাটা। যোগেন তাকিয়েই রইল। এখানে এই মেয়েটি যেন অপ্রত্যাশিত—যেন অস্বাভাবিক।

ডাক্তার হঠাৎ গর্জে উঠলেন। ভেঙে পড়লেন বাজের আওয়াজের মতো।

—হাতে জল ঢেলে দে ওর। ও ব্যাটা মুচি, ঘটি ছোঁবে কেমন করে?

—মুচি?—মেয়েটি এগিয়ে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল তিন পা।

আর পিছিয়ে গেল যোগেনও। তীব্র গলায় বললে, ভদ্দর নোকের ছোঁয়া জল হামরা খাইনা বাবু, জাতি যায়,—তার পরেই সোজা উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলে।

পেছন থেকে ডাক্তারের একটা শাসানি ভেসে এল সাপের তর্জনের মতো: বড় বাড় বেড়েছে এই ছোট লোকগুলোর, হারামজাদারা মরবে এইবারে—

—চৌদ্দ—

ট্যাং ট্যাং করে কাঁসর বাজছে, ডুম ডুম করে বাজছে ঢোল। সুবলের গড়া সরস্বতী শোভা পাচ্ছেন সগৌরবে। মূর্তির যা চেহারা হয়েছে, তাতে সরস্বতী বলে ঠাওর করা শক্ত। একটা জিনিষ সুবল বর্মণ খুব নিষ্ঠাভরেই করেছে—সেটা হচ্ছে দেবীকে মেমসাহেব বানিয়ে তোলা। তার সঙ্গে নাকে একটি নথ জুড়ে দিয়ে মেমসাহেবকে খানিকটা ঘরোয়া করে তোলার চেষ্টাও হয়েছে। হাতের বীণাটি দেখে মনে হচ্ছে দেবী একটি গদা নিয়ে বসে আছেন, প্রতিপক্ষ কেউ সামনে এলেই গদাযুদ্ধ আরম্ভ করে দেবেন।

তা হোক, তাতে ভক্তির কমতি হয় না লোকের। ধূপের ধোঁয়াতে চারদিক প্রায় অন্ধকার করে তুলেছে। প্রাইমারী ইস্কুলের পোড়োরা সাজিয়ে দিয়েছে তাদের শিশুপাঠ আর নব ধারাপাত, গলায় দড়ি বাঁধা দোয়াতে দোয়াতে খাগের কলম আর দুধ। রাশি রাশি পলাশ ফুলে প্রতিমার প্রায় আধখানা ঢাকা পড়ে গেছে।

দুদিন থেকে প্রচুর পরিশ্রমের ফলে পূজো নির্বিঘ্নে শেষ করেছে বংশী মাষ্টার। পূজো করেছে সে নিজেই—মন্ত্রতন্ত্র কী যে পড়েছে ভগবানই তা জানেন। কিন্তু পূজো হয়েছে—প্রসাদ বণ্টনও শেষ হয়ে গেছে। তার সব্‌জী বাগানে অবশিষ্ট কপি মূলো যা কিছু ছিল তাই দিয়ে তরকারী রান্না হয়েছে, রান্না হয়েছে খিচুড়ি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে পূজো দেখেছে মহিন্দর আর তার দলবল। রসিকতাও করেছে নিজেদের মধ্যে।

—ইটা ক্যামন দেবতা হে, মাছ মাংস খায় না!

—বৈষ্টম দেবতা।

—ই সব দেবতার পর্‌সাদ খাই হ্যামাদের প্যাট নি ভরে।

—হামাদের ভালো দেবতা হৈল্ কালী আর বিষহরী। পাঁঠা মারো, তাড়ি লি আইস, তো পূজা। ফুরতি না হেবে তো ক্যামন পূজা সিটা!

—ইসব চ্যাংড়া প্যাংড়ার পূজা—ইস্কুলের ছোয়া পোয়ার। হামাদের ভক্তি হয় না।

—হেবে, হেবে—তুমহাদেরও ভক্তি হেবে—কথাবার্তার গতিক লক্ষ্য করে আশ্বাস দিয়েছে মহিন্দর: বড় একটা খাসি কাটিছু, তাড়িও আসোছে।

—তো সিটা আগে কহিবা হয়। অ্যাতক্ষণ প্যাটে চাপি রাখিছিলা ক্যানে?

হাসির রোল উঠল একটা, স্বস্তির নিশ্বাসও পড়ল। সত্যি কথা, এসব নিরামিষাশী উঁচুদরের দেবতা সম্পর্কে কোনো মোহ নেই ওদের। ওদের কাছে যাঁরা প্রত্যক্ষ—তাঁদের প্রকাশ অতি বাস্তব এবং অতি উদগ্র। শিক্ষার মূল্য ওদের কাছে যেমন নগণ্য, শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শুভ্র জ্ঞানপদ্মে কিরণোজ্জ্বল আবির্ভাবের অলৌকিক আনন্দটাও তেমনিই অবাস্তব। ওদের দেবতারা আসেন কলেরার সর্বগ্রাসিনী কোপনা মূর্তিতে, দেখা দেন বসন্তের নিশ্চিত নিষ্ঠুর মহামারীতে। ওদের দেবতা পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে লুকিয়ে থাকেন উদ্যত ফণা তুলে ছোবল মারবার জন্যে। আর ওদের দেবতা আছেন ক্ষেত্রপাল, যিনি মঙ্গল হস্ত বুলিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ফলিয়ে তোলেন সোনার ফসল,—যাঁর কুপিত দৃষ্টি পড়লে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের ওপর আকালের মৃত্যুছায়া বিকীর্ণ হয়ে পড়ে।

এইসব উগ্র দেবতাদের উগ্রভাবেই প্রসন্ন করবার ব্যবস্থা। মদ, মাংস

মাতামাতি। বৈষ্ণবী ব্রাহ্মণী দেবীর আতপ চাল আর নিরামিষ ভোজন ভট্টাচার্য-পাড়ার মতোই ওদের দৃষ্টি আর স্পর্শসীমার বাইরে, বৈদেশিক এবং অপরিচিত।

সুতরাং খাসি আর তাড়ির নামে রসনাগুলো সরস হয়ে উঠেছে, প্রসন্ন হয়ে গেছে মন। সেই নৃত্য-পরায়ণ রাসু আনন্দে নেচে নিয়েছে একবার: জয় মা সরস্সতী!

চিরাচরিতভাবে একটা ধমক দিয়েছে মহিন্দর: থামো হে, বুঢ়া বয়সে অমন নাচিবা ন হয়। কোমরত্ বাত ধরি যিবে।

রাসু চটে গিয়ে বলেছে, তুমহার মতো অমন বুঢ়া হই নাই, মনে এখনও ফুরতি আছে হে, বুঝিলা? পূজা পরবে নাচিমু না তো ফের নাচিমু কখন?

—তো নাচো। কিন্তু মাজা ভাঙিলে মজাটা টের পিবা।

ভারী প্রসন্ন মহিন্দরের মন। মানী লোক মহিন্দর—তারই উদ্যোগে এই পূজো। কিন্তু শুধু মানী লোক বলেই নয়—আর একটা নিবিড় অন্তর্নিহিত গর্বের অনুভূতিও তাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের সরস্বতী পূজোর কথা শুনে চট্টরাজ কুকুরের মতো কতকগুলো উঁচু উঁচু দাঁত বের করে হেসেছে বিশ্রীভাবে, বলেছে, অ্যাঁ—চামারে করবে সরস্বতী পূজো! একেবারে বিদ্যের ভাণ্ডার লুঠ করে নিয়ে মনু-পরাশর-বেদব্যাস হয়ে উঠবে। ওরে শালারা, যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। ও সব বুদ্ধি ছাড়। ছোটলোক, জুতোর তলায় থাকিস্, জুতো সেলাই করে খাস। এ সব না করে এক পাটি জুতোকে পূজো কর, ওতেই তোদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বলে সে কি হাসি চট্টরাজের! জীবনে এই প্রথম, নিষ্ঠুর অপমানের বিষাক্ত খোঁচার মত সে হাসিটা এসে বেজেছে মহিন্দরের বুকে। এই প্রথম প্রশ্ন জেগেছে—এ অপমান কি একান্তই প্রাপ্য, এর কোনো প্রতীকার নেই?

ওখানেই থামেনি চট্টরাজ। তেমনি হাসতে হাসতে বলেছে, আবার

জুটেছে একটা নাপিত মাষ্টার, সে ব্যাটা করবে পূজো! ব্যাটা নর্মাল পর্যন্ত পড়েনি, সে উচ্চারণ করবে সংস্কৃতের মন্তর! দম ফেটে যাবে যে। কালে কালে কতই দেখব। ওরে শালারা, ওসব না করে অক্ষয় পুণ্য অর্জন কর, বেশ করে বামুনের পা টেপ দেখি—বলে কাঁকলাশের মত সরু সরু ঠ্যাং দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে ওদের দিকে। কেন কে জানে জল এসেছে মহিন্দরের চোখে, মনে হয়েছে জুতো মেরে একটা টাকা দিলেই অপমানের উপশম হয় না। তারা পা টিপে দিচ্ছে, টেপাটা শেষ হয়ে গেলে নদীতে স্নান করে চামারের স্পর্শ-দোষ থেকে মুক্ত হবে চট্টরাজ। আর রাত্তিরে তার ঘরে যে ডোমের মেয়েটা আসে, তার খবরই বা কে না জানে? এই হল ব্রাহ্মণত্ব।

তাই রোখের মাথায় পূজো করেছে মহিন্দর, মানী লোক শ্রীমহিন্দর রুইদাস এই প্রথম জানাতে চেয়েছে অপমানিত মনুষ্যত্বের একটা মৃদু প্রতিবাদ।

জ্বলজ্বলে চোখে মহিন্দর স্থির-দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণী দেবীর দিকে তাকিয়ে রইল।

রাসু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, রাত্তিরে গান হেবে কহিলা না?

—সিতো হেবে।

কী গান হেবে? সমস্বরে প্রশ্ন হল। মহিন্দর বললে, আলকাপ।

—কে গাহিবে?

—সিটা কহিবা পারি না।

বংশী মাষ্টার যাচ্ছিল সুমুখ দিয়ে, ওরা গিয়ে ধরল তাকে: মাষ্টার হে, ও মাষ্টার?

—কী বলছ?

—গান কে গাহিবে? কার দল? কখন আসিবে?

—রাত্রে দেখতে পাবে—রহস্যময়ভাবে হেসে বংশী মাষ্টার চলে গেল।

বেলা পড়ে এসেছে, বিকেলের ছায়া নামছে চারদিকে। অত্যন্ত ক্লান্তভাবে নিজের ঘরের বাঁশের মাচাটায় এসে বসল বংশী। নাঃ—এ নয়। কী হবে এসব করে? যেখানে সমস্ত দেশ ব্যাধিতে আর অসম্মানে জর্জরিত,

সেখানে কী এর দাম? আরো বড় কিছু করতে হবে। কিন্তু সে ভাষা জানা নেই বংশী মাষ্টারের, সে ভাষা তাকে শেখায়নি অতুল মজুমদার। একমাত্র ভরসা যোগেন। তার একটুকরো সব্‌জী ক্ষেতের মতো তার ভাবনার প্রথম ফসল যার প্রাণের মধ্যে সে ফলিয়ে তুলতে পেরেছে। অতুল মজুমদাররা যা পারল না, তা পারবে যোগেনরাই। তারা কবি, তারা শিল্পী, তারা চারণ, তারা বৈতালিক।

কিন্তু তার নিজের? নিজের দিক থেকে কতটুকু সে করতে পারল? এই কি শান্তির কাছে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা? এইখানেই কি দায়িত্ব শেষ, কর্তব্যের পরিসমাপ্তি?

বাইরে আনন্দিত কোলাহল, ঢোল আর কাঁসর বাজছে। কিন্তু এখনো কেন এল না যোগেনের দল? সন্ধ্যার পরেই গান আরম্ভ হওয়ার কথা—একটা খবরও তো পাওয়া গেল না।

বংশী চিন্তিত অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বেলা ডুবে আসছে, টকটকে লাল আকাশ যেন রক্ত দিয়ে মাখানো।

...বাইরে মহিন্দরের দল বসেছে তাড়ি আর মাংস নিয়ে। এমন সময় খবর দিলে একটা লোক এসে। চোখে তার আতঙ্ক আর কৌতূহলের ছায়া।

—কে, মহিন্দর?

—ক্যানে ডাকোছ?

—কাছারীতে নায়েব আর দারোগা পুলিশ লিই আসোছে।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ। এই আসিলে। তুমহাক ডাকি পাঠাছে।

—কী কহিছ তুমি? মহিন্দরের জিভ শুকিয়ে উঠেছে—চোখ উঠেছে কপালে: ক্যানে?

—কে জানে।

মহিন্দরের মাংস গলায় গিয়ে আটকালো, নাক দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে বেরিয়ে আসতে চাইল তাড়ির ঝাঁঝ। উঠে পড়ে বললে, চলো।

কানাঘুষোয় কথাটা বংশী মাষ্টারেরও কানে গেল।

* * *

যোগেন আসত না। শিল্পী চেয়েছিল নিজেকে নিয়েই পরিপূর্ণ হতে—নিজের মতো করে ঘর বাঁধতে। জীবনের বড় বড় সমস্যার চাইতে অনেক সত্য বলে মনে হয়েছিল তার মনের দাবী। ভেবেছিল পালিয়ে যাবে সুশীলাকে নিয়ে, দূর গ্রামে কোথাও ঘর বাঁধবে। আর কিছু তার প্রয়োজন নেই—রূপকথার রাজকন্যার ভোমরা-ওড়া চোখের রহস্যের মাঝখানে সে হারিয়ে যাবে একটা নিঃশেষ সম্পূর্ণতায়, ডুবে যাবে তার ঘন নিবিড় কালো চুলের অতলে, তার কোমল বুকের গভীরে আশ্রয় নিয়ে নতুন গান রচনা করে যাবে। কিন্তু তা হয়নি—জীবনে নিষ্ঠুরতম আঘাত তাকে দিয়েছে সুশীলা।

ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে যোগেন, সুশীলা পালিয়ে গেছে। কিন্তু তার সঙ্গে নয়—ধলাইয়ের সঙ্গে। গানের সুর তার কিশোরী মনকে দুলিয়েছিল. কিন্তু যা ভুলিয়েছে তা বাঁশির ডাক।

সুরেন চীৎকার করেছে, দিয়েছে অশ্লীলতম ভাষায় গালাগালি। জ্বরের ধমকে কাঁপতে কাঁপতে যোগেনের মা কপালে হাত দিয়ে কেঁদেছে, পরের মেইয়াক ঘরত্ রাখি ক্যামন বদ্‌নামের ভাগী হৈনু হে হামি? অ্যাখন তোর শ্বশুরক্ মুখ দ্যাখামু ক্যামন করি?

সুরেন বলেছে, ধলাই হারামজাদাক্ পাইলে হামি উয়াক্ খুন করি ফেলিমু!

হারাণ—বাড়ীর সব চাইতে অপদার্থ ছেলেটা—ফিরেছে কাল রাত্রে। সে হো-হো করে হেসে উঠেছে নির্বিকার মুখেঃ পালাছে তো কী হছে! জোয়ান মেইয়া জোয়ান পুরুষের সাথ পালাই যিবে ইয়াত্ এমন চিল্লাছ ক্যানে?

সুরেন চেঁচিয়ে বলেছে, তু থাম না শালা।

শুধু যোগেন কোনো কথা বলেনি। কী বলবে বুঝতে পারেনি সে। শুধু মনে হয়েছে, বুকের ভেতরে তার আর কিছুই নেই, সব ফাঁকা। তার নিশ্বাস আটকে এসেছে, দম আটকে এসেছে। তারপর—

তারপর নিশ্চিত দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে যোগেন, বংশী মাষ্টারের জ্বলজ্বলে দুটো চোখ একটা জ্বলন্ত সূর্যের মত তার মনের ভেতরে এসে পড়েছে। ভালোই হল—এ ভালোই হল। নিজের জীবনের কথা ভাববার আর কিছুই নেই। তার রাজকন্যার স্বপ্ন ভেঙে গেছে—এবার সম্মুখে পৃথিবী। বংশী মাষ্টারের কথাই সত্যি। সে কবি, সে শিল্পী, সে চারণ। আজ সে তার প্রতিবাদ জানাবে সকলের বিরুদ্ধে, সমস্ত অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সে আঘাত করবে জমিদার, মহাজন, দারোগাকে ; সে ক্ষমা করবে না মহিন্দর রুইদাসকে—যে অকারণে জাত-জ্ঞাতিদের মাঝখানে তাকে অপমান করেছে, ক্ষমা করবে না ধলাইয়ের মতো শয়তানকে—যে তার বুক থেকে সমস্ত সুখ, সমস্ত ভবিষ্যতের স্বপ্নকে হরণ করে নিয়ে গেল।

এখনি দলটাকে খবর দেওয়া দরকার। সন্ধ্যার মধ্যে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। মাষ্টারকে কথা দেওয়া হয়েছে, খেলাপ করা চলবে না। জীবন যদি নাইই রইল যোগেনের, পৃথিবীর দাবী তো তার হারাবে না কোনোদিন। সে কবি, সে গুণী, সে চারণ।

* * *

দারোগার দলটার সঙ্গে প্রায় দুইঘণ্টা পরে ফিরল মহিন্দর। নাকে খত দিয়ে উড়ে গেছে নাকের ছাল, পিঠে জুতোর দাগ লাল টকটকে হয়ে আছে। সাময়িক উৎসাহে যতখানি ফেঁপে উঠেছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই ফেঁসে গেছে অবলীলাক্রমে। সত্যি কথাই বলেছিল চট্টরাজ—মুচির উপযুক্ত যায়গা হচ্ছে জুতোর তলা, বাড়াবাড়ি করলে যা হয় সেটা সুখের অবস্থা নয়। চর্মে এবং মর্মে কথাটা এখন ভালো ভাবেই অনুভব করেছে মহিন্দর। অতুল মজুমদারকে তিনজন ভোজপুরিয়া নিয়ে ধরতে ভরসা হয়নি দারোগা সাহেবের। সাংঘাতিক

লোক এই বিপ্লবীরা। দুহাতে দুটো রিভলভার তৈরী থাকে তাদের। তিনটি বিবির অধিকারী এবং কদম আলীর সুন্দরী বোনটির সম্ভাব্য অধিপতি দারোগা সাহেব এত সহজেই তিনটি মেয়েকে অনাথা করতে দ্বিধা বোধ করেছেন।

তাই মহকুমা সহর থেকে সশস্ত্র পুলিশ আসা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। এবং সেইখানেই হয়েছে ভুল। পূজামণ্ডপের কাছে আসতেই সেটা অনুধাবন করা গেল।

বংশী মাষ্টার নেই। নেই তার সেই ছোট স্যুটকেশটা—যার ওপরে অনেকগুলো গোলাপ ফুলের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত ছিল। পাখি পালিয়েছে। অতুল মজুমদার যাত্রা করেছে আবার কোনো নতুন পরিচয়ের পথে। চারদিকে লোক ছুটল। আর সেই ফাঁকে বাকী সব এসে দাঁড়াল আলকাপের আসরটা যেখানে পুরোদমে জমাট হয়ে উঠেছে, সেইখানে। স্তম্ভিত বিবর্ণ মুখে মানুষ-গুলো ফিরে তাকাল—যোগেনের দিকে নয়, পুলিশ আর চট্টরাজের দিকে।

মহিন্দর চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল: সরলার ব্যাটা! সরলার ব্যাটা কোন্ বুকের পাটায় এইঠে গান গাহিবা আসিলে! কে ডাকিলে উয়াক?

কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই দারোগা-সাহেব গর্জন করে উঠলেন। গর্জে উঠলেন এতদিনের মুখোসটা খুলে ফেলে বীভৎস হিংস্র ভঙ্গিতে। এ কী গান ধরেছে যোগেন—এ কী সর্বনেশে গান! এতক্ষণ যে রসের পালা চলছিল তার সঙ্গে এর তো কোনো সাদৃশ্য নেই! শ্রোতাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আর পুলিশের দলটার দিকে একবার বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে যোগেন সুর ধরল:

মহাজন রক্ত চোষা
জমিদার ফোঁস মনসা
দারোগা সে লাটের ছাওয়াল
মোদের হৈল কাল।

চট্টরাজ বললেন, শুনুন, দারোগা সাহেব, শুনুন।

নিরাশা-ক্ষিপ্ত দারোগা চীৎকার করে উঠলেন, থাম্ হারামজাদা, ভারী যে বুকের পাটা বেড়েছে শালাদের ?

যোগেনের বাজনদারেরা বাদ্যযন্ত্র ফেলে পালিয়েছে আসর থেকে। গড়াগড়ি যাচ্ছে হারমোনিয়াম, তবলা, করতাল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই যোগেনের। সে চারণ, সে কবি, সে গুণী। তার তো থামলে চলবে না। সুশীলা তার ওপর যে অন্যায় করেছে সমস্ত পৃথিবীর ওপরেই সে তার প্রতিশোধ নেবে। একা আত্ম-বিস্মৃতের মতো গান গেয়ে চলেছে যোগেন :

বাঁচার নামে বিষম জ্বালা,
পরাণ হৈল ঝালাপালা,
ওই তিনটা শালাক মারি খেদাও
ঘুচুক্ এ জঞ্জাল—

দারোগা বললেন, ধর, ধর শালাকে। এ ব্যাটাও নির্ঘাৎ অতুল মজুমদারের লোক।

হাতে হাতকড়া পড়ল যোগেনের। আসর তখন একেবারে খালি, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে সব। কিন্তু যোগেনের গান বন্ধ হয়নি। তেমনি তারস্বরে গেয়ে চলেছে :

হায় হায়রে, দ্যাশের এ কী হাল !

যোগেনের মুখের ওপর প্রকাণ্ড একটা ঘুসি পড়ল, আর্তনাদ করে বসে পড়ল যোগেন। কিন্তু ও গান তো থামতে দেওয়া চলে না। মানী মানুষ মহিন্দর রুইদাসকে ছাড়িয়ে আজ যোগেন বড় হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে সরলার ব্যাটা! নাকে খতের জ্বালাটা তখনো জ্বলছে, পিঠে টনটন করছে জুতোর দাগ। মহিন্দরের চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে উঠল, মনে পড়ল এক কালে তার গানও ছিল বিখ্যাত, যোগেনের চাইতে ঢের মিঠা গলা ছিল, তার গানের সুরে সরলার মতো মেয়েও ধরা দিয়েছিল তার বুকের ভেতরে !

না, হারলে চলবে না। হার মানলে চলবে না যৌবনের কাছে। ভূষণের বাড়ীতে যে অপমানের লজ্জা তাকে বহন করে আসতে হয়েছিল, আজ সে তার জবাব দেবে। সরলার ব্যাটার কাছে ছোট হওয়া চলবে না তাকে, থামতে দেওয়া যাবে না এই গান।

যোগেনের মুখের ওপর হিংস্র ক্ষিপ্র দারোগার কিল চড় পড়ছে, সর্বাঙ্গে পড়ছে চট্টরাজের লাথির পর লাথি। যোগেন তখন আর গান গাইতে পারছে না, মুখ নিয়ে গোঁ গোঁ করে যন্ত্রণার কাতর গোঙানির মতো অদ্ভুত আওয়াজ বেরুচ্ছে একটা। নাক আর গালের পাশ দিয়ে তার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। যোগেন তবু থামতে চায় না—পাগল হয়ে গেল নাকি?

এক মুহূর্তে নির্নিমেষ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল মহিন্দর। আর সংশয় নেই, সমস্ত মন তার প্রস্তুত হয়ে গেছে। মানী লোক শ্রীমহিন্দর রুইদাস—সকলের আগে তার সব চাইতে বড় সম্মান প্রাপ্য। যোগেনের মতো সেদিনকার ছেলেকে, সেই সরলার ব্যাটাকে এ গৌরবের অধিকার দেওয়া যাবে না। কোনো মতেই না!

হঠাৎ বাঘের মতো শূন্য আসরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মহিন্দর। যোগেনের গানটাকে তুলে নিলে নিজের তীক্ষ্ণ দরাজ গলায়ঃ

হায় হায়, দ্যাশের একি হাল,
এই তিনটা শালাক মারি খেদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল!

একটা লাঠির ঘা যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মহিন্দরের মাথায়। আর চড়াৎ করে ফেটে গেল খুলিটা, খানিকটা রক্ত ছুটে গিয়ে দেবী প্রতিমার শুভ্রতার ওপরে লালের ছোপ ধরিয়ে দিলে।

*　　*　　*　　*　　*

আর একজন লোক দূরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দেখছিল সমস্ত কাণ্ডটা।

ভয় পেয়ে পালায়নি, নড়েনি এক পাও। সে হারাণ। তার গলায় গান নেই, সে শুধু ঢোল বাজাতে পারে।

সে ঢোলের ছাউনি সে নিজের হাতে ফাঁসিয়েছে। এবার নতুন করে ঢোলে ছাউনি দেবে সে। যে গান গাইতে পারেনি, ঢোলের বুলিতে তাকে সে মুখরিত করে তুলবে। উপাস্তুদের ঘর ভেঙে দেবার জন্যে নয়, নতুন করে আবার তাদের ঘর গড়ে তোলবার জন্যে॥

বাবুপাড়া
জলপাইগুড়ি
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭
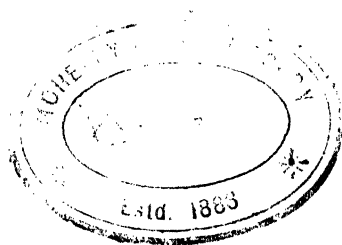
এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ—

উপনিবেশ (তিন পর্ব)
তিমির-তীর্থ
বীতংস
দুঃশাসন
স্বর্ণসীতা
সূর্য-সারথি
ভাঙা বন্দর
মন্দ্র-মুখর
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী
বনজ্যোৎস্না
জন্মান্তর
রোমান্স্
ভোগবতী